অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পার্ক বুক ব্যুরো ॥ কলিকাতা-১৬

উৎসর্গ-পত্র

শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে স্তন্য পান করে তখন সেই দুগ্ধধারার সহিত তাহার অন্তরে যাবতীয় সংস্কার ও চিন্তার বীজ উপ্ত হয়; তাহাই তাহার ভবিষ্য-জীবনে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠে। মাতা, মাতামহী, পিতামহীর নিকট শিশু যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে তাহা একেবারে অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায়। মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে আগে তাহার মাতৃজাতিকে উদ্‌বোধিত করিতে হইবে।

তাই, দেশের ভাবী আশা ভরসা যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, যাঁহাদের বক্ষঃধারায় জাতির শিরায় উপশিরায় শক্তি ও বীর্য্যের পরিবেশন হয়, জননী, ভগিনী ও জায়ার কল্যাণী মূর্ত্তিতে এখনও যাঁহারা বাংলার আঁধার ঘরে মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন—সেই মাতৃজাতির উদ্দেশে আমার আজীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতীক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

—গ্রন্থকারস্য

প্রকাশকের নিবেদন

(চতুর্থ সংস্করণ)

যুগপ্রবর্ত্তক প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইতেছে। আচার্য্য দেবের মৃত্যুর (১৯৪৪) পরে এবং বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়। এতদিনের মধ্যে পুস্তক নিঃশেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহার পুনঃ প্রকাশে বিলম্বের কারণ—চিন্তা ক্ষয়কারী তথা চিন্তা বিভ্রান্তকারী সিনেমা প্লাবিত দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নীরস উপদেশপূর্ণ বাণী লোক সমাজের সম্যক সমাদর লাভ করিবে কিনা ইহা একটা বিশেষ চিন্তার কথা ছিল। তিনি যেসব কথা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের ভাবধারার সহিত খাপ খাইবে কিনা ইহাও অন্যতম চিন্তার কথা ছিল। বিশেষ সুখের কথা ইতিমধ্যে বহু গুণগ্রাহী এই পুস্তকের নব সংস্করণ প্রণয়নে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উপরোক্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের স্বর্গত শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটি যথোপযুক্ত ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। রায় হরেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সাল হইতে আচার্য্যদেবের ছাত্ররূপে সুরু করিয়া তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা ও নানা বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁহার একান্ত ভক্ত ছিলেন। আচার্য্য রায়কে তিনি চিরদিন "গুরুদেব" আখ্যানে পরিচয় দিতেন। তাঁহাকে বার বার উল্লেখ করিতে শুনা গিয়াছে যে, বাল্যকাল হইতে সুরু করিয়া কলেজে পাঠ্যাবস্থাকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য জগদীশ প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসিলেও এক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাঃ ষ্টিফেন (Dr. Stephen)-এর নামই চিরস্মরণীয়

ভাবে তাঁহার মনে বিরাজ করিত। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু এই পুস্তক প্রকাশের অন্যতম বিলম্বের কারণ।

গীতার প্রখ্যাত বাণী—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। এই বাণীর অন্তঃর্নিহিত অর্থের সীমিত রূপায়ণ যে বঙ্গীয় সমাজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবির্ভাবে পূর্ণ সত্য রূপে প্রকট হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৭৭২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। তিনি বাংলাদেশের নব জাগরণের (Renaissance) সর্ব্ববাদিসম্মত জন্মদাতা। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মধারা কালে কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মহামহারথীগণের সুদৃঢ় পরিচালনায় বঙ্গদেশের সমাজ ক্ষেত্রে একটা মহাপ্লাবন, একটা নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যাহাকে বলে অষ্টবজ্র সম্মেলন হইয়াছিল। নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে বাংলাদেশে ঐ স্বুবর্ণ যুগের (Golden age) সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশের এথেন্স সহরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—সেই এরিষ্টটল-এর বা সক্রেটিসের যুগ। এলিজাবেথীয় যুগের কথা সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে বহু নিম্নস্তরে স্থান পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে মহাপুরুষদের সমস্যা সমাধানের বস্তু ছিল মুখ্যতঃ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। কিন্তু ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭২ সাল এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে একটা বিরাট যুগের আবির্ভাব-সূচনায় রাশি রাশি নানামুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের জন্ম প্রবাহ বিধাতার একটা পূর্ণ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত মাত্র। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার নীলরতন সরকার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মত মহাপুরুষগণের জন্ম ঐ দ্বাদশবর্ষ মধ্যেই হইয়া গেল। অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর জন্মও ঐ

পর্বের মধ্যে ঘটিয়াছে। ঐ যুগের অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ নানাভাবে দেশের কল্যাণকল্পে দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে মনে হয়, প্রকৃতিই যেন তাঁহার বীজ, ক্ষেত্র ও পরিবেশ (Seed, soil and environment) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তিনি ঐ সুদূর পল্লীগ্রাম রাড়ুলীতে মহাকবি মাইকেলের কপোতাক্ষীকূলে এক মহান বংশে পিতামাতার বহু সন্তানের মধ্যে জন্মিয়া ঐ পল্লীগ্রামেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন এবং দশ বৎসর বয়সেই কলিকাতা মহানগরীতে বিদ্যাভ্যাস করিতে আসেন। এগারো বৎসর বয়সে নিদারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীর্ণ শীর্ণদেহ লইয়া এবং বিনিদ্র রজনীর অস্বস্তি কেবল ঔষধ সেবনে কিছু লাঘব করিয়া আহার বিহার সম্বন্ধে আজীবন অতি সন্তর্পণে কাটাইয়া গিয়াছেন। ঐ দারুণ স্খলিত দেহ লইয়াই তিনি ৮৩ বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন; উহার মধ্যেই দৈহিক ও মানসিক সমস্ত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া অধ্যয়নের জন্য নানা দেশ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) বার বার পরিভ্রমণ করিলেন; নানা দেশের এবং বিশেষ করিয়া এই বাংলাদেশের শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া নানাভাবে দেশসেবা করিলেন; কোলাহলময় কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়া কিভাবে তিনি এই সব সম্ভব করিলেন উহা চিন্তা করিতে যাইলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

তাঁহার সমসাময়িক প্রতিভাধরগণ নানাভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মধারার বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে তিনি যেন মুমূর্ষু বাঙ্গালী জাতিটাকে টানিয়া তুলিয়া তাহাকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গীতার ধর্ম্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়। তিনি কর্ম্মযোগী হিসাবে ভাবে, ভাষায় ও কর্ম্ম মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির কল্যাণে

আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজ কথায় "আজীবনলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার" তিনি তাঁহার এই "অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" কথিত পুস্তকে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়া গিয়াছেন; প্রকৃতি রাজ্যের সম্রাট স্বর্য্য যেমন পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া, বাষ্পায়িত করিয়া মেঘের সৃষ্টি করিয়া পরে লক্ষ লক্ষগুণে পৃথিবীর কল্যাণে বারিধারা বর্ষণে জগতের অপার কল্যাণ সাধন করেন। পতঙ্গকুলের মধুমক্ষিকা বহু বহুদূরে বিস্তৃত স্থান পরিক্রমণ করিয়া নানা পুষ্প হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মধুভাণ্ড পূর্ণ করে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও সমভাবে দেশবিদেশ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া নানা দেশের নানা সমাজের সহিত মিলিত হইয়াছেন, নানা দেশের নানা ভাষার নানা শাস্ত্র, সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক তথা রাসায়নিক অনুবীক্ষণী দৃষ্টিতে সমস্ত পর্য্যালোচনা ও তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজের সমস্ত সমস্যা ও তাহার সমাধানকল্পে যাহা কিছু করণীয় তাহা অতি স্পষ্টভাষায় নানাভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন —একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

বেদ উপনিষদের ঋষিরা ধ্যানযোগে চক্ষু মুদিয়া নির্জ্জন বনের মধ্যে থাকিয়া ত্রিকালের খবর জানিতে পারিতেন শুনা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কোলাহলময় এবং কর্ম্মবহুল এই কলিকাতা মহানগরীতে থাকিয়াও পুরুষকার প্রভাবে অন্যপন্থী হইয়া তাঁহার কর্ম্মধারা সমাজে চালিত করিয়াছেন। "একোহং বহুস্যাম্"—উপনিষদের এ বাক্য সম্পূর্ণরূপে আচার্য্যের পক্ষে প্রযোজ্য। আচার্য্যদেব তাঁহার চারিত্রিক আচরণের দ্বারা, সত্যনিষ্ঠা দ্বারা, আয়াসলব্ধ জ্ঞান বিকিরণ দ্বারা ছাত্র ও শিষ্য সমাজের গুহাস্থিত সুপ্ত শক্তিকে নব নবরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। ফলেন পরিচিয়তে —A tree is known by its fruit—তাঁহারই ফলপ্রসূত রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক, দেশসেবক—ডাঃ নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্র নাথ বসু, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র

ঘোষ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু মহান্ ছাত্র। বাংলা দেশে নানারূপ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিকর্ত্তা—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অমর লেখনী ও বাণীনিঃসৃত শাশ্বত হোমাগ্নি বঙ্গীয় সমাজে চিরজাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য এই নব সংস্করণের সৃষ্টি হইতেছে। পদ্মপত্রের মত অনাসক্ত-জীবন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উৎসর্গ-পত্রে বঙ্গজননীকে উদ্দেশ করিয়া কাতর কণ্ঠে যে আখ্যান জানাইয়াছেন আশা করি তাহা নিষ্ফল হইবে না। মহাকবি মাইকেলের 'Heart of a Bengali mother' এক্ষেত্রে স্মরণীয়। বাঙ্গালীর নারী জীবন বিগত ত্রিশ বৎসরে বহু ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে সত্য তবুও ইহার মধ্যে নবজাতির ও নবযুগের সঞ্চার হইবে ইহাই একান্ত আশা। বীজরক্ষক পুরুষ জাতির কথা অব্যক্ত থা থাকিলেও উহা প্রচ্ছন্নভাবে আপনিই আসিয়া পড়ে। বহুযোজন দূরে থাকিয়া সূর্য্য যেমন তাহার কিরণজাল বিস্তার করিয়া জগৎকে আলোকিত ও নানারূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্ট এই অমূল্য গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের দ্বারা বঙ্গীয় সমাজের পুনর্জীবন লাভ ও নবযুগের অগ্রগতির সূচনা করিলে সূর্য্যোদয়ে তমসা অপসৃত হইবে। ইতি—

প্রকাশকগণ

অবতরণিকা

অনেকের মনে বাঙ্গালী বলিতে কেবলমাত্র বাংলার ভদ্র ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের কথাই মনে পড়ে, কিন্তু আমি এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঙ্গালী শব্দের প্রয়োগ করি না। বাঙ্গালী বলিতে আমি কেবল হিন্দুসম্প্রদায় বুঝি না। উচ্চ শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, চাষী ও শ্রমজীবী সকলকেই বুঝি এবং এ গ্রন্থে আমার যাহা কিছু বক্তব্য তাহাদের সকলকে লক্ষ্য করিয়া। আজ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত। সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া এই জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সঙ্কট আমরা ইচ্ছা করিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছি। শত সহস্র যুবক দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, কোনও প্রকারে জীবনোপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া হতাশ্বাস হইতেছে, এমন কি কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে—নিত্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে এরূপ দুর্ঘটনার কথাও পড়িতেছি।

জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবিকা অর্জ্জনের পথ দেখিতে হয়। কেবল মানুষ নহে, পশুপক্ষীও এই নিয়মের অধীন। মাতা যেমন শিশুকে স্তন্যপানে পুষ্ট করেন পশুদেরও সেইরূপ। গাভীও বাছুরকে একটু স্তন্যপান করাইয়া, তাহার গা চাটিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। পক্ষিশাবকের পিতা ও মাতা পালা করিয়া নীড়ে বসিয়া তাহাদের সন্ততিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং ইতস্ততঃ চরিয়া তাহাদের জন্য "আধার" সংগ্রহ করে। একমাস কিংবা দুইমাস পক্ষিশাবক এইরূপে পিতা মাতার মুখাপেক্ষা করে। তাহার পর একটু বড় হইলেই চরিয়া বেড়াইতে শিখে, আর মা বাপের তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু মন্দভাগ্য বাঙ্গালী সমাজে

এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালী ছেলে আজ চিরশিশুভাবাপন্ন। সে বাড়িয়া উঠিলেও এক প্রকার বাপের গলগ্রহ। ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য মা বাপ বা অন্য অভিভাবকগণই দায়ী। পুরুষানুক্রমে সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনোপায় পদ্ধতি নিরূপণের যে চিরাগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহারই সঙ্কীর্ণ খাতে সন্তানের জীবন-ধাবা বহাইয়া দিয়া আমবা পিতা, মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। সেই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ও সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজস্ব পথ করিয়া লইবার মত শক্তি ও প্রতিভা কয়জনের থাকে? তাই দেখিতে পাই, গতানুগতিকতার কুম্ভীপাকে পড়িয়া বাঙ্গালী যুবকেব অশেষ দুর্গতি।

আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবার পর হইতে আজ অন্যূন ৪৫ বৎসর যাবৎ এই সকল গুরুতর সমস্যা অনুক্ষণ অনুধাবন করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালীর সম্মুখে যে ভীষণ অন্ন-সমস্যা উপস্থিত তাহার সমাধানে অক্ষম হইয়াই যে এ জাতি দ্রুত মরণপথের পথিক হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল কেমিক্যাল" কারখানা স্থাপনে প্রবৃত্ত হই এবং বাঙ্গালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সে আজ ২৫।২৬ বৎসরের কথা, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের পারে দাঁড়াইয়া এখন দেখিতেছি যে, উক্ত প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম ও যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা সকলই আজ বর্ণে বর্ণে খাটিয়া যাইতেছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে আজ আমরা বাঙ্গালী জাতি নিজ বাসভূমে পরবাসী বনিয়া গিয়াছি। সম্প্রতি আমার নিজ জেলা খুলনা এবং রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এতদ্ভিন্ন গত ১৪ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতে প্রায় তিন লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছি।— তন্মধ্যে ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলের

বহু সহর ও গ্রামে ঘুরিয়াছি। গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ যে একটানা মন্দা চলিয়াছে তাহার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় বাংলার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। অবশ্য এই 'মন্দা' কেবল এ দেশেই আবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতে, এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, ইহা ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ধাক্কা বাংলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছে। বোম্বাই ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে তূলা জন্মে; পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গম একটি প্রধান ফসল। বাংলার প্রধান ফসল হইতেছে ধান ও পাট; কিন্তু এই দুই দ্রব্যের মূল্য যত কমিয়াছে অপর কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য তত কমে নাই। এই কারণে বাঙ্গালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই ক্ষতির অঙ্ক শুনিলে হতাশ হইতে হয়। ১৯২৮।২৯ সালে বাংলা দেশে মোট উৎপন্ন ধান্য ও পাটের মূল্য যথাক্রমে ১৭১ কোটী ৩৫ লক্ষ ও ৩৭ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু ১৯৩২।৩৩ সালে এই দুইটি ফসলের মোট মূল্য যথাক্রমে ৬৪ কোটী ৬৪ লক্ষ এবং ১০ কোটী ৫৭ লক্ষে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাংলার আর্থিক দুর্গতির আর একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। আমি যখন বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ ও দিল্লী অঞ্চলে যাই তখন একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সকল সহরে ও প্রদেশে সমস্ত শ্রমজীবী ও চাষী তত্তৎপ্রদেশবাসী, অর্থাৎ সেখানকার যাবতীয় মুটে, মজুর, পাহারাওয়ালা প্রভৃতি সেই দেশেরই লোক। লাহোরে কেবল মুটে মজুর নহে, যত বড় বড় ব্যাবসাদার সবই পাঞ্জাবী। আমাদের কলিকাতায় যেমন চৌরঙ্গী, সেখানেও সেইরূপ সুবৃহৎ সৌধমালা খচিত মাল (Mall)। ইহাই হইল সেখানকার ব্যাবসাকেন্দ্র। কিন্তু চৌরঙ্গীর সহিত তফাৎ এই যে, সেখানে ক্বচিৎ এক আধ জন ইউরোপীয় বা ভিন্ন দেশীয় লোকের সাক্ষাৎ মিলে। লাহোরের 'আনারকালি'

কলিকাতার বড়বাজারের তুল্য, কিন্তু সেখানে মাড়োয়ারী বা ভাটিয়ার স্থান নাই, সমস্ত ব্যাবসাই পাঞ্জাবীর অধিকৃত। বোম্বাইতেও এই প্রকার। মাদ্রাজের অবস্থা অনেকটা বাংলার অনুরূপ অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাবসাবাণিজ্য ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, কাচ্চি প্রভৃতির করতলগত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, সেখানে প্রবলপ্রতাপ চেট্টি বা শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ব্যাঙ্কিং-এর কাজে পুরুষানুক্রমে সিদ্ধহস্ত; বাংলায় সে শ্রেণীর লোকের একান্ত অভাব। এতদ্ভিন্ন মুটে, মজুর ও সকল প্রকার শ্রমজীবী সেই প্রদেশস্থ।

একবার কলিকাতার দিকে তাকানো যাক। দেখিব যে বড় বড় রাস্তার যাবতীয় মুটে, মজুর, কুলী, পাচক, ভৃত্য, ধোপা এবং অধিকাংশ নাপিত উড়িয়া, বিহারী বা পশ্চিমা। এতদ্ভিন্ন বড বড় মুদীখানা ও হালুইকরের দোকান, সমস্তই অ-বাঙ্গালীর দখলে। গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টীমারঘাটে সমস্ত কুলীমজুর বিহারী ও পশ্চিমা—একটিও বাঙ্গালী নাই। বরিশালেও এই প্রকার, তবে রকমভেদ এই যে, সেখানকার কুলী মজুরের কাজ বিহারী বা পশ্চিমার পরিবর্ত্তে উড়িয়ার করতলস্থ। অথচ এই সকল বন্দরের চতুঃসীমানায় চাষীরা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় জীবন কাটাইতেছে—কুলীর কাজ তাহারা করিবে না, করিলে ইজ্জৎ যাইবে। আর একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতায় শত শত পশ্চিমা 'সেলাইজুতির' কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কিন্তু একটিও বাঙ্গালী চামার 'সেলাই জুতি' নাই। এই কাজের মূলধন এক টাকা বা পাঁচসিকা হইবে। ঘরে সেলাই একটি চামড়া বা ক্যান্‌ভাসের থলে, কয়েক প্রকার টুকরা চামড়া, একটি সেলাই করিবার ছুঁচ বা ভোমর এবং এক বাণ্ডিল সুতা হইল ইহার সরঞ্জাম। অথচ দমদম প্রভৃতি স্থানে বহু দেশীয় মুচি ও চামার উপবাসে শুকাইতেছে। এ অবস্থা শুধু কলিকাতারই বিশেষত্ব

নহে, ঢাকা প্রভৃতি মফঃস্বল সহরেও এইপ্রকার, এবং সেখানেও ধোপা, নাপিত, কুলী, 'সেলাইজুতি', গৃহস্থ ঘরের পাচক, ভৃত্য প্রভৃতির যত কিছু শ্রমসাধ্য কাজ ক্রমশঃ অ-বাঙ্গালীর হস্তগত হইতেছে। বাংলার অর্থ কি প্রকারে শোষিত হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রবেশলাভ করিতেছে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৯২৫ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে গড়ে প্রায় বার্ষিক আট কোটী টাকা মণিঅর্ডারযোগে বিহার ও উড়িষ্যা দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশ বাংলা ও আসাম হইতে যায়, এবং উভয় দেশের মধ্যে বাংলার অংশই অধিক। বিহার-উড়িষ্যার যত লোক বিদেশে যায় তাহাদের শতকরা ৬৪'৩ জন যায় বাংলা দেশে, সুতরাং একথা বলিলে সত্যের নিতান্ত অপলাপ করা হইবে না যে এই সকল প্রবাসী বিহারী ও উড়িয়া বিদেশ হইতে যত অর্থ দেশে প্রেরণ করে তাহার প্রায় ⅔ অংশ সংগৃহীত হয় একমাত্র বাংলা দেশ হইতেই। মিঃ লেসি আরও দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩২ সালের আদম সুমারীর অব্যবহিত পূর্ব্বের তিন বৎসরে সারণ ও কটক জেলাদ্বয়ে বিদেশ (অর্থাৎ প্রধানতঃ বাংলা) হইতে যথাক্রমে বার্ষিক গড়ে ৮ কোটি ও ৮০ লক্ষ টাকা ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলা দেশে যত ভিন্ন দেশীয় লোক আসে তাহাদের মোট সংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ এই দুইটি জিলা হইতেই আসে।"* এক সারণ সহরেই প্রতি বছর বাংলা হইতে এক কোটী টাকা পোষ্টআফিস মারফত প্রেরিত হয়।

এই ত গেল কুলী, মুটে, মজুর, বেহারা, চাকর ও পাচকদের রোজগারের তালিকা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী টাকা শোষিত হয়।

---

*বিহার উড়িষ্যার আদমসুমারীর (Census) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লেসির বিবরণ হইতে সঙ্কলিত।

প্রতি বৎসর বা প্রতি দুইবৎসর পরে যখন এই সকল লোক দেশে যায় তখন ট্যাঁকে বা গেঁজেয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ লইয়া যায়।

ইহা ত গেল শোষিত অর্থের ভগ্নাংশ মাত্র। এতদ্ভিন্ন রাশি রাশি টাকা বাংলা হইতে প্রতি বৎসর বাহির হইয়া যায়। যত আমদানি, রপ্তানি, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এ সমস্তই ইউরোপীয় ও তাহার পর মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, বোরা, খোজা, কাচ্চি, পাঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা প্রভৃতির একচেটিয়া বলিলেও হয়। পুরাকাল হইতে বাংলার ব্যাবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ সওদাগরী, গন্ধবণিক, সাহা, তেলি, কাপালি প্রভৃতির হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা "গদীয়ান্" ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিল, নড়িয়া চড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে কাজ করিবার মত ক্ষিপ্রতা তাহাদের ছিল না, তাই রেল ষ্টিমারে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আলস্য ও ঔদাসীন্যের রন্ধ্রপথে ভিন্ন প্রদেশের লোক আসিয়া তাহাদের উৎখাত করিয়াছে ও করিতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যখন বাংলায় ছাউনি করিয়া কারবার আরম্ভ করেন তখন কলিকাতার সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় তাঁহা-দিগের বেনিয়ান ছিলেন। তাঁহারাই এক সময়ে বড় বড় হৌসের মুৎ-সুদ্দি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তন্তুবায় শ্রেণীর বসাকবংশ· চন্দননগর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে মসলিন আদি সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সরবরাহ করিতেন ও বিনিময়ে বিপুল ধনলাভ করিতেন। ৺রাজা হৃষীকেশ লাহার পূর্ব্বপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ লাহাও কয়েকটি সুবৃহৎ হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। অনেকেই কায়স্থকুলোদ্ভব রামদুলাল দে'র নাম শুনিয়াছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি ৫।৭ টাকা বেতনের সরকার হইতে নিজ অসামান্য প্রতিভাবলে একজন বড় সওদাগর ও ধনকুবের হইয়াছিলেন। বিখ্যাত মতিলাল শীলও এই প্রকারে ব্যাবসা-বাণিজ্য দ্বারা হীন্ অবস্থা হইতে ক্রোরপতি হন। কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে নাই বলিলেও চলে।

বাংলা দেশ সুজলা, সুফলা, রত্ন-প্রসবিনী। কিন্তু ইহাই এ দেশ বাসিগণের পক্ষে সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা প্রভৃতি নদীতে যখন বর্ষাকালে 'ঢল' নামে অর্থাৎ প্লাবন হয়, তখন নদীতীরস্থ অঞ্চলে প্রচুর পলি পড়ে এবং তাহাতে জমি উর্ব্বর হয়। এই জমি একটু আঁচড়াইয়া বীজ বপন করিলেই প্রভূত ফসল জন্মে। অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে নদী প্লাবিত হয় না সেখানকার মাটিতেও অল্পায়াসে ফসল হয়। বৎসরে তিন মাস বা চারি মাস মেহনত করিলেই চাষিগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সুন্দর ব্যবস্থা হয়। একদিকে লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অপরদিকে ইউরোপীয় এবং ইদানীং জাপানী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা, এই উভয় কারণে দেশের গৃহশিল্প লোপ পাইয়াছে। আমাদের বাল্যকালে অর্থাৎ ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও কবি খেদ করিয়াছেন :

"সুতা যাঁতা ঠেলি অন্ন মেলা ভার
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার।"

এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেণীর কারিগর ও শিল্পী পৈতৃক ব্যাবসা হারাইয়া জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে। কাজেই জমির উপর অযথা চাপ পড়িয়াছে, ফলে শতকরা ৯০ জন লোক চাষের উপর নির্ভর করিতেছে। তদুপরি গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ মন্দা পড়িয়াছে। ফলে কৃষিজীবীর দুঃখের অবধি নাই। কিন্তু এই দুঃখ কেবল কৃষিজীবীদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় সকল শ্রেণীর লোক—যাহারা কৃষকের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের উপর নির্ভর করে,—অর্থাৎ জমিদার, মহাজন, উকীল, ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতি—ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতেছে। প্রতি বৎসর তামাদীর মুখে হাজার হাজার জোত জমি ও শত শত জমিদারী নীলামে চড়িতেছে। কিন্তু খরিদ্দার নাই। অর্থাভাবে কেহই ক্রেতা হইতে চাহে না। সমগ্র বাংলা আজ আর্ত্তনাদ করিতেছে—

যেখানে যাই হাহাকার রব। যাহারা ভূমির উপস্বত্বের উপর সাক্ষাৎভাবে নির্ভর করে—অর্থাৎ জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি আর কৃষকের ত কথাই নাই,—তাহারা আজ ঋণে মগ্ন বা হৃতসর্ব্বস্ব। সুতরাং বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। কলিকাতার সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়, যাঁহারা পূর্ব্বে ব্যাবসাজীবী ছিলেন, তাঁহাদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মকুশলতার অভাবে ইহারা ধীরে ধীরে পৈতৃক ব্যাবসাবৃত্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া এক্ষণে সুদেই পরিতৃপ্ত আছেন। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ অর্জ্জিত ধনসম্পত্তির সুদে আর কতকাল চলিতে পারে? ক্রমান্বয়ে বংশ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বাহুল্য হইতেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থের অঙ্ক শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে।

দেশের এই দুর্দ্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও উন্নত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারাই যত ব্যাবসা-বাণিজ্য সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহারাই স্বদেশজাত দ্রব্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানি করেন এবং তত্তৎ স্থান হইতে বিনিময়ে পণ্য আমদানি করিয়া জগতের সহিত লেন-দেন চালান এবং দেশের ধনবৃদ্ধি করে। বাংলা দেশে কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী* বলিতে প্রধানতঃ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায় বুঝায়। এতদ্ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক মুসলমানও এই শ্রেণীভুক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃটিশ রাজত্বের প্রথম হইতেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরীর লালসায় সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কোনও কালে ব্যাবসাবুদ্ধির বিকাশ হয় নাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক টোলের পণ্ডিত হইয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

---

* জমিদারবর্গ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও নিষ্পন্দ বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। ইহাদের জসাড়তা ও নিশ্চেষ্টতা বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য কম দায়ী নহে।

দানে রত ছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই পৌরোহিত্য এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিতেন; অবশিষ্ট ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কায়স্থগণও কিছুকাল গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িয়া এবং শুভঙ্করীর হিসাব শিখিয়া প্রায়ই নবাব সরকারের কানুনগো, আমীন প্রভৃতির পদলাভ করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেন এবং আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিতেন। কদাচিৎ ব্রাহ্মণও এই সকল পদলাভের জন্য লালায়িত হইতেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন এই প্রকারে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া বিপুল জমিদারী লাভ করেন। তিনিই নাটোরের রাজবংশের স্থাপয়িতা। নবাব সরকারের পদগৌরবের মহিমা এত উচ্চ ছিল যে, ঐ সকল পদে যাঁহারা কাজ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নবাবদত্ত পদবী আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ সযত্নে ও সগৌরবে ব্যবহার করেন। তরফদার, শীসনবীশ, খাস্‌নবীশ, মহালনবীশ, খাঁ, মুন্‌সী, দস্তিদার প্রভৃতি পদবী তাহার সাক্ষী। এই সকল কায়স্থ প্রধানতঃ জমিদার সরকারে দেওয়ান, তহশিলদার, নায়েব ও গোমস্তার কাজ অর্থাৎ পাটোয়ারীগিরি করিতেন। বৈদ্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এখনও লক্ষাধিক হইবে না। ইহারা "থলে বড়ি" লইয়া বৈদ্যগিরি করিতেন। আমার শৈশবে ইহাঁদের এইভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দেখিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলার জমিদারবর্গ আমাদের এই দুর্দ্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী। আর এক কারণেও পরোক্ষভাবে তাঁহারা দেশের অকল্যাণ করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাণী ভবানী প্রমুখ অনেকে অজস্র দেবোত্তর, লাখেরাজ ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া দেশের এই দুরবস্থার সহায়তা করিয়াছেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে "An idle brain is the devil's workshop" —অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। জীবিকার্জ্জনের জন্য কোনও প্রকার কষ্ট বা কায়ক্লেশ করিতে হইবে না, আজীবন 'বসিয়া' খাওয়া চলিবে,

এইরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মাইলে মানুষ একেবারে অপদার্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু যত কিছু বদ্‌খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "পল্লীসমাজে" ইহার চমৎকার চিত্র আছে। এই কারণে পাড়াগাঁয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময় কাটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে তাস, পাশা, দাবা, দিবানিদ্রা এবং প্রতিবেশীকে জব্দ করিবার জন্য যত প্রকার দলাদলি ও মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি। সময়ের অনুরূপ সদ্ব্যবহার ইহাদের অজ্ঞাত। এই প্রকারে বাংলার পল্লীগ্রামগুলি দুর্নীতির উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর এক বিপদ্‌জাল আমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছি এবং তাহাতে জড়িত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি ও স্বোপার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার দীক্ষাগুরু প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়। এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতবাসী যদি জগতের দরবারে পুনরায় সম্মানের আসন অধিকার করিতে চায় তাহা হইলে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসার অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি জীবনের শেষভাগ উৎসর্গ করেন। তাঁহার এবং ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিগণের ঐকান্তিক যত্নে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের শাসকগণ এই প্রচেষ্টার অনুকূলে ছিলেন না। রামমোহনের প্রস্তাবে শঙ্কিত ও দিশেহারা হইয়া তাঁহারা এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কল্পনা করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে তেজোদীপ্ত নির্ভীক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"সমগ্র বৃটিশ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানালোকে বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞানের চিরান্ধকারে নিমজ্জিত রাখাই যদি সঙ্গত বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে মধ্যযুগসুলভ চিরাগত আরিষ্টোটলীয় দর্শনের উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থলে

বেকনের তমোনাশা বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা হইত না, কারণ অজ্ঞতার পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার পক্ষে প্রথমোক্ত মতবাদ যেমন উপযোগী ছিল, তেমন আর কিছুই নহে। সেইরূপ, এতদ্দেশে অজ্ঞানের তিমিরশাসনকে চিরস্থায়ী করাই যদি বৃটিশ ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে সে কার্য্য পুরাতন 'সংস্কৃত' শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে সংসাধিত হইতে পারিত। কিন্তু দেশবাসীর হিতসাধনাই সরকারের লক্ষ্য, সুতরাং আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত অর্থব্যয়ে তাঁহারা এমন একটি উদার ও উন্নত শিক্ষাপ্রণালী রচনা করিবেন যাহাতে রসায়নশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের স্থান থাকিবে এবং উক্ত বিষয়সমূহে শিক্ষাদানের জন্য কতিপয় ইয়োরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিভাশালী বিদ্বজ্জনকে নিযুক্ত করা হইবে ও আবশ্যকীয় পুস্তকাদি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

উল্লিখিত পত্রে সংস্কৃতজ্ঞ রামমোহনের সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় আপত্তি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে রামমোহনের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি নিজে একজন উচ্চদরের সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ বেদান্ত উপনিষদের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ন্যায় ও স্মৃতির চর্চ্চায় ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম কয়েকখানি উপনিষদ্ প্রথমে বঙ্গভাষায়, এবং পরে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নূতন করিয়া দেশে উপনিষদ চর্চ্চার পথ প্রদর্শন করেন কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিদ্যার, বিশেষতঃ পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন ব্যতীত এদেশের মুক্তি নাই।

রামমোহন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহাবিদ্যালয়ই কালক্রমে হিন্দু কলেজ এবং পরিণামে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়।

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই নবযুগের অবতারণা করিলেন। এ স্থলে তাহার সবিস্তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু শিক্ষার প্রসার হইতে থাকিলেও আমাদের জাতীয় চরিত্রগত ত্রুটি রহিয়া গেল, বরং অনুকূল আবহাওয়ার গুণে সমধিক বিকাশলাভ করিল।

রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন দেশবাসীর প্রকৃত মঙ্গল কামনায়, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অপব্যবহার আরম্ভ করিলেন। আমার প্রপিতামহ নদীয়া ও যশোহর জিলার জজ ও কালেক্‌টারের দেওয়ানরূপে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং আমার পিতামহও সেই পথ অনুসরণ করেন। আমার পিতা 'দোটানার' মধ্যে (১৮২৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বাড়ীতে মৌলবীর নিকট পার্সী ও কিছু কিছু আরবী শিক্ষা করেন। কিন্তু পরে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে ইংরাজীও শিক্ষা করেন। ইহার মূলেও ছিল সেই চাকরীর কথা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অতঃপর দেশবাসীদিগের লভ্য যত কিছু সরকারী পদ, ইংরাজীশিক্ষিত যুবকদিগকেই তাহা দেওয়া হইবে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আদালতে পার্সী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই ঘোষণায় হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবক-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। 'জিয়ল' (সিঙ্গী) প্রভৃতি কতকগুলি মাছ আছে যাহারা গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে জলাভাব ঘটিলে শৈবালের নিম্নে বা কর্দ্দমাক্ত গর্ত্তে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু বর্ষার নূতন বৃষ্টির ধারা পড়িবামাত্র উহারা আনন্দে লাফালাফি করিতে থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুজ্ঞা ও আশ্বাসবাণী শুনিয়া শিক্ষিত যুবক মহলে অনুরূপ উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গেল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে

কিশোরীচাঁদ মিত্র* প্রমুখ ব্যক্তিগণ ফ্রী চার্চ্চ কলেজে সমবেত হইয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

জাতির ভাগ্যবিধাতা এই উল্লাসে কিন্তু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া থাকিবেন। যেমন বৃটিশ শাসন দৃঢ় হইতে লাগিল অমনি নূতন নূতন বিভাগ ও পদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে বাংলা দেশ ছাপাইয়া পশ্চিম উত্তর অঞ্চলে টান পড়িল। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বাংলাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং প্রথমতঃ বিহারে যত কিছু উচ্চ পদ, এবং ডাক্তারী ও ওকালতী বাঙ্গালীর একচেটিয়া হইল। তাহার পর মধ্য প্রদেশ, এবং লর্ড ডালহৌসী যখন নবাবকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশ বৃটিশ অধিকারভুক্ত করেন তখন সে অঞ্চলও বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে পাঞ্জাব দেশ যখন বৃটিশ অধিকারে আসিল তখন নূতন চারণের মাঠ (Fresh fields and pastures new) পাইয়া বাঙ্গালী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল এবং সমস্ত পদ অধিকার করিল। এইরূপে যখন গ্র্যাজুয়েটের চাহিদা কমিয়া আসিতেছিল ঠিক সেই সময়ে সমগ্র ব্রহ্মদেশও ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইল, পুনরায় আর এক কিস্তী শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনোপায়ের সংস্থান হইল। এই সমস্ত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মহিমা এবং পাস করা ছেলের গুমোর বাড়িয়া গেল। তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এমন কি সুদূর সিংহল ও ব্রহ্মদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। কাজেই বাঙ্গালীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, ইংরাজী লেখাপড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পন্থা। সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়াই সে ছড়া শুনিতে লাগিল, "লেখাপড়া করে যে, দুধভাত খায় সে" অথবা "গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"

---

* ইনি "আলালের ঘরের দুলাল" রচয়িতা প্যারীচাঁদ (টেকচাঁদ) মিত্রের সহোদর রাজসাহীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

ইত্যাদি ; কিন্তু মূর্খ বাঙ্গালী বুঝিল না যে, সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ভাবী ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিল। এ কারসাজি কয়দিন টিঁকে ? কয়দিন বা চাকরী ও ওকালতী একচেটিয়া থাকে, আর কয়জনই বা তাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে ?

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে বিহারে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যপ্রদেশে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তপ্রদেশে এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী ও আলিগড়ে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দিল্লী, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে তিনটি এবং বাংলা দেশে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়—মোট এগারোটি। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এর কথা তুলিলাম না, কেননা সে অঞ্চলে বাঙ্গালী পসার জমাইতে পারে নাই। আজ এই ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় পাল্লা দিয়া কলকারখানার হারে রাশি রাশি গ্র্যাজুয়েট তৈয়ারী করিতেছে। সুতরাং এই সকল প্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী লইয়া শৃগাল কুক্কুরের কলহ বাধিয়াছে। বাঙ্গালী চাকুরিয়া সেখানে চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ৭৫ বা ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি সহরে যে সমস্ত বাঙ্গালী চাকুরিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের বংশধরগণের দুঃখক্লেশের অবধি নাই। প্রাদেশিক ঈর্ষার দরুণ ঐ সমস্ত প্রদেশে মসীজীবী বাঙ্গালীর আর স্থান নাই। তাহারা তত্তৎদেশের স্থায়ী বাসিন্দা (domiciled) হইয়াও আর চাকুরী পায় না। ডাক্তারী ও ওকালতীতে পসার হয় না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর একমাত্র পেশা চাকুরী, ডাক্তারী ও ওকালতীতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হাজার হাজার প্রবাসী বাঙ্গালী আজ নিরন্ন ও ফতুর হইতে বসিয়াছে। আমার আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডে নানা দফায় পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় অ-বাঙ্গালীর শোষণেই বাংলা দেশ হইতে প্রতি মাসে ১০ কোটী হিসাবে বৎসরে ১২০ কোটী টাকা চলিয়া যায়। সে রোজগার

অদৃশ্য (invisible earning)—হঠাৎ লোকচক্ষে পড়ে না ; কিন্তু বাঙ্গালীর রোজগার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। ইহা বিহার, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাবের শিক্ষিতদিগের হঠাৎ নজরে পড়ে ও চক্ষুপীড়া তথা অন্তর্দাহের কারণ হয়। কাজেই Assam for the Assamees—আসামীর জন্য আসাম, Bihar for the Biharees—বিহারীর জন্য বিহার ইত্যাদি রোল (cry) উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলার ধন সকলেই লুঠিতেছে। বাংলার সকল দরজা খোলা, সকল প্রদেশের লোকই বাংলায় আসিয়া ধন লুঠ করিতেছে। হতভাগ্য বাঙ্গালী সবই চক্ষে দেখিতেছে, কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, নিশ্চেষ্ট ও নিঃসহায় ভাবে উপবাস করিতেছে আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে ; এবং যত কিছু অপরাধ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনেক বিষয়ের জন্য প্রকৃত দোষারোপ করিয়াছি, তাহা আমার যাবতীয় লেখনী, বিশেষতঃ দুই খণ্ড আত্মচরিতে যথেষ্ট বিবৃত আছে। কিন্তু যখন অ-বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া অন্যূন বছরে ১২০ কোটী টাকা শুষিয়া লইতেছে এবং আমরা নিশ্চেষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছি, তখন গভর্ণমেণ্টের উপর রোষ বৃথা।

এই ত গেল এক পর্ব্ব। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, চাকুরিয়া, ডাক্তার বা উকীল নূতন ধন সৃষ্টি করে না। আমাদের দেশে একমাত্র চাষীরাই কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে এবং যাহা কিছু অর্থের আদান প্রদান তাহাদেরই শ্রমলব্ধ শস্যের বিনিময়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা যত বিরাট ব্যাবসা ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হইতেছে ; কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চৌষট্টি হাজারী মন্ত্রী ও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে সামান্য কেরাণী পর্য্যন্ত সকলেই ঐ কৃষকের মেহনৎ হইতে উৎপন্ন ধন বণ্টন করে। ডাক্তার এবং উকীলও

তাই। একটি বড় ঘরের মামলা বাধিল আর ব্যারিষ্টার, উকীল ও মোক্তার মহলে পরব পড়িয়া গেল। একটা বড় ধনীর ঘরে বাঁটোয়ারা বা উত্তরাধিকার সূত্রে মামলা বাধিলে ব্যবহারজীবিগণের উল্লাসের সীমা থাকে না। যেমন মরা গরু ভাগাড়ে ফেলিলে শকুনের আমদানী হয়, তেমনি ইহাদের কে কত ছিঁড়িয়া খাইবে বা আত্মসাৎ করিবে তাহা লইয়া আসর সরগরম হয়; কথায় বলে "গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ"—অর্থাৎ জমিদার ও ধনীর ঘর উৎসন্ন যায় ও তাহাদের সম্পত্তি ইহারাই ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লয়। পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রায়ই বলিতেন, "We attorneys are licensed freebooters"—আমরা এটর্ণীকুল যেন সনদ-প্রাপ্ত দস্যুবিশেষ।

আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা। চাকুরী, ওকালতী বা ডাক্তারীতে কয়জন লোক প্রতিপালিত হইবে? গত সেন্‌সাস্ রিপোর্ট দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কিন্তু অন্ধ বাঙ্গালী তাহা বুঝিবে না। গত ৩০ বৎসর যাবৎ চোখে আঙ্গুল দিয়া এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু অরণ্যে রোদনই সার হইয়াছে। চৈতন্য যে হয় নাই, তাহা গত প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়া ১৮,০০০ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ সংখ্যা ১৫,০০০। প্রবেশার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজগুলির মহোৎসব, কারণ আয়ের পথও প্রশস্ত হইল। অদূরদর্শী বাঙ্গালী কিছুতেই বুঝিবে না যে, কেবল সরকারী চাকুরী, ওকালতী বা ডাক্তারীতে অধিক লোক প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব নহে—বিশেষতঃ বাংলার বাহিরে যখন বাঙ্গালীর দ্বার রুদ্ধ। এই তিনটি মাত্র পেশার (profession) জন্য কলিকাতা ও ঢাকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উপজীবিকার জন্য ইহাদের সম্মুখে মাত্র তিনটি পথ অবলম্বনীয়—

থোড় বড়ি খাঁড়া, আর খাঁড়া বড়ি থোড়। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজ সামান্য ২৫।৩০৲ টাকার কোনও সরকারী চাকুরী খালি হওয়ার বিজ্ঞাপন বাহির হইলে অন্যূন ৫০০ প্রার্থী হাজির; ইহার মধ্যে আবার B. A.; M. A.; M. Sc.; M. A., B. L.; M. Sc., B. L. ইত্যাদি আছে। উকীলদের ত কথাই নাই; প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি রজনী কান্ত গাহিয়াছিলেন,

"কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকীল, মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।"

ইহার ফলে কিরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বলিব। আমাদের খুলনা জেলা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তথাপি সেখানকার সদর সহরে উকীলের সংখ্যা ১৭৫ হইবে। ইহাদের মধ্যে B. L.; M. A., B. L. আছে। মোক্তারদের বাদ দিলাম। ডাক্তারের মধ্যে অন্যূন ৬০ জন—ইহাদের মধ্যে M. B. ও L. M. S. ১৪ জন হইবে। হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজ ধরিলাম না। খুলনা জেলা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহাতে ২৫৲ বেতনে ক্যাম্বেলী ডাক্তার এবং ৪০৲ বেতনে M. B.। এই বেতনের জন্যই তাহারা লালায়িত! আর কলিকাতায় ত কথাই নাই। এখানে ৩,০০০ ডাক্তার (Practitioner) হইবে। মাত্র ৮।১০ জন ১৬৲ কিংবা ৩২৲ টাকা দর্শনী পান বটে, কিন্তু শতকরা ৯৫ জনকে উপবাস করিতে হয়। ইহাদের দশা দেখিলে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের অভিভাবকগণের চৈতন্য হয় না। তাঁহারা সকলেই ভাবেন ছেলে হাইকোর্টের জজ, না হয় ডেপুটি কিংবা মুন্সেফ, অন্যূন একটা উচ্চ সরকারী পদে আরূঢ় হইবে। কেহ কেহ বা ভাবেন ছেলে পসারী উকীল বা ডাক্তার হইবে। কিন্তু একটু হিসাব করিলেই দেখা যায় যে, ২০।২৫ হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজনের হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা এবং ১০।১৫

হাজারের মধ্যে একজনের মাত্র ডেপুটি বা মুন্সেফগিরি পাইবার সম্ভাবনা।

কেহ কেহ বলেন যে, আমি বাঙ্গালীকে মাড়োয়ারী হইতে শিক্ষা দেই। তবে কি লেখা পড়া ও কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) বর্জ্জন করিতে হইবে ?

যথাস্থানে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমার নিজের জীবনেও উক্ত প্রশ্নের জবাব মিলিবে। ব্যাবসা-সূত্রে আমার উপর লক্ষ্মীর কৃপাও যে কতকটা বর্ষিত হইয়াছিল সে কথা বলিবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু ঐ কৃপাকে আমি জীবনে কখনও উচ্চ আসন দিতে পারি নাই। মেনকার কোলে শিশু শকুন্তলাকে দেখিয়া লজ্জিত ঋষি বিশ্বামিত্র হস্তপ্রসারণে যেরূপ স্বীয় দুষ্কৃতির ফলকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, আমিও অর্জ্জিত বিত্ত-সম্পদকে বর্জ্জন করিবারই প্রয়াস পাইয়াছি—অবরেণ্য বরণ করি নাই। করযোড়ে বলিয়াছি, "আমি মা লক্ষ্মীর কৃপা চাহি না। সরস্বতীর সাধনায় আমি জীবনপাত করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। একথা কখনও আমি বলি নাই যে, সকলে বিদ্যার্জ্জনে বিরত হইয়া অর্থলাভে প্রবৃত্ত হউক।"—স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

যাঁহারা সংস্কৃতি (culture) হারাইবার ভয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনোৎপাদনে নারাজ, তাঁহাদের কাছে একটি জিজ্ঞাস্য আছে—অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়জন গ্র্যাজুয়েট আমাদের দেশের ন্যায় চাকুরী, ডাক্তারী বা ওকালতী করিতে যায় ? তাহারা একটা সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক উৎকর্ষের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্র বা অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাইব যে চাকুরী, ডাক্তারী, ওকালতী এমন কি ব্যাবসা শিক্ষার জন্যই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সকলেরই আশা ভরসা ও

আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র-সম্মেলনে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে তরুণ সমাজে যে অভিযোগ ও অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ যোগ আছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকদের চিন্তার ধারা যদি বিপথে পরিচালিত হয় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। শিক্ষার সহিত বেকার সমস্যার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একের সুসমাধানের উপর অপরটির সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, কিন্তু এবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েরই অবহেলার ফলে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর প্রতি আমার সতর্কবাণী এই যে, তাঁহারা এখনও সাবধান হইয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি সহ নির্ভীকভাবে এই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হউন। নচেৎ সর্ব্বনাশের মাত্রা কোথায় পৌঁছিবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়।"

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিন দিন কিরূপ সংস্কৃতিসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া স্যার সপ্রু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যাঁহারা ওকালতী, ডাক্তারী বা ব্যাবসাবৃত্তি করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানচর্চ্চা বা সংস্কৃতির দোহাই দেওয়া শোভন ও সহজ। কিন্তু শিক্ষার মূল্য নিরূপণ কেবলমাত্র সংস্কৃতির তুলাদণ্ডে করিলে চলিবে না, উহার একটি অর্থনৈতিক সার্থকতাও থাকা চাই। আমি সংস্কৃতির বিরোধী নহি, কিন্তু বস্তুজগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সংস্কৃতির কল্পলোকে বিচরণ করিতে নারাজ। কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য—যুবকগণ দ্বারে দ্বারে সুপারিশ ও চাকুরীর সন্ধানে ফিরিয়া হতাশ হইতেছে আর অভিভাবকগণের সকল আশা ভরসায় ছাই পড়িতেছে। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই (এলাহাবাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গ্র্যাজুয়েট

পুলিশ কনেষ্টবলের চাকরীতে বহাল হইয়াছে। এম-এ উপাধিধারী যুবক রাজপথে দুগ্ধ ফিরি করিতেছে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেকে সাইকেল পিয়াদার কাজ করিতেছে, কেহ বা আইন পাস করিয়া আবগারী ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। যে দেশে বহুযুগের সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃত সংস্কৃতির ধারা চলিয়া আসিতেছে সেখানে কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কেবলমাত্র সংস্কৃতি ও জ্ঞানানুশীলনের মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিলে চলিবে না, পরন্তু অর্থনীতির দিক দিয়াও তাহারা সমাজ-দেহের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইবে। এই ব্যবস্থার সমীচীনতা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালীর লোকে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে—আমাদেরও করিবার সময় হইয়াছে।”

রামমোহন প্রমুখ দূরদর্শী মনীষিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এই আশায় যে, উহাতে দেশের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতি দূর হইবে ; কিন্তু কোথায় গেল তাঁহাদের আশা ও ভরসা, আমরা ইংরাজী শিক্ষা বলিতে বুঝিলাম কেবল একটা ডিগ্রীর তক্‌মা ও ছাপ, জীবিকার্জ্জনের পথমাত্র। ফলে কলকারখানার তৈয়ারী মালের ন্যায় রাশি রাশি গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি হইতেছে এবং কলেজের সংখ্যা নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি শিলচর, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও নূতন নূতন কলেজ স্থাপিত ; আবার মাদারিপুরের লোক তথায় একটি নূতন কলেজ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত! প্রায় ১২ বৎসর হইল আমি আহূত হইয়া মাদারীপুরে গিয়াছিলাম। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাছলে বলিলাম যে, ঘাটে যখন ষ্টীমার ভিড়িল তখন দুঃখে আমার বুক যেন ফাটিয়া গিয়াছিল। নদীর তীরে যত পাটের গুদাম তাহাতে হয় মাড়োয়ারী নয় ইউরোপীয়-ব্যবসায়ীর নামের বিজ্ঞাপন বিলম্বিত দেখিলাম।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের সহিত যখন সাক্ষাৎ হইল, প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন সাহা ব্যবসায়ী বলিলেন, "আজ্ঞে ঐ সকল বড় গুদাম আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ছিল। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের আমলে বেশ চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা গত হইলে আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ সহোদর, খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো ভাইদিগের মধ্যে, আত্মকলহ উপস্থিত হওয়ায় সবই হারাইয়াছি।" পূর্ব্ববঙ্গের যেখানে জিজ্ঞাসা করি, ঐ এক উত্তর। তাহা ছাড়া আর এক বিপদ। এই বৈশ্য, সাহা ও তিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং লেখাপড়ার সাড়া পড়িয়াছে, ফলে যাঁহারা B. A., M. A., B. L. কিংবা দুই এক স্থানে ব্যারিষ্টার বা বিলাত ফেরৎ হইতে লাগিলেন, তাঁহারা পৈতৃক ব্যাবসাকে হেয় জ্ঞান করিয়া অল্পবেতনভোগী গোমস্তা কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন। তাঁহারা নিজেরা কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া গেলেন। হুকুম হইল "রমারম্ টাকা পাঠাও।" টাকা আসিতে লাগিল এবং তাঁহাদের বাবুয়ানা নিরঙ্কুশভাবে চলিতে লাগিল। ফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে হাটখোলার একজন ধনী মহাজন ও জমিদার তাঁহার এক পুত্র সম্বন্ধে আমার নিকট পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনেন। আমি বলিলাম, "সর্ব্বনাশ, এমন কর্ম্ম করিবেন না। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনারা কেবল জমিদার নহেন, অধিকন্তু ব্যবসায়ী। এটা কি একবারও মনে হয় না যে, এই সোনার পাটের ব্যাবসা আপনাদের হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে? কিন্তু Birkmyre Bros., Ralli Bros.—ইহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হন না কেন? আজ সমস্তই মাড়োয়ারীর হাতে যাইতে বসিয়াছে। আপনাদের কত সুবিধা; পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত ব্যাবসা-বুদ্ধি আছে, সুতরাং পুত্রগণকে এই পথের পথিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ।" কিন্তু কিছুতেই মত ফিরাইতে পারিলাম না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ

আছে, "Those whom the gods want to destroy, deprive of reason first"—দেবতা যাহাকে ধ্বংস করিতে চাহেন সর্ব্বাগ্রে তাহার বিচারবুদ্ধি হরণ করেন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যেন এই অভিশাপগ্রস্ত।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি চাকুরিয়া, ডাক্তার বা উকীল শ্রেণী নূতন অর্থ উৎপাদন করে না, যে অর্থ দেশে আছে তাহাই ভাগাভাগি করে। ইহারা বাহির হইতে দেশে ধনাগমের পথ পরিষ্কার করে না। দুই-এক কথায় বুঝাইতেছি। মনে করুন একজন হাইকোর্টের জজ মাসিক ৪,০০০৲ টাকা বেতন পান, অর্থাৎ বৎসরে ৪৮,০০০৲ টাকা; হিসাবের সুবিধার জন্য না হয় ৫০,০০০৲ টাকাই ধরিলাম। এই টাকায় তাঁহার স্ত্রী-পরিবার না হয় সুখে স্বচ্ছন্দে মোটর গাড়ী চড়িয়া ভাল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কাটাইলেন এবং মৃত্যুকালে না হয় তিনি ৩।৪ লাখ টাকা রাখিয়া গেলেন। ইহার সহিত বেলেঘাটার একজন ব্যাবসাদারের তুলনা করা যাউক। তাঁহার গদিতে প্রত্যহ কত বোঝাই নৌকা বালাম চাউল লইয়া আসিতেছে, আবার সে মাল ঝাড়িতে কত মুটে মজুর খাটিতেছে; অধিকন্তু বেচা-কেনা ও নিকাশে কত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, কত দালালই বা খাটিতেছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল কিস্তীর নৌকা চালাইয়া বহু মাঝি মাল্লার অন্নসংস্থান হয়। আরও গোড়ার কথা—বরিশাল অঞ্চলে এই চাউল সংগ্রহ করিতে, চালান দিতে, কত লোকই না লাগে, ঢেঁকি পাতিয়া ধান কুটিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়াও অনেক শত অনাথিনী বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। এ সকল ধরিলে দেখা যাইবে যে, গদীয়ান বা মহাজন যদি বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা মুনাফা করেন, তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মচারী, মুটে, মজুর, মাঝি মাল্লা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লোকে চাউলের প্রতিনিয়ত চালানে বৎসরে অন্ততঃ ৩।৪ লাখ টাকা পায়। হাটখোলার পাটের গোলাদারও এই প্রকারে ব্যাবসা প্রসঙ্গে অনেক অর্থ বিতরণ করেন।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টের জজ না হয় অপর চাকুরিয়া অপেক্ষা আরও পাঁচ বৎসর অধিক চাকুরী করেন, কিন্তু তাহার পরই তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। চাকুরী যতই দীর্ঘকাল-ব্যাপী হউক না কেন, উহা স্বল্পায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথায় বলে চাকুরী 'তালপাতার ছাউনী'। পক্ষান্তরে ব্যাবসা একবার ফাঁদিয়া বসিতে পারিলে পুরুষানুক্রমে চলে এবং কত লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। চাকুরিয়ার যদি অসুখ বিসুখ বা মৃত্যু হয় তবে তাঁহার পোষ্যগণের কষ্টের অবধি থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অসহায় ও নিরন্ন হইয়া পড়ে।

আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক আরও কিছু বলিব। আমাদের "বেঙ্গল কেমিক্যালে" প্রায় ২,০০০ কুলী মজুর খাটে ও ৪।৫ শত উচ্চ, মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত অল্প-বেতনভোগী ভদ্রলোক কর্ম্মচারী আছে। এই সমস্ত লোক মাসে মোট প্রায় ৮০ হাজার অর্থাৎ বৎসরে সাড়ে নয় লাখ টাকারও অধিক রোজগার করে। এতদ্ব্যতীত অদৃশ্য বা পরোক্ষভাবে অনেকে অনেক প্রকারে বহু টাকা বেঙ্গল কেমিক্যালের কারবার প্রসঙ্গে উপার্জ্জন করে। কাঁচা মাল (raw materials) সরবরাহ করিতে কত লোক খাটে। ইতালী ও জাপান হইতে গন্ধক, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে নানাপ্রকার কাঁচা মাল ও রাসায়নিক দ্রব্য, মাদ্রাজের সালেম হইতে Magnesite, এবং জব্বলপুর হইতে Bauxite নামক পাথর বিশেষ, হিমালয়ের পাদদেশ হইতে Aconite (মিঠা) Hyoscyamus, Belladonna, Digitalis, চিরেতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সংগৃহীত হইয়া আসে, এতদ্ভিন্ন আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার নানা স্থান হইতে অশোকছাল, বাকসের পাতা, কালমেঘ প্রভৃতি আসে। মাল আনিতে রেল ও জাহাজ ভাড়ায় কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবং বিদেশ হইতে যখন মাল আসে তখন সেই সকল দেশের এজেন্ট ও সরবরাহকগণই বা কত টাকা লাভ করিয়া থাকে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই কারখানায় প্রত্যহ গড়ে ৩৫০টি প্যাকিং বাক্স লাগে। ইহার তক্তা সুন্দরবন অঞ্চলজাত গেঁয়ো কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকার কাঠ লাগে। কাঠ কাটিতে বহু কাঠুরিয়ার প্রয়োজন হয়। ঐ সকল কাঠ চালান দিতে ৫০০।৭০০-মনী কিস্তীর নৌকা দরকার; নৌকা চালাইতে বহু মাঝি মাল্লা খাটে, নৌকা নির্ম্মাণ করিতে কত শত ছুতার মিতস্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এতদ্ভিন্ন সার্জ্জিকেল ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার পাতলা কাপড় বুনিতে প্রায় ৪।৫ শত জোলা সদা নিরত। এই সব হিসাব করিলে দেখা যায়, কারবারের খাঁটি মুনাফা অপেক্ষা বহুগুণ টাকা নানাপ্রকারে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। শাস্ত্রকারগণ সাধে বলিয়াছেন:—

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ", ইত্যাদি।

বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালী এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এক সর্ব্বনাশের বীজ লুক্কায়িত ছিল; ব্যাবসা ব্যাপারে রোজগার ও পদ-গৌরবের মাপে যোগ্যতার বিচার হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, পসারওয়ালা বড় রোজগারী ব্যবহারজীবিগণ "সবজান্তা" ভাবে বিরাজ করেন। অমুক লোকে কত টাকা রোজগার করেন তাহা দেখিয়া আমরা কর্ম্মীর মূল্য নিরূপণ করি। ইহার কারণ এই যে, ব্যাবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন এমন লোকের অভাব। পরলোকগত ৺গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ব্যবস্থাপক সভায় অর্থসচিবের প্রদত্ত বাজেট সমালোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে স্যার বিঠলদাস ঠাকুরজী প্রভৃতি মিলমালিক এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যে রত প্রবীণদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। আমরা ভুলিয়া যাই যে, একজন মুন্‌সেফ বা হাকিম আজীবন নথি ও নজীর ঘাঁটিয়া আইন বিষয়ে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিলেও অপর বিষয়ে, বিশেষতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ব্যাপারে শিশুর ন্যায় অনভিজ্ঞ।

কিন্তু স্বদেশী যুগের বাংলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম সর্ব্বনাশ ঘটাইল। ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল প্রভৃতি সম্বন্ধে বাঙ্গালীর যখন চোখ ফুটিল তখন বড় বড় ব্যারিষ্টার, উকীল, জমিদার ও ডাক্তার প্রভৃতি স্বদেশী কারবারের কর্ণধার বা ডিরেক্টর হইয়া বসিলেন। অর্থে ও পদমর্যাদায় তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় হইলেও কারবারী বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না, কিন্তু "মোড়লী" করিতেও তাঁহারা ছাড়িলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ নিত্যকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন; সারাদিনের মেহনতের পর একবার আপিসে দর্শন দিয়া ব্যাবসা চালাইতেন। সেই পাপে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে বঙ্গলক্ষ্মী ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যৌথকারবারে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী যে আবার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে এরূপ মনে করিতে ভরসা হয় না। হয়ত আমি পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠাতৃগণকে অকারণ দোষারোপ করিতেছি। তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই কথা বলিবার আছে যে, অন্য কোন শ্রেণীর লোক এই কাজে আগুয়ান হইলেন না কেন? ইহাও বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, কামারের কুমোর বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নহে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া ইউরোপীয় বা ভারতীয় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা উচিত ছিল। বাংলার দশা যাহাই হউক না কেন, বোম্বাই অঞ্চলে যোগ্য লোকের অভাব হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা "সবজান্তা" হইয়া সব পণ্ড করিলেন।

এ অযোগ্যতার দুর্ভাগ্য বাংলার নিজস্ব দুর্ভাগ্য। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা একমুখী হইয়াছে অর্থাৎ চাকুরীমুখী হইয়াছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপন হইতে গত ১২৫ বৎসর যাবত এই একঘেয়ে শিক্ষার ফলে আমরা সকল প্রকার ব্যাবসা-বাণিজ্য, এমন কি অন্তর্বাণিজ্য পরহস্তে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে বসিয়াছি। কিন্তু বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে সর্ব্বনাশ ততদূর গড়াইতে পারে নাই। সেখানকার লোক বাঙ্গালীর ন্যায় চাকুরীসর্ব্বস্ব নহে,

শিক্ষাও তাঁহাদের একমুখী নহে। সেখানে ব্যাবসা-বুদ্ধির সম্মান ও আদর আছে। সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া আজ ভারতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, উহার স্থাপয়িতা ও সর্ব্বময় কর্ত্তা স্যার পোচ্খানওয়ালা পূর্ব্বে একটি ব্যাঙ্কে সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই পদে থাকিয়াই তিনি প্রতিভার প্রচুর পরিচয় দিয়াছিলেন। এক সময়ে ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ তাঁহার শ্রেষ্ঠ দাবী উপেক্ষা করিয়া একজন ইংরাজকে তাঁহার উপরে নিযুক্ত করিলেন। এই পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। বোম্বাই সহরে ধনী ও গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না, তাঁহারা সাগ্রহে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। যোগ্যতা ও তাহার সেই সমাদরের ফলে সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের আজ এই সুপরিণতি। ইহারই পাশাপাশি বাংলার শিক্ষার গতি ও ব্যাবসা-বুদ্ধির দৈন্যের কথা মনে করিলে নৈরাশ্যে মন পীড়িত হয়।

পাঠক-পাঠিকাগণ, এখন আশা করি বুঝিতে সক্ষম হইবেন কেন অন্ন সমস্যায় হটিয়া বাঙ্গালী আজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বিপদ শুধু ইহাই নহে ; "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"—বাঙ্গালীর অভাবে পড়িয়া স্বভাব নষ্ট হইতেছে। জাতিগত যে সকল গুণ ছিল তাহাও সে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আজ হারাইতে বসিয়াছে। আজ আমাদের উচ্চ উপাধিধারী বহু যুবক অন্নবস্ত্র সমস্যার কোনরূপ সমাধান করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইতেছে, কখনও বা নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর সহ্য হয় না! আর একটি কথা—জাতীয় কলঙ্কের কাহিনী গোপন করিলে চলিবে না। ফাঁকিদারী ও চতুরতায় বাঙ্গালী সুনিপুণ। পরীক্ষা পাসেও ফাঁকিজুঁথি ; অর্থাৎ পাঠ্য পুস্তক পড়িব না, কোনও প্রকারে পরীক্ষার পূর্ব্বাহ্ণে নোট মুখস্থ করিয়া পাস হইব। ইহা দ্বারা হয়ত পাস হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রেও ঐ ফাঁকিদারী—কঠোর পরিশ্রম সহকারে অনন্যমনা হইয়া

ব্যাবসা শিখিতে নারাজ; সকল বিষয়েই ফন্দিবাজী ও চতুরতা। কথায় বলে—যত চতুর তত ফতুর। বাঙ্গালী সত্য সত্যই ফতুর।

অবতরণিকার এই কয়টি কথায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল তাৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিলাম। প্রবন্ধগুলিতে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। আমার আজীবনের অভিজ্ঞতা ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অনেকস্থলে পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হইবে। কিন্তু বাংলার শক্তি সামর্থ্যের কিরূপ অপচয় হইতেছে, এবং কিরূপে তাহা অন্য পথে ফিরাইতে পারা যায়, সেই চিন্তা আমাকে একপ্রকার প্রলাপগ্রস্ত করিয়াছে, সুতরাং বিবিধ দিক হইতে আমি একই বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

আমার আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড তিন বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। এই উভয়খণ্ডে সমগ্র বিষয় ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে। যাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী মা লক্ষ্মীগণ ইহা পড়িতে সমর্থ হন তাহার জন্য উহার বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার বিভাগের (Publicity) কর্ম্মচারী শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য

কেহ কেহ আমার প্রতি এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, আমি বাঙালী ছেলেদের কেবল মাড়োয়ারী হইতে বলি,—যেন আমি আমার জীবনে সরস্বতীর উপাসনা বর্জ্জন করিয়া কেবল ধনোপার্জ্জনেই মত্ত আছি। এই অভিযোগটি নিশ্চেষ্টতা ও শ্রমবিমুখতার অজুহাত মাত্র।

স্কুল ও কলেজে বৎসরে প্রায় চার-পাঁচ মাস ছুটি এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে সাত মাস, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ও সেই পথ অনুসরণ করিতে পারিলে বাঙালী যুবকের হয়ত এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু গোড়ায়ই গলদ, আজ যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে ইহার জন্য ছাত্রগণ অপেক্ষা অভিভাবকগণই বেশী দায়ী। বাস্তবিক তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের কি ভীষণ পরিণাম। আমি বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইয়াছি যে, দশ হাজার আইনের উপাধিধারীদের মধ্যে (বি-এল্; এম-এ, বি-এল্; এম্-এল্; ডি-এল্) হয়ত মাত্র একজন হাইকোর্টের জজ বা এডভোকেট-জেনারেল হইবে এবং এই শ্রেণীর এক হাজার উপাধিধারীর মধ্যে হয়ত একজন মুনসেফ, সবজজ বা পশারী উকীল হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আর আর সকলের কি উপায় হইবে? আলিপুর কোর্টে ন্যূনাধিক সহস্র এবং মফঃস্বল জেলা ও মহকুমায়ও নিতান্ত কম হইবে না। আমার ক্ষুদ্র খুলনা জেলার সদরেই ১৭৫ জন উকীল হইবে, এবং সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রত্যেক মহকুমাতেও একশ' জনের কম হইবে না।

খোঁজখবর করিয়া জানিয়াছি যে, ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনের এক প্রকার আয় আছে এবং শতকরা দশজনের কোন রকমে চলে, আর বাকী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের যে কি প্রকারে দিন গুজরান হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাই না। তাঁহারা কি বাতাস খাইয়া থাকেন ? ছোট আদালতে ও পুলিস কোর্টে গেলে দেখা যায়, উকীলবর্গ একেবারে মৌমাছির মত ঘিরিয়া ফেলে, অনেকের ট্রামের ও বাসের ভাড়া জোটে কি-না সন্দেহ। আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছি যে, স্যর রাসবিহারী ঘোষ একজন এম-এ, বি-এল্‌; স্যর আশুতোষ একজন এম-এ, বি-এল্‌; শ্রীমান্‌রাও এম-এ, বি-এল্‌ হইবার জন্য ব্যস্ত, কারণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মত "যে বস্তুগুলি একই বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান হয়।" হায়! কত উজ্জ্বল প্রতিভা 'বহ্নিমুখং পতঙ্গমিব' হুতাশনে ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কত আশা-ভরসা, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরিতে পর্য্যবসিত হয়; তাহাও আজকাল দুষ্প্রাপ্য। আদালতের একটি নকলনবীশের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইলে বোধ হয় কয়েক শত প্রার্থীর আবেদনপত্র আসিয়া দাখিল হয় এবং তাহার মধ্যে এম এ, বি-এল্‌ও পাওয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, "The law has been the grave of many brilliant careers"—আইন ব্যবসা অনেক উজ্জ্বল প্রতিভার সমাধিস্থলে পরিণত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই হৃদয়বিদারক অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'গোড়ায়ই গলদ'। আসল কথা এই যে, আমাদের মা-বাপ ও অভিভাবকগণ বংশপরম্পরায় প্রচলিত এক ভ্রমাত্মক সংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, যেন-তেন-প্রকারেণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা না মিলিলে বুঝি জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রায় পঁচিশ বৎসর

পূর্ব্বে "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কতকটা অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সময় যে-ব্যক্তি কতকগুলি ইংরেজী কথা বা ছড়া বলিত তাহারই জয়জয়কার এবং ইংরেজ সওদাগরের আপিসে তাহাদের চাকরিরও খুব সুবিধা ছিল।

তাহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র ডিপ্লোমা এমন কি জুনিয়র ডিপ্লোমা পাইলেও অমনি তৈয়ারী চাকরি। তারপর ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে আইন বিভাগও খোলা হইল। কিছুকাল 'পাস-করা' ছেলেদের চাহিদা বাড়িয়া গেল, কারণ কোম্পানীর রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিভাগও খুলিতে আরম্ভ হইল। সরকারী দপ্তরখানার কলেবর বৃদ্ধি ও কৃষি, পুলিস, অরণ্য ইত্যাদি বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়া এই সমস্ত পাস-করা ছেলেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদালতে আবার পার্শীভাষার স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্ত্তিত হইল। বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ইংরেজী ভাষার বহুল প্রচার হইল। এই সময় বিহার, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পশ্চাৎপদ ছিল। কাজেই যখন বাংলা দেশ এই সব মসীজীবী দ্বারা ছাইয়া গেল, তখন ঐ সব প্রদেশ হইতে ইহাদের ডাক পড়িল। দলে দলে উপাধিধারী বাঙালী আবার সেইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অযোধ্যা, ঝাঁসী, পাঞ্জাব প্রভৃতি অধিকৃত হইলে শিক্ষিত বাঙালী পঙ্গপালের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইল, এবং এ সমস্ত যখন কানায় কানায় ভরিয়া গেল তখন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ জয় করা হইলে শিক্ষিত বাঙালীরা আবার সেই দিকেও ছুটিল। এই নূতন অধিকৃত ব্রহ্মদেশেও বাংলা দেশের ন্যায় নূতন দপ্তরখানা, আইন আদালত ইত্যাদির সৃষ্টি হইল। এই সময় ব্রহ্মদেশবাসিগণ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারিত না, কাজেই অপর প্রদেশের লোকেরা প্রায় সমস্ত

চাকরি একচেটিয়া করিয়া বসিল। বাঙালী তখন বুঝিল না, এর পরিণাম কি ভীষণ। এখন এক উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই পাঁচ ছয়টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দিল্লী, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়, এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত অনেক স্কুল ও কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলার সহিত পাল্লা দিয়া গ্রাজুয়েট উদ্গিরণ করিতেছে, কাজেই বাঙালীর প্রতি বিদ্বেষবহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তাহারা তারস্বরে বলে, বিহার প্রদেশ বিহারীদের জন্য, পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য, ব্রহ্মদেশ বর্ম্মীদের জন্য, ইত্যাদি। সুতরাং বাঙালীর স্থান কোথায় ?

১৯১১ সালে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হইল তখন রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। কাজেই ভারত-সরকারের দপ্তরখানার বড় বড় কর্ম্মচারীগণ দিল্লী ও সিমলায় আসিয়া হাজির হইলেন। এখন আর দুর্দ্দশার সীমা নাই। সম্প্রতি আমার নয়াদিল্লীতে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীগণ (যাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন কেরাণী শ্রেণীভুক্ত) বাঙালী স্কুলের প্রাঙ্গণে আমাকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সংখ্যায় প্রায় আড়াই হাজার, তিন হাজার সেখানে সমবেত হইয়াছিল। আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলাম যে, এই সকল নব্য বালক ও যুবকের উপায় কি হইবে ?

এখন বুঝা যায় যে, যাঁহারা একবার কলেজে পড়িয়াছেন তাঁহাদের দফা রফা। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহারা আঠার-কুড়ি-পঁচিশ টাকায় শহরে থাকিয়া সামান্য কেরাণীগিরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু কিছুতেই পাড়াগাঁয়ে যাইতে চাহেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, যে সব কলেজের ছাত্রেরা রাজপুরীর মত হোষ্টেলে বাস করে তাহাদের মধ্যে কয়জনের দেশে ঐরূপ বাসভবন আছে ? পাড়াগাঁয়ে যাইতে চাহে না তাহার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলে তাহাদের বাপ-খুড়োরা এখনও সাদাসিধা ভাবে নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ দু-পয়সা

রোজগার করিয়া থাকেন। যশোহরে এবং খুলনার দৌলতপুর ও বাগেরহাট অঞ্চলে এখনও অনেক বারুজীবী আছেন যাঁহারা পানের ব্যবসায় করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর দশ-বার জন পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারীও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যায়, কলেজের ধাপ মাড়ান কেন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলে তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায় এবং তাহারা ষাঁড়ের গোবরে পরিণত হয়। কেহ কেহ আমাকে বলিয়া থাকেন, আপনি কলেজের ছেলেদের উপর এত দোষারোপ করেন কেন? কলেজে মাত্র না-হয় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু বাংলা দেশে আরও যে লক্ষ লক্ষ ছেলে তাহারা ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জনের পথ সুগম করিতে পারে। কিন্তু আমি তাহার উত্তরে বলি, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী যেখানে প্রচলিত সেইখানেই এই বিষ অনুপ্রবিষ্ট! মৌলবী আবদুল করিম শিক্ষাবিভাগের একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, উচ্চশ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়াও অনেক সুচিন্তিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি:

"এক সময় বাখরগঞ্জ জেলা পরিভ্রমণকালে আমি দেখিলাম যে, একটি প্রাইমারী স্কুল অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে; বিদ্যালয়টির পরিদর্শন হইয়া গেলে আমি সেখানকার কতকগুলি লোককে বলিলাম যে, বিদ্যালয়টি যাহাতে বেশ ভালভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। আমার কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে বলিল, 'যেদিন স্কুল উঠিয়া যাইবে সেইদিন হরির লুট দিব'। পরিশেষে যখন আমি সেখানকার পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে, ছেলেরা সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াই তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাহারা নিজেদের দোকানে বসিয়া বেচা-কেনা করিতে লজ্জা বোধ করে।"

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এমন সব হিন্দু রজক ছিল যাহারা মাসে একশ-দেড়শ টাকা রোজগার করিত। বড় বড় জাহাজ গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিলে রাশি রাশি মলিন বস্ত্র এই রজকের নিকট ধৌত করিবার জন্য বিলি হইত। কিন্তু যখন এই সব রজকের সন্তানগণ একমাত্র ইংরেজী স্কুলে প্রবেশলাভ করিয়া কোন রকমে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িল অমনি তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া গেল! বাঙালী দিন দিন যে শুধু কঠোর প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতেছে তাহা নহে, এই রকম মিথ্যা মর্য্যাদাবোধও তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা

অধুনা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রায় অশিক্ষাতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই তথাকথিত শিক্ষার মোহে পড়িয়া বাংলার যুবকগণ তাহাদের ভবিষ্যৎকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

পুরাকাল হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশে একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের দুই একটি জেলার সমান এই ক্ষুদ্রায়তন দেশে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রামে গ্রামে শত শত পাঠশালা বিদ্যমান। এই কারণে, ঐ দেশের সামান্য শ্রমজীবি এবং চাষীর ছেলেরাও প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মনীষী কার্লাইলের জীবনচরিতপাঠে ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

বাল্যকাল হইতে বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বোঝা যায় যে, তাহার ভাবী উন্নতির আশা কিরূপ। একটি চল্‌তি প্রবাদ আছে, "উঠন্তি মূলোর পত্তনেই বোঝা যায়" অর্থাৎ কোন্ ছেলের দৌড় কত দূর এবং কোন্‌দিকে তাহার প্রতিভা খেলিবে তাহা বাল্যকাল হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে সর্ব্বনাশের মূল এই যে মা-বাপ ও অভিভাবকগণের ইচ্ছা, তাঁহাদের প্রত্যেক ছেলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বি-এ, বি-এস্ সি; এম্-এ, এম্-এস্-সি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইবে। তাঁহাদের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ভাবী জীবনযাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এইজন্য জোরজবরদস্তি করিয়া প্রত্যেক ছেলেকেই পাস করান চাই এবং যদি দেখেন যে, কোন ছেলে ইংরেজীতে, সংস্কৃতে বা গণিতে

একটু পশ্চাৎপদ অমনি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া দেওয়া হয়, অবশ্য যদি অবস্থা স্বচ্ছল থাকে। যেন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য 'ডিগ্রী' ও 'নকরী' লাভ। আমার শৈশবাবস্থা হইতে এই ছড়াটি শুনিয়া আসিতেছি—

"লেখাপড়া করে যে-ই
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে-ই"

আমার স্মরণ আছে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রায়ই বলিতেন "পাসায় অধ্যয়নম্"। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলেই একটি চাকরি মিলিত, না-হয় ডাক্তারী ও ওকালতীর দ্বারা রোজগারের পথ পরিষ্কার হইত, সেইজন্যই এই সময় ডিগ্রীর উপর একটি কৃত্রিম মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে-ছেলে পরীক্ষায় যত উচ্চ স্থান অধিকার করিত তাহার তত মোটা মাহিনার চাকরি মিলিত। জলপানি-পাওয়া ছেলেদের আরও আদর, এই রকম পাস-করা ছেলেদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য সমাজের বড় বড় লোকও লালায়িত হইত এবং বিবাহের নিলামে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হইত। এই স্থানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বরিশালের প্রথিতনামা অশ্বিনীবাবু বলিতেন, "আমি যদি জানিতাম যে, এই ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করাতে অবিবাহিতা কন্যার পিতার রক্ত শোষণ করিবার কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে কখনও এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম না।"

আমাদের বালকদের এই একমুখী শিক্ষাই যত রকম অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। মনে করুন, এক বাপের চার ছেলে, তাহাদের মধ্যে যে ছেলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আছে তাহাকেই বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকেই যে উপাধিধারী করিতে হইবে এরূপ অদ্ভুত বা উৎকট রীতি পৃথিবীতে

আর কোথাও দেখা যায় না। ছেলেদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যে কি সর্ব্বনাশের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা বলা যায় না। আজ শতাধিক বর্ষ যাবৎ অর্থাৎ হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের পর হইতে আমাদের সমাজে এমন একটি হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, ছেলেরা ভাবে পাস না করিতে পারা একটি অপরাধ। কলিকাতার অনেক পাড়ায় যেখানে খুব ঘনবসতি এবং সূর্য্যাস্তের পর এক ছাদ হইতে অপর ছাদের মেয়েদের সহিত আলাপ-পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, সেখানকার একটি কাল্পনিক কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি, "দেখ বোন, অমুকের ছেলেটি কেবল যে পাস করল তা নয়, ২০৲ জলপানিও পেয়েছে, কিন্তু আমার কি পোড়াকপাল! ছেলেটা এবার ফেল হয়েছে!" কিন্তু তখন তিনি ভুলিয়া যান যে, অন্তরাল হইতে ছেলে কান পাতিয়া সব শুনিতেছে। আজ বহুদিন হইতে আমাদের সমাজের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে, যে-ছেলে পরীক্ষা পাস করিতে পারিল না তাহার জীবন বিফল ও নিরর্থক। এই ধারণার যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অকৃতকার্য্য হইয়া মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়, এমন কি, আত্মহত্যাও করে; ইহার জন্য দায়ী মা-বাপ, অভিভাবকগণ ও সমাজ।*

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাস-করা ছেলের দ্বারা বড় একটা মহৎ কিছু সম্পাদিত হয় নাই। কারণ তাহারা আটঘাট-বাঁধা ধারাবাহিক কাজ ভিন্ন অন্য কিছু করিতে সক্ষম হয় না। পাস-করা

---

*ইউনাইটেড্ প্রেস গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ একটি শোচনীয় ঘটনার সংবাদ প্রেরণছলে লিখিতেছেন—

"পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া রামদিয়া বেণীমাধব হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর জনৈক ছাত্র মনের দুঃখে চলন্ত ট্রেণের নিয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অদ্য আত্মহত্যা করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ছেলে ও টুলোপণ্ডিত অনেকটা এক ধরণের। একটি প্রচলিত কথা আছে, ন্যায়পঞ্চানন বা তর্করত্ন মহাশয় গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে প্রাতঃকৃত্য করিতে গিয়াছেন, কিন্তু ফিরিবার সময় ন্যায়শাস্ত্রের ফিকিরী আলোচনা করিতে করিতে তন্ময় ও অন্যমনস্ক হইয়া যখন গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। পুঁথিগত বিদ্যা যথার্থ ই ভয়ঙ্করী। কতকগুলি গৎ মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে পারাই যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ভ্রমাত্মক ধারণা যতদিন না আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততদিন বাঙালী জাতির উদ্ধার নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডক্টর হ্যান্‌কিন্‌ একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে কেতাবী বিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা জীবনসংগ্রামে সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হয়।

বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভ বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে না পারায় ডান্‌পিটে ছেলেদের নেতা হইয়া নানা প্রকার লঙ্কাকাণ্ড করিতেন, কখনও বা উচ্চ গির্জ্জার শিখরে আরোহণ করিয়া ভয় দেখাইতেন যে, সেইখান হইতে পড়িয়া মরিবেন। তাঁহার পিতা এই ডান্‌পিটে ছেলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের বলিয়া কহিয়া পুত্রের জন্য একটি কেরাণীগিরি জুটাইয়া তাহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। এই রবার্ট ক্লাইভ যে কি প্রকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমগ্র আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা সিসিল্‌ রোড্‌স্‌ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় আদৌ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী স্যর জোসাইয়া চাইল্ড্‌স্‌

একটি আপিসের ঝাড়ুদার ছিলেন, লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নতিলাভ করেন এবং সর্ব্বশেষে ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন।

বাঙালী ছাত্র প্রায়ই নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্বানুভব করে, কিন্তু কথায় বলে 'যত চতুর তত ফতুর'—কথা বেচিয়া খাওয়া কয়দিন চলে? 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।' বাঙালী ছেলেদের শৈশবাবস্থা হইতে এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করা অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া পাস করা একটি চরিত্রগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, লেকচার-প্রসঙ্গে কোন বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য নানারকম দৃষ্টান্তের সহায়তায় যদি সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা যায়, তবে ছেলেরা কখনও মনোযোগ দিবে না এবং ইহার দরুণ যদি তাহাদিগকে ধমক দেওয়া যায় তাহা হইলে নির্লজ্জভাবে বলে 'মহাশয়, ও ত পরীক্ষা পাস করিতে লাগিবে না!' শুধু কলেজের ছেলেদের দোষারোপ করিতে চাহি না, স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। বাল্যকালে আমরা যখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন অভিধান দেখিয়া শব্দার্থ বাহির করিতাম, এমন কি সময়ে সময়ে ওয়েব্‌ষ্টার দেখিয়া শব্দের প্রমাণ ও প্রয়োগ জানিতাম, কিন্তু ইদানীং অভিধান ব্যবহার করা প্রায় লোপ পাইয়াছে। দুই একটি ছেলের কাছে দুই-একখানি পকেট অভিধান দৃষ্ট হয় মাত্র। পাঠ্য পুস্তকের যে-কয়েকটি নির্দ্ধারিত গল্প থাকে তাহা অপেক্ষা অর্থ পুস্তকের আয়তন দুই তিন গুণ হইবে। সময়ে সময়ে ইহা পঞ্জিকার ন্যায় কলেবরও ধারণ করে, সুতরাং অভিধান দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আবার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা ইংরেজী ভিন্ন রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য নির্দ্ধারিত পুস্তকের ধার ধারে না।

আই-এ, আই-এস্ সি, বি-এ, বি-এস্ সি মাত্র দুইবৎসর করিয়া পড়িতে হয়। ইহার বার আনা সময়ই আলস্যে ও ঔদাস্যে অতিবাহিত হয়; কারণ তাহারা জানে যে, পরীক্ষার দুই মাস আগে হইতে টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া বেশ পাস করা যাইবে, এমন কি, ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা যত নির্ব্বোধ তাহারাই তত বড় বড় পুস্তক পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞানস্পৃহা বর্ত্তমানকালের ছাত্রবর্গের মন হইতে দিন দিন তিরোহিত হইতেছে এবং যাহা জ্ঞান তাহা কেবল ভাসা ভাসা। এখনকার উপাধি-ধারীদের মধ্যে পল্লবগ্রাহিতাই বিশেষভাবে দেখা যায়।

আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, বিদ্যাশিক্ষা মানে ক্লাস-প্রমোশন ও পরীক্ষা-পাস; ইহা প্রকৃত শিক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যাশিক্ষা কখনও খানকয়েক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। আমি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ও প্রবন্ধাদিতে এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইয়াছি যে, জগতে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজনীতিক্ষেত্রে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিশেষ ধার ধারিতেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই একজন গ্রন্থকীট ছিলেন। মার্কিণ দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক এমার্সন্ বলেন, "যদি আমাকে কেহ কোন স্কুল পরিদর্শন করিতে বলেন তাহা হইলে বাজে বই হইতে কে কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহাই জানিতে চাই। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমি নেপোলিয়ান সম্বন্ধে কি জান? কাহাকেও বা গ্যারিবল্ডি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকি।" আমাদের বাংলা দেশে যে কয়জন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, যথা —রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—ইহাদের প্রত্যেকেই অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। একা শরৎচন্দ্রের একখানি পুস্তিকা—'নারীর মূল্য'—পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, ইহার পাণ্ডিত্য কত গভীর। এই

পুস্তিকাখানির পাদটীকায় যে-সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীরা হয়ত তাহার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই। এই সাহিত্যরথীত্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধরেন নাই।

ছেলেদের জন্য প্রাইভেট টিউটর বা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা প্রকৃত বিদ্যালাভের আর একটি প্রধান অন্তরায়। ষাট বৎসর যাবৎ এই কলিকাতায় দেখিতেছি, যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন তাঁহাদের ধারণা যে, ছেলেদের জন্য মাষ্টার না রাখিলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে যে কেবল স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাই নহে, প্রকৃত জ্ঞান-লাভেরও অন্তরায় ঘটে। একে ত ছেলেরা দশটার সময় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত মুখে দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে, তাহার পর দশটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত ক্লাসের পর ক্লাস, মাঝে মাত্র আধ ঘণ্টা টিফিন। ছুটি হইলেই বাড়ি আসিয়া কিছু জলযোগ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই সময় তাহাদের খেলাধুলার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু দেখা যায়, মাষ্টার বাবু আসিয়াছেন। বেচারাকে পুনরায় আবার পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইল। শিক্ষক মহাশয়ও তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য ছেলেকে অভিধান খুলিতে এবং অঙ্ক বা জ্যামিতির অনুশীলন নিজের মাথা ঘামাইয়া করিতে দিবেন না। সব নিজেই সমাধান করিয়া দিবেন। ইহাতে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা অভাবে কোন রকমেই বিকাশ পায় না, অধিকন্তু তাহাকে তোতাপাখী করিয়া তোলা হয়। আমি অবশ্য এ-কথা স্বীকার করি যে, ছাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে একটু কাঁচা থাকে তাহা হইলে একটু সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেক ছেলের পিছনে শিক্ষক লাগাইয়া তাহাদের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করা নিতান্তই গর্হিত। ইংরেজীতে একটি ছড়া আছে—

"Work while you work
Play while you play"

অর্থাৎ যখন পড়িবে মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং যখন খেলিবে তখন অন্য কিছু করিবে না। কিন্তু অভিভাবকগণের হুকুম—কেবল 'পড় পড় পড়'। লাভের মধ্যে এই যে, ছেলেরা পড়াশুনাকে একটি বিভীষিকা বলিয়া মনে করিয়া বসে, এবং স্কুলের ছুটির পরেই গৃহশিক্ষকের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হওয়া দূরে থাকুক একেবারে ভোঁতা হইয়া যায়।

বাঙালী ছাত্রের জীবনে আর একটি অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এই, ইহাতে কোন রকম বৈচিত্র্য নাই। জীবন-ধারা সুখকর করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটি খেয়াল পরিপোষণ করা প্রয়োজন; ফুলের বাগান করা, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রবিদ্যা, দশ-পনর মাইল পদব্রজে ভ্রমণ এবং বনে জঙ্গলে চড়ুইভাতি বিশেষ আমোদজনক। অবশ্য কলিকাতায় স্থান-সঙ্কীর্ণতার জন্য ইহার কতকগুলি ব্যাপার সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু আবার নানাবিষয়ক বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞানলাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ কলিকাতার ন্যায় অন্যত্র কোথাও নাই। আমি লণ্ডনে চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছি যে, প্রত্যহ শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় সমবেত হইয়া জীবজন্তুর জীবন-যাত্রাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময় ইহা হইতে অনেকের মনে প্রাণিবিদ্যা শিখিবার একটি প্রেরণা জাগিয়া উঠে, কিন্তু আমাদের এখানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতার যাদুঘরে একটিমাত্র কক্ষে এত শিখিবার জিনিষ আছে যে, তাহা বোধ হয় সমস্ত জীবনেও শেষ করা যায় না। ইহা ছাড়া বহু চিত্রশালাও আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর প্রায়ই কালীঘাট-ফেরতা তীর্থযাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতার ছেলেরা শৈশব কাল হইতে যেন জড়ভরত হইয়া থাকে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া বরাবর বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়া জোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত যাই। আমি দেখিয়া অবাক হই, দশ-পনর কুড়ি বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট পঁয়ষট্টি বৎসরের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দুধারে রকের উপর প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নড়চড়বিহীন হইয়া গল্প গুজব করিতেছে এবং এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে যখন বাহিরে ক্রীড়া-কৌতুক করিবার সুবিধা থাকে, শত শত নর-নারী সাধারণ উদ্যানে বয়সানুসারে লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করে এবং বয়োবৃদ্ধেরা মৃদুমন্দ ভাবে পদচারণা করিয়া থাকে। বাস্তবিকই আমাদের জাত যেন মরা; কথায় বলে, "থোড বড়ি খাড়া, খাডা বড়ি থোড়।" আবহমান কাল হইতে প্রচলিত একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বাঙালীর জীবনধারা কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে, এবং এই কারণে সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তর হইতেছে।

মূলকথা এই, যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রেরণা পাইয়াছে সে আত্মচেষ্টা দ্বারাই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবে। যে-কয়জন বাঙালী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। এখন কয়েক জন ভারতবাসীর নাম করিতেছি যাঁহারা সাময়িক পত্র সম্পাদনে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকার পর পর দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল নিজ চেষ্টাবলে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজীতে যে সব প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার সমকক্ষ প্রবন্ধ লিখিতে আজও পর্য্যন্ত কেহ সক্ষম হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকদ্বয় শিশিরকুমার ও মতিলাল যে কি প্রকার যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর এক জনের কথা বলি। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি (অবাঙালী) জীবনের প্রথম বয়সেই সামান্য একজন কেরাণী ছিলেন, কিন্তু আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার বলে ভারতের

একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। কেবল 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদনে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি অতীব বিরল। আর একজনের নাম করিয়াই শেষ করিব, ইনি পরলোকগত কেশবচন্দ্র রায়, যিনি 'K. C. Roy of the Associated Press' বলিয়া বিখ্যাত। শৈশবে যখন তিনি ফরিদপুর স্কুলে পড়িতেন তখন তিনি খারাপ ছেলে বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ কাঁচা, এই হেতু তিনি প্রায়ই ক্লাস-প্রমোশন পাইতেন না। কিন্তু চুরি করিয়া নিজে নিজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। এক সময় একজন ইংরেজ স্কুল-পরিদর্শক তাঁহাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। বালক কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধটির বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার তাক লাগিয়া গেল। ইনি প্রবেশিকা পাস করিতে অসমর্থ হইয়া কিছুদিন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য বেতনে বাজারসরকারী করিতেন এবং এই সময় 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধ দিতেন। পরিশেষে তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের অধিনায়ক হন। বলা বাহুল্য এই কয়জনের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী নহেন।

ছাত্রদের নৈরাশ্যই বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। এমন কি দেখা যায়, যাহারা কলেজে প্রবেশ করে তাহারা প্রথম হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করে এবং বলিতেও ত্রুটি করে না যে পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? হাজার হাজার গ্রাজুয়েট ইতিপূর্ব্বেই অন্নচিন্তা করিয়া হাহাকার করিতেছে। একবার কলেজ অব সায়েন্সে যাঁহারা এম্-এস্ সি, শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন তাঁহাদের কয়েকদিন ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম—তোমরা কেন আসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, মা বাপ ছাড়ে না তাই। পাঠক-পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে আমার এপ্রকার প্রশ্ন করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, মাসাবধি নজর

রাখিয়া দেখিলাম কোনদিন একটি ছুটির অজুহাত পাইলেই তাঁহারা চম্পট দিবার জন্য প্রস্তুত। যদি বলেন লেকচার হইবে না, কলেজে থাকিয়া কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, রসায়ন শাস্ত্র পরীক্ষামূলক, সুতরাং হাতে-কলমে টেষ্ট টিউব লইয়া কাজ করা ইহার প্রধান অবলম্বন। আমরা প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাস সর্ব্বদাই খুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক হই যে, যাঁহারা বি-এস্ সিতে অনার্স লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানস্পৃহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কাজেই মেসে যাইয়া আর একদফা দিবানিদ্রা, তাস ইত্যাদি ক্রীড়া তাঁহাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।

শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙ্গালীর পরাজয়

আমাদের দেশের যুবকগণ এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের দিনে কি কারণে ব্যর্থকাম হয় তাহার কারণ ক্রমশঃ নির্ণয় করিতেছি। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় জেলায় ও মহকুমায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রায়ই তথাকার উকিল এবং মোক্তারদের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহারা পালা করিয়া হাটবাজার, এমন কি রন্ধন করিতে ও থালা-বাসন মাজিতেও কুণ্ঠিত হইত না। বিদ্যালাভের জন্য এ-সকলকেই তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, তিনি কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক সামান্য বেতনভুক্ ছাপাখানার কম্পোজিটরের বাড়িতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। দৈনিক বাজার ও পাকশালার সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। তিনি বলিয়াছেন যে, দিনের পর দিন মশলা, হলুদ ইত্যাদি বাটিতে বাটিতে তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি হলুদ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

আজকালকার হোষ্টেল ও মেসগুলি ছাত্রজীবনে অলসতা ও বিলাসিতার পরিপোষক। বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি তখন দেখিতাম, কলেজের প্রবাসী ছাত্রগণ এক-একটি মেসে থাকিত এবং মাসের পর মাস পালা করিয়া এক একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হইত, এবং ছাত্রগণ প্রত্যেকেই ভৃত্যসহ প্রত্যহ বাজার করিত। ইহাতে যে কেবল চাকরের চুরি বন্ধ হইত তাহা নহে, ভাল টাট্কা জিনিসপত্রও আনা হইত। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার সঙ্গে বরাবর আট-দশ জন ছাত্র বাস করে এবং ইহাদের ভিতর নিয়মিতভাবে একজন-না-একজন প্রত্যহ বাজার করে।

আজকাল এই সকল সুনিয়ম একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। কুক্ষণে লর্ড হার্ডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ-বার লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে অর্পণ করেন যে, সিটি, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, রিপণ ইত্যাদি কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া রাজপ্রাসাদতুল্য ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইবে। তখন চারিদিকে বাহবা পড়িয়া গেল। অবশ্য লর্ড হার্ডিং-এর উদ্দেশ্য ভালই ছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর আলো বাতাসযুক্ত ছাত্রাবাসগুলি সত্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে শিব গড়িতে গেলেই বানর হইয়া পড়ে। এই ছাত্রাবাসগুলিতে বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্ত সরঞ্জামই বিদ্যমান—কল টিপিলেই বৈদ্যুতিক আলো, দ্বিতল ও ত্রিতল কক্ষে পাম্প করা জলের ব্যবস্থা, তারপর ঘণ্টা বাজিলেই তৈয়ারী ভাত, প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই হাতের কাছে। কিন্তু সেগুলি কিরকম বিশৃঙ্খলভাবে চালিত হয় তাহার নিদর্শন দেখিতেছি। ছেলেরা এমন বাবু হইয়া উঠিয়াছে যে, যদিও পনের-বিশ জন ছাত্র লইয়া এক-একটি মেস হয়, তবু প্রত্যহ ভৃত্যদের সহিত বাজার করা তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। কয়েকদিন হইল আমি বিজ্ঞান কলেজের একটি মেস দেখিতে গিয়াছিলাম। বিশ-একুশজন ছাত্র সেই মেসে বাস করে। বাজার সেখান হইতে মাত্র তিন চার মিনিটের পথ। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা পালা করিয়া বাজারে যাও কি-না। সলজ্জভাবে উত্তর আসিল, "না"। আমি বলিলাম, "বাপু ৩×৭=২১, তাহা হইলে তিন সপ্তাহে একজনে মাত্র একদিন পালা পড়ে, ইহাও কি তোমাদের ক্লেশসাধ্য মনে হয়?" ইহার পর আবার একটি কুপ্রথার প্রচলন হইতেছে। এমন অনেক মেস আছে যেখানে শ্রীমানেরা ঠাকুর ও ভৃত্যের সহিত চুক্তি করিয়া থাকেন অর্থাৎ "মাসে এত দিব, দুবেলা দু-মুঠা খাইতে দিবে।" বলা বাহুল্য, যত রকম শুষ্ক ও বাসি তরকারী, মাছ তাহাদের আহার্য্য হইয়া থাকে। আমার বক্তব্য এই যে, ছেলেরা এখন 'কুঁড়ের বাদশা' হইয়া উঠিতেছে। যদি বুঝিতাম, শ্রীমানদের নিকট সময়ের মূল্য

এত বেশী যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই পাঠে নিরত থাকেন এবং এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা তাঁহাদের প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না—তাহা হইলে তেমন ক্ষোভের কারণ হইত না, কিন্তু প্রায়ই যখন দেখা যায় তাঁহাদের রবিবার ও ছুটির দিন অধিকাংশ সময়ই দিবা-নিদ্রা, গল্প-গুজব, তাস, ক্যারম, পিঙ্ পঙ্ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হয়, তখন এসব ওজর-আপত্তি আর খাটে না। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, আজকাল ছেলেরা নিজের দোষেই অকেজো, উপায়হীন, অলস, পুতুল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহারা যখন পৃথিবীতে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে তখন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই যে, পাঞ্জাবের ছাত্রগণের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত। আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম লাহোরে যাই তখন দেখি গভর্ণমেণ্ট কলেজসংশ্লিষ্ট বিলাতী ধরণের হোষ্টেলগুলি সাহেবিয়ানা শিখিবার এক একটি উৎকৃষ্ট পীঠস্থান। একশত টাকার কমে একজন ছাত্রের খরচ কুলায় না। ক্রিকেট খেলিবার জন্য 'ফ্লানেল সুট' ও টেনিস খেলিবার জন্য জর্দ্দা রঙের পোষাক ইত্যাদিতেই অধিকাংশ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। সম্প্রতি আরও দুইবার লাহোরে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বেশভূষা ও অন্যান্য সরঞ্জামের খরচ আরও বাড়িয়াছে। একজন পাঞ্জাবী অভিভাবক আমাকে বলিলেন, "অধিক কি বলিব, ছেলেদের খরচ জোগাইতেই সর্ব্বস্বান্ত, তাহারা আমাদের জীবন্ত চামড়া পর্য্যন্ত তুলিয়া লয়। আমেরিকান ও ইউরোপীয় মিশনারীগণ-পরিচালিত কলেজের হোষ্টেল-গুলিতেও এই পাপ সংক্রামিত হইয়াছে, এমন কি অনেক ছাত্র মাসে দেড়শ-দুইশ টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সেদিন এলাহাবাদে অনেকগুলি হোষ্টেল পরিদর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। অবশ্য এই শহরে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে হোষ্টেল তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সবগুলিরই আয়তন বৃহৎ এবং চারিদিকে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এ হোষ্টেলগুলি আদর্শস্থানীয়। আমি অনেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মাসিক গড়ে সর্ব্বসমেত কত টাকা পড়ে? তাহারা বলিল, পঁয়তাল্লিশ টাকা। এখন এইটুকু বোঝা দরকার যে, এক বাপের একটি পুত্র বা একটি কন্যা নহে। প্রায়ই দেখা যায় যেখানে যত আয়সঙ্কীর্ণতা সেখানে মা ষষ্ঠীর কৃপা তত বেশী। আমি বাংলার কথাই বলিতেছি। একজন ছেলের জন্য যদি মাসে চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষে তাহাদের সমস্ত পুত্র-কন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যে কত দুর্ব্বহ তাহা বর্ণনাতীত। এর উপর অরক্ষণীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে অনেকের ভিটামাটি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া সমস্ত সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সুতরাং এই ভীষণ অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে এ প্রকার ব্যয়বাহুল্য সত্যই ভাবিবার বিষয়।

অতএব কত ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া মা-বাপ ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদের কলিকাতায় পাঠান তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মাসিক মনি-অর্ডারের টাকা পাইয়া শ্রীমানেরা যে কি প্রকারে ইহার সদ্ব্যবহার করেন তাহার আভাষ দিতেছি। আগে ধোপারা কাপড় কাচিত, এখন তাহাতে তাহাদের আর মন উঠে না, সেজন্য 'ড্রাইংক্লিনিং' চারিদিকে গজাইয়া উঠিতেছে। সাধারণ নাপিতে চুল ছাঁটিলে মনোমত হয় না, কাজেই হেয়ার কাটিং সেলুনের সৃষ্টি হইতেছে। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক কিস্তি রেঁস্তোরাতে গিয়া চপ কাটলেট ইত্যাদি উদরস্থ না করিলে রসনার তৃপ্তি হয় না। এই ত গেল কয়েক দফা বাজে খরচের তালিকা, ইহার উপর সপ্তাহে অন্যূন দুইদিন সিনেমা দেখা চাই, কেহ কেহ

তিন দিন না দেখিলে অতৃপ্ত থাকেন। তাহার পর আর এক সংক্রামক ব্যাধি, কেবল কলিকাতায় নহে, সমগ্র বাংলা দেশে দেখা দিয়াছে। এইটি, জাঁকজমক ও ধুমধাম করিয়া সরস্বতী পূজা করা। কলিকাতার ইডেন হোষ্টেল ইহার চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শন করে। কার্ডের বাহার ও মিষ্টান্নের ফর্দ্দ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন অনেক ছেলে আছে যাহারা চাঁদা দিতে অপারগ, কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত'—যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। এখন কথা হইতেছে এই, শ্রীমানেরা ভুলিয়া যান চিরদিনই এই রকম মজাদার ভাবে কাটিবে না। যখন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করেন তখন অন্ধকার দেখিতে থাকেন ও একটু একটু করিয়া মোহ ঘুচিতে থাকে। কত বিধবা মা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শেষ গহনাখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এবং কত দরিদ্র পিতা নিজের পৈতৃক ভিটামাটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া যে কি প্রকারে পাঠার্থী পুত্রের ব্যয়সঙ্কুলান করেন তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। এমনি বিড়ম্বনা যে তাঁহাদের আশা-ভরসা-স্থল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তকমাযুক্ত পুত্রগণের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা যে সুখস্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর হইল আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সভ্যস্বরূপ বছরে একবার করিয়া তথায় গমন করিতে হয়। ঢাকা শহরেও একটি দুইটি করিয়া সিনেমা উঠিতেছে এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। তথাকার একজন উকীলের মুখে শুনা গেল, "আমি একটি সিনেমার পরিচালক (ম্যানেজার)। দু-পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু যখন টাকা গুণিবার সময় দেখি অনেকগুলিতে সিঁদুরের ছাপ আছে (মা-বোনদের বলিয়া দিতে হইবে না যে এগুলি লক্ষ্মীর কৌটা হইতে অপহৃত) তখন হৃদয় শুষ্ক হয় এবং ভাবি যে, কি পাপের প্রশ্রয় দিতেছি।"

ছাত্রদিগের মধ্যে শহরে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করার একটি প্রবল আকর্ষণ আছে, কারণ শহরের ন্যায় আর কোন স্থানে এরূপ বিলাসবহুল আরামের জীবন যাপন করা চলে না।

এস্থলে বাগেরহাট কলেজের বিষয় কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর হইল একদিন তত্রস্থ কয়েকজন নেতা ও কর্ম্মী বিজ্ঞান কলেজে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তাঁহারা বাগেরহাটে একটি কলেজ সংস্থাপনের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে আমার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন ; আরও বলিলেন, কলিকাতায় ছেলেপিলে পড়ান বহুব্যয়সাধ্য, বিশেষতঃ শহরের ছাত্রগণ নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে পতিত হয়। আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতেছিলাম ম্যালেরিয়ামুক্ত কোন পল্লীগ্রামে, যেখানে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সহজলভ্য ও রেলওয়ে, ষ্টীমার সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা আছে, এইরূপ স্থানে একটি কলেজ করিতে পারিলে বোধ হয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও পূর্ব্বেকার টোলের ছাত্রাবাস উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইবে। প্রথম অবস্থায় ছাত্রাবাসের জন্য নদীতটে তৃণাচ্ছাদিত পঞ্চাশবিঘা-ব্যাপী ভূমি-খণ্ডের উপর ঘর তৈয়ারী করা হইল, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর এবং হু হু করিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই স্থানে কলিকাতার অলিগলির ভিতরের একতালা ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব একেবারেই নাই ; এক একটি ঘর আবার কতকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং তাহার ভাড়া মাত্র এক টাকা ধার্য্য হইল। প্রকাণ্ড মাঠ—ফুটবল, ক্রিকেট খেলিবার যথেষ্ট স্থান; অধিকন্তু নদীতে নৌকা-চালনা দ্বারা ব্যায়াম করিবারও সুবন্দোবস্ত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিপরীত ফল ফলিল। এই সকল সর্ব্ববিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রথম দুই-এক বৎসর কলেজে প্রায় তিন-চারিশত ছাত্র অধ্যয়ন করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহা একশত চল্লিশ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং এ-বৎসর

টানাটানি করিয়া বোধ হয় দুইশত পঞ্চাশ জন হইবে। এই বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ অতি অমায়িক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ছাত্রবৎসল ও সহজ অধিগম্য। ইনি এবং আর কয়েকজন অধ্যাপক এই কলেজের আসেপাশের বাসিন্দা, সেজন্য সকল সময়ই তাঁহারা ছাত্রদিগের লেখাপড়ার দিকে সুদৃষ্টি রাখিতে পারেন। বাছিয়া বাছিয়া এমন সব অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল যে তাঁহারা কোন অংশেই কলিকাতার কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় নিকৃষ্ট নহেন। যখন ছাত্রসংখ্যা কমিতে লাগিল তখন ছেলেদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ আসিল যে, তাহারা কাঁচা ঘরে থাকিতে নারাজ। কাজেই গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমিও সেইস্থানের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলাম, এবং এই প্রকারে কতকগুলি পাকা বাড়িও হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না। তখন বাগেরহাটের কেহ কেহ আমাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি বুঝিলেন না যে, এ পাড়াগাঁয়ে ছেলেরা থাকিতে আদৌ রাজী নয়। আজব শহর কলিকাতায় বহুবিধ আকর্ষণের বস্তু আছে, সেখানে বিজলী বাতিযুক্ত বড় বড় হোষ্টেল এবং রেস্তোঁরা প্রভৃতি বিদ্যমান। বিশেষতঃ, বাগেরহাটে থাকিলে মা-বাপ ও অভিভাবকগণের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হয় আর কলিকাতায় থাকিলে মাসের পর মাস মণি-অর্ডারে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা করিয়া নির্ব্বিবাদে আদায় হয় ও ইচ্ছানুরূপ খরচ করা যায়।"

এই সম্পর্কে ঢাকা মোস্‌লেম হোষ্টেল বা হলের কথা বলি। যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিলেন তখন মুসলমান নেতাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে তাঁহাদের সুবিধার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইবে, সেখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধাও করা হইবে। আমি চিরকাল এই মতই পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং ইহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না যে, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির

ভিতর যতদিন না শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিবে এবং যতদিন না তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত সমভাবে মেলামেশা ও সমান অধিকার ও সুবিধা লাভ করিবে ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সেখানকার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট্ বাড়ি মোস্‌লেম হোষ্টেলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাও যথেষ্ট মনে করেন নাই। আবার দশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাজপ্রাসাদ তুল্য একটি স্বতন্ত্র 'মোস্‌লেম হল' নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে থাকিতে গেলে উচ্চ হারে ভাড়া দিতে হয়। একে ত মুসলমান ছাত্রেরা অধিকাংশই দরিদ্র, তাহার উপর এই দুর্দ্দিনে এইরূপ উচ্চহারে ভাড়া দেওয়া ক্লেশসাধ্য। কাজেই অধিকাংশ ঘরই খালি পড়িয়া আছে। যাঁহারা একটু তলাইয়া বুঝিতে পারেন তাঁহারা বলেন, ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর উদ্ভাবিত হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, যদি দশলক্ষ টাকা মূলধনস্বরূপ অব্যাহত রাখিয়া তাহার বাৎসরিক সুদ আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের উন্নতিকল্পে বৃত্তিস্বরূপ ব্যয়িত হইত তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের উন্নতির বিধান করা হইত। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতি, ভাগ্যবিধাতার পরিকল্পনার ন্যায়ই দুর্জ্ঞেয়।

বৃদ্ধ পিতামাতা ও অভিভাবকগণের নিকট অযথা অর্থ শোষণ করা নীচাশয়তার লক্ষণ। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কত রকমে শাপ ও পাপগ্রস্ত তাহার একটুমাত্র আভাষ দিলাম। অবশ্য ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অভিভাবকদের নিকট হইতে মাসে মাসে টাকা পাইবেন, ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না। কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে, যাহারা কলেজে পড়ে তাহাদের এইটুকু বোঝা উচিত, তাহারা যে-টাকার শ্রাদ্ধ করে তাহা কত কষ্টের। প্রয়োজনাতীত ব্যয় করা কেবল নীচাশয়তার পরিচায়ক নহে, উহা ভাবী জীবনের উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করে।

আজকালকার তুলনায় একশত বৎসর পূর্ব্বে স্কট্‌ল্যাণ্ড্ এক প্রকার নির্ধন ছিল, তখনও সেখানে নব্য সভ্যতা ও বিলাসিতা জাল বিস্তার করে নাই। Froude-কৃত মনীষী কার্লাইলের জীবন চরিত হইতে ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিতেছি।

"বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রবৃন্দ সুরম্য অট্টালিকায় বিলাসসম্ভার পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠে ও বিপুল অর্থব্যয়ে তাহাদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে। এই সকল ছাত্রেরা যাহা ব্যয় করে কার্লাইল বোধ হয় তাঁহার জীবনের কোনও বৎসরেও তাহা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সময়ে স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনকার মত পারিতোষিক ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রগণ অধিকাংশই দরিদ্র ছিল। কার্লাইলও এইরূপ একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ যে কিরূপ কায়ক্লেশে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা প্রত্যেক বিদ্যার্থীই হৃদয়ঙ্গম করিত এবং সময়ের সদ্-ব্যবহারের জন্য সতত সচেষ্ট থাকিত। বৎসরে মাত্র পাঁচ মাস বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় তাহারা কৃষিকার্য্য ও শিক্ষকতা করিয়া তাহাদের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত।

"চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই তাহাদিগকে এডিন্‌বরা, গ্লাস্‌গো প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইত, এবং সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে গমন ভিন্ন তাহাদের আর কোন পথ ছিল না। সেখানে অভিভাবকহীন হইয়া তাহাদের আহার ও বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে হইত। সময়ে সময়ে তাহাদের পিতামাতা গৃহ হইতে ক্ষেত্রজ আলু, ডিম, মাখন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য লোক মারফৎ পাঠাইতেন এবং তাহারাও তাহাদের মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত সেই সকল লোক দ্বারা গৃহে প্রেরণ করিত। তাহাদের স্বল্পতুষ্ট স্বভাবের পক্ষে এই সবই যথেষ্ট ছিল। দারিদ্র্যই তাহাদিগকে কলুষিত আমোদ প্রমোদ হইতে সতত রক্ষা করিত।"

এই একশত বৎসরের মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ দেশ প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে ও হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে বজ্‌বজ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণীরও উর্দ্ধে যে সত্তর-আশীটি পাটকল আছে তাহার কর্ত্তৃত্ব স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌বাসীর একচেটিয়া বলিলেও চলে। এই কারণে প্রতি বৎসর অজস্র অর্থ স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ দেশে চলিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন গ্লাস্‌গো, ডান্‌ডি, গ্রীণক্‌ ইত্যাদি মহানগরেও অর্ণবপোতচালন এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যসূত্রেও প্রভূত ধনসমাগম হইয়াছে। এই সকল কারণে সেই সব স্থান হইতে এখন পূর্ব্বেকার মত সাদাসিধা চালচলনও অন্তর্হিত হইয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট বারন্‌স্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খেদোক্তি করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, দেশের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হওয়া সর্ব্বনাশের মূল। ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বীরা এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছেন।

বিলাসিতার হাওয়া প্রবাহিত হইলে দেশে যে কত রকম দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাহা এ স্থলে আলোচ্য নয়। শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, অন্ততঃ এক শতাব্দীর ভিতর স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ ধনী হইয়াছে, সুতরাং সে-দেশে যদি কার্লাইলের ছাত্রজীবনের তুলনায় এখনকার ছাত্র-জীবনের ব্যয়ভার অনেক বাড়িয়া থাকে তাহা হইলে তত আপত্তিজনক হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকগণ ছাত্রাবস্থায় অভিভাবকগণের নিকট অর্থশোষণ করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে, ইহাতে তাহারা নিজেরাই তাহাদের ভাবী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। আমাদের দরিদ্র দেশ। আমরা ক্রমশঃ দীন হইয়া যাইতেছি। যে দেশের জন প্রতি গড় আয় দৈনিক দুই আনা এবং বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা হইবে কিনা সন্দেহ, সে-দেশের লোকের পক্ষে বিলাতী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিলাতী রকম চালচলন অনুকরণ করা সর্ব্বনাশের কারণ।

বর্ত্তমান জগতে যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও পুরুষকার বলে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এনড্রু কার্নেগী অন্যতম। ইনি স্কট্ল্যাণ্ড্ দেশের ডান্ফার্মলাইন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন তন্তুবায় ছিলেন। দারিদ্র্যনিপীড়িত হইয়া স্ত্রী ও অপরিণত-বয়স্ক দুই বালক পুত্র সমভিব্যাহারে কোন প্রতিবেশীর নিকট জাহাজ ভাড়ার নিমিত্ত কিছু টাকা ধার করিয়া ভাগ্যান্বেষণের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। বালক কার্নেগীর বয়স তখন তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে এবং এই বয়সে তিনি একটি ক্ষুদ্র কারখানায় প্রবেশলাভ করেন। অতি প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া সামান্য কিছু আহারের পর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। যখন তিনি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের সামান্য রোজগার তিন-চারি টাকা তাঁহার পিতামাতার হস্তে অর্পণ করিলেন তখন তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথায় ব্যক্ত করিতেছি।—"আমি আমার পরবর্ত্তী জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু যখন আমি আমার সর্ব্ব-প্রথম রোজগার পিতামাতার হস্তে অর্পণ করিলাম তখন মনে একটি গর্ব্ব অনুভব করিলাম এবং মনে করিলাম যে, আজ হইতে আমি স্বাবলম্বী।" এই এনড্রু কার্নেগী হীন অবস্থা হইতে পুরুষকার-বলে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানার মালিক হইয়াছিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য ও নানাবিধ হিতকার্য্যে একশত কোটী টাকা দান করিয়াছিলেন। কার্নেগীর উপরি লিখিত উক্তি হইতে বোঝা যায়, পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর জুলুম করিয়া বাবুয়ানা ও বিলাসিতা করা কত গর্হিত; কিন্তু কলেজের ছাত্রগণ "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন" এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া অযথা ব্যয় করিতে শিক্ষা করিয়া ভাবী জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে।

বিদেশী ভাষা গ্রহণ ও তাহার ফল

পরাধীন জাতির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আত্মসম্মান ও আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া ফেলে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, আমরা হাত-পা গুটাইয়া আলস্যে বৃথা সময় কাটাই এবং অর্থনীতি ও সমাজনীতি-সংক্রান্ত সমস্ত দোষ গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া বসি।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিদ্যার্জ্জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলে জীবনের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া গেল—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার ফল হইয়াছে যে, বালকগণ তাহাদের প্রথম জীবনে যে সময় নানারূপ impression (ছাপ) গ্রহণ করিতে পারে, সেই মহামূল্য সময়ের বৃথা অপচয় হইয়া থাকে। ৭।৮ বৎসর হইতে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক-বালিকার জীবন কুম্ভকারের হাতের কর্দ্দমের ন্যায়, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী পাত্রের গঠন দিতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এতই শাপগ্রস্ত যে, আজ এই বিপদ্‌সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও বাঙালী জাতির চৈতন্যোদয় হয় না। ৪।৫ বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়িতেছে। বাঙ্গালা দেশ কৃষিপ্রধান; ধান, পাটের দর গড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, টাকার আদান প্রদান বিশেষতঃ মফঃস্বলে একেবারে বন্ধ, একখানি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে হইলে দূরস্থিত কোন মহাজনের গদি বা 'কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাঙ্ক' ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এস্ সি, বি-এ, বি-এস্ সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে

আজকাল এক ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে। এমন কি যাঁহারা চিন্তাশীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত তাঁহারাও খবরের কাগজে জলদগম্ভীর স্বরে

অভিযোগ করেন যে, যাহা কিছু অর্থকরী বিদ্যা তাহার সমাধান ও দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত।

কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও ঘুচিতেছে না। ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার ছেলেকে ডিগ্রীধারী করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছি; আজ সহস্র সহস্র যুবক বেকার অবস্থায় বসিয়া উপবাস করিতেছে, এমন কি সময় সময় আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। আমরা প্রায়ই এই কথা বলিয়া থাকি যে, পাটের বাজার বড়ই মন্দা, কত মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে; যে মহাজনের গুদামে অবিক্রীত পাট ২।৩ বছরের মত জমায়েত বা মজুত রহিয়াছে, সেই মহাজন আবার কি নিজের পৈত্রিক ভিটে-মাটি বাঁধা দিয়া পাটের দাদন করিবে? কিন্তু অন্ধ সংস্কার এমনই মজ্জাগত হইয়াছে যে, ইহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন, similia similibus curantur অর্থাৎ 'বিষস্য বিষমৌষধম্'; যেহেতু সহস্র সহস্র গ্রাজুয়েট যুবক জীবন সংগ্রামে পরাভূত হইতেছে তাহারই ঔষধ আবার নূতন করিয়া গ্রাজুয়েটের সৃষ্টি করা!

মানব-জীবনে বিদ্যাশিক্ষা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ সর্ব্বদিকে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, যাহাকে ইংরাজীতে Culture বা সংস্কৃতি বলে। শিক্ষাই মানুষকে পশুত্ব হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নীত করে। বাল্যকালে আমাদের চাষী প্রজাগণ আমাকে বলিত, "বাবু, আমরা চোখ থাকতে কাণা, কাণ থাকতে কালা।"

আজ যে দেশময় নবজাগরণের ও স্বাধীনতালাভের জন্য নূতন হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহা নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে কদাচিৎ পৌঁছায়। এই কারণেই নব্য জাপান, চীন, পারস্য, তুর্কী প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক

শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে, এবং ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, যেমন ইউরোপ ও মার্কিন দেশে তেমনি জাপানেও আজ মুটে-মজুর, দাস-দাসী, হালচাষী যখনই একটু ফুরসুৎ পায় অমনি খবরের কাগজ লইয়া কেবল নিজের দেশের নয়, দুনিয়ার খবর লইয়া আলাপ করিয়া থাকে ; এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা ভাব সঞ্চারিত হয়।

আমি যখন লিখিতেছি আমার সামনে অদ্যকার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' রহিয়াছে। আজকাল দৈনিক 'আনন্দবাজার' যে প্রকার সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়, অনেক ইংরেজী পত্রিকাও সেরূপ হয় না। ইহাতে 'রয়্টার', 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস,' 'ইউনাইটেড-প্রেসের' যাবতীয় খবর থাকে এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক (বঙ্গদেশীয়) খবরও যথেষ্ট থাকে।

আজ যদি আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনস্বরূপ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে এই এক শতাব্দীর মধ্যে কত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইত এবং বঙ্গভাষাও ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধিশালিনী হইত।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আদৌ কেহ ইংরেজী শিক্ষা করিবেন না ; যাঁহাদের সাহিত্যে প্রকৃত অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বরং উৎসাহিত করা দরকার। তাঁহারা আজীবন সাহিত্য-রসে ডুবিয়া থাকুন এবং কেবল ইংরেজী কেন, ফ্রেঞ্চ্, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করুন। অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃত প্রেরণা আছে তাঁহারাই সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবেন। আমার আত্ম-চরিতে বলিয়াছি যে, যখন আমি সাবেক কালের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আত্মচেষ্টায় অর্থাৎ কাহারও সহায়তা গ্রহণ না করিয়া 'লাটিন' ও 'ফ্রেঞ্চ্' ভাষা শিক্ষা করি, কেননা প্রেরণা ছিল

আমাদের বালকগণকে ৫ বৎসর বয়স হইতে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যে কিরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে বৃথা শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ খুব কমই হইয়া থাকে। আমি সর্ব্বত্রই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকি যে, "A degree is a cloak to hide the degree-holder's ignorance অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।" দুই একটি ঘটনা হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিতেছি।

সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে আমি একটি কলেজে কয়েকদিন অবস্থান করি। একদিন মধ্যাহ্নে একটি আই-এ ক্লাসের ছাত্র আমার নিকট আসিয়া বলে, 'মহাশয়, আমি বড্ড গরীব, যাহাতে কলেজে ফ্রী হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা আপনার করিয়া দিতে হইবে।' আমি বলিলাম, 'হাজার হাজার যুবক বেকার অবস্থায় হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি আবার তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি করিবে?' সে বলিল, 'তাই বলিয়া কি জ্ঞানার্জ্জন করিব না?' আমি মনে মনে বলিলাম, 'তবে ত' যাদু ফাঁদে পা দিয়াছ।'—'আচ্ছা বলত হায়দ্রাবাদ কোথায়?' সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'মধ্যপ্রদেশে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে কি বলে?' সে বলিল, 'হায়দ্রাবাদ একটি গণতন্ত্র (republic) দেশ।' তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা বলত 'গাঁথিব নূতন মালা' 'রচিব মধুচক্র,' কার লেখা এবং তার পরে কি?' প্রত্যুত্তরে সে বলিল, 'মহাশয়, আমরা পাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসেছি ওসব জানি না।'

আমার দেশের স্কুলেও ঠিক ঐ প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই একটি ছেলে ব্যতীত আর সবাই হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। এখন এই হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ছাত্রেরা স্কুল-কলেজে কিরূপ বিদ্যা আহরণ করিতেছে। এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইবে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমার এই বিজ্ঞান মন্দিরে যে সমস্ত ছাত্র বি-এস্ সি অনার্স লইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের সামান্য সামান্য বিষয়ের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষা যে কি রকম মেকী ও ঝুটা, তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশজনের ভিতর নয়জন হায়দ্রাবাদ কোথায় বলিতে অক্ষম, এবং 'গাঁথিব নূতন মালা' 'রচিব মধুচক্র' কদাচিৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের বাহিরে যে কিছু শিখিতে হয়, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রার্থিগণ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। কোন প্রকারে নোট কণ্ঠস্থ করিয়া 'তক্‌মা' পাইলেই হইল। বিদ্যাশিক্ষা আবার কি?

কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা কেবল মাত্র আমাদের দেশেরই নিজস্ব দুর্ভাগ্য। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিনা কেন সভ্যজগতের কুত্রাপি ডিগ্রীর প্রতি এরূপ অযথা মোহ নাই, কিংবা ডিগ্রীলাভ ব্যাপারটি এত সহজও নহে। কেবল মাত্র নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-সমুদ্র পাড়ি দেওয়াতে অপর দেশের ছাত্রগণ অভ্যস্ত নহে। "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ"—ইহা আমাদেরই শাস্ত্রবচন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় এ-আদর্শের সহিত আমাদের দেশের বিদ্যার্থিগণের যোগ অতিশয় ক্ষীণ। উহা আজ কেবল ভারতেতর দেশের ছাত্র সমাজের পক্ষেই প্রযোজ্য, প্রকৃত লেখাপড়া বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-সীমানা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

মাতৃভাষার অনাদর

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিলাত-আমদানী সিভিলিয়ানরা বাংলা, উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবেন, যাহাতে ভাবী শাসনকর্ত্তারা ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ্, লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্ণর প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও মেলামেশা করিতে পারেন। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম্ কেরীই প্রথম বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহারই উৎসাহে ও সাহচর্য্যে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন; আবার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে উইলিয়াম কেরী প্রমুখ মিশনারীগণ কর্ত্তৃক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপরদিকে রামমোহন রায় 'সমাচার কৌমুদী' এবং পৌত্তলিকতা নিবারণ ও সহমরণ প্রথা দমনের জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করেন। এই সকল মহাত্মাগণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অসম্ভব। ইহার পরে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাগল হইয়া উঠিলেন। ইহা স্বাভাবিক। এতদিন আমাদের দেশ নানাবিধ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল; কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে গভর্ণর-

জেনারেল আমহার্ষ্টের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে তখনকার দেশের উদার-প্রকৃতি লোকদিগের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাস্তবিকই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু আনুষঙ্গিক আবার বিপদ ডাকিয়া আনা হইল। ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে কি প্রকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহা যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু কৃত "মাইকেল মধুসূদনের জীবনী" এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু এই ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার অনাদর হইতে লাগিল এবং মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষাবিস্তার হইতে পারে সে বিষয়ে সকলে উদাসীন হইতে লাগিলেন।

যাহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইলেন, তাঁহারা নানা বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। কাজেই মাতৃভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল এবং ইহার ফলে ছাত্রবৃত্তি, মাইনর প্রভৃতি স্কুলগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকিল।

আজ বাংলা দেশে এই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ফলে ১২০০ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং প্রায় চল্লিশটা কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৎসরে হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। এখন অনেকে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, এই বেকারসমস্যার জন্য গভর্ণমেণ্টই দায়ী; পরাধীনতার ও দাসমনোবৃত্তির ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। কথায় বলে "যত দোষ, নন্দ ঘোষ"। আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিতেছি এবং সমস্ত দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছি।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আদালতে পার্শী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা প্রবর্ত্তিত করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ছাত্রেরা আনন্দে অধীর হইয়া গভর্ণর-জেনারেল মহোদয়কে একখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করেন। কিন্তু তখন তাঁহারা একথা ভুলিয়া গেলেন যে, যতই ইংরাজী শিক্ষা হোক না কেন, দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অজ্ঞতা তাহাতে কখনও দূর হইতে পারে না। তাই বাংলা দেশে এখনও শতকরা ৯০।৯৫ জন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, ইংরাজী কেন জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ্ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সকলকেই যে ইংরাজী শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছিলেন যে, এক জেলায় হয়ত মাত্র একজন ইংরাজ জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন; এই কারণে আদালতে সমস্ত কাজকর্ম্ম ইংরাজীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখন আবার অনেক জেলায় আদৌ ইংরাজ জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ নাই, কিন্তু সমস্ত কার্য্যকলাপ ইংরাজীতে হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একটী হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি;—বার বৎসর হইল আমি হাইকোর্টে একটী দায়রা মোকদ্দমায় জুরীতে বসি এবং ফোরম্যান (Foreman) নিযুক্ত হই। সুখের বিষয় যে, বিচারপতি আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, কিন্তু যে প্রহসন অভিনীত হইল তাহার কথাই বলিতেছি। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বাঙ্গালী এবং অপরাপর ব্যারিষ্টারও বাঙ্গালী। কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী বাংলা ভাষায় দো-ভাষী (Interpreter) কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া জজ্ ও জুরীদের নিকটে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল। আমাকে কোন কথা জজ্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে 'মি লর্ড' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইল এবং বিচারপতিও জুরীদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আমাকে 'ফোরম্যান মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই সকল কার্য্য যদি বাংলা ভাষায় চলিত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সিকি সময়ও লাগিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে, বিশেষতঃ যেদিন হইতে তিনি "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিলেন, আমাদের মাতৃভাষা একরকম নবজীবন লাভ করিল। ইহার পূর্ব্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া, জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিলেন এবং অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে মাতৃভাষা যে কি প্রকার সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আজকাল বাংলা ভাষায় সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলি উত্তরোত্তর কি প্রকার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে তাহা পূর্ব্বেকার প্রবন্ধে দৈনিক 'আনন্দ বাজারের' কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। আমার সম্মুখে অদ্যকার 'দৈনিক বসুমতী' রহিয়াছে, ইহাতে প্রায় সমস্ত স্বাদের খবরগুলি আছে। এতদ্ভিন্ন 'মাসিক বসুমতী'তেও পৃথিবীর নানা দেশের যে সমস্ত সচিত্র দীর্ঘায়তন প্রবন্ধ থাকে তাহা হইতে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সনের 'বসুমতী'তে নিউ জার্সির যে বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে সুন্দর সুন্দর ৩৬টী আলোকচিত্র আছে। প্রবন্ধটী পড়িলে মনে হয় যেন সেই দেশটী নখদর্পণে দেখিতেছি, এবং অন্যান্য প্রবন্ধেও অনেক বিষয় জানিবার থাকে। পুরাতন বৎসরের বাঁধান 'বসুমতী'র পাতা উল্টাইয়া দেখিলে নব্য তুর্কী, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য মাসিক 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' এই রকম উঁচুদরের। এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় নব্য জাপান, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। সুতরাং একথা মোটেই খাটে না যে, বাংলা ভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা আদৌ হয় না। ইউরোপীয় সমাজে বলে যে, **he is a *well-informed* man** অর্থাৎ লোকটার বেশ পড়াশুনা আছে এবং খোঁজ-খবর জানা আছে।

ইহাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। আমার মন্তব্য এই যে, যদি মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যেই সবগুলিরই কিছু কিছু আয়ত্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতাম তখন দেখিতাম যে, ছেলেরা মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি লইয়া হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইত, তাহারা জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত এবং বাংলা সাহিত্য মোটামুটি সমস্তই পড়িয়া আসিত। কেবল ইংরাজীতে পশ্চাদ্‌পদ বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাহাদের আর চারি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। আজকাল অনেক স্থলে দেখা যায় যে, মাইনর পাস ছাত্র অনেক বিষয়ে ইংরাজী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রাপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী। আমার এইটুকু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা দরকার, কিন্তু ইহাকে বাহন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় পড়িতে হইলে আমাদের ছেলেদের ৪।৫ বৎসর, এবং পরে দেখাইব যে ৭।৮ বৎসর বৃথা নষ্ট হয়।

বালকগণের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বুকে হাত দিয়া আমাকে বলুনত' তাঁহাদের পুত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার মূলে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে কি না? আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে ব্যক্ত করিতেছি যে, তাঁহারা এই অন্তর্নিহিত আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেক ছেলেই হাইকোর্টের জজ্ হইবে, না হয় মুন্‌সেফি, ডেপুটীগিরি ইত্যাদি একটী উচ্চপদ লাভ করিবে, অথবা বড় বড় উকীল, ডাক্তার, না হয় ইঞ্জিনীয়ার হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা মিলিলেই ছেলে বড় চাকুরী পাইবে, কিংবা পসারী উকীল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হইয়া দাঁড়াইবে এমন কোনও নিশ্চয়তা যে নাই তাহার প্রমাণ বর্ত্তমানকালের ডিগ্রীধারী যুবকদের বেকার-সমস্যা। চীন দেশেও গ্রাজুয়েট ও শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। দলে দলে বেকার গ্রাজুয়েটগণ কর্ম্মান্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, এমন কি মাসিক এক পাউণ্ড বেতনের

একটি চাকুরী পাইবার জন্য তাহারা লালায়িত। এই সকল বেকার চীন-গ্রাজুয়েটের মধ্যে অধিকাংশ অর্থশাস্ত্র ও আইনের উপাধিধারী।

এই সকল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার অর্থাৎ এম-এ, এম-এস্ সি, পি-এইচ ডি, ডি-এস্ সি, বি-এল্, এম-এল্, ডি-এল্ এর জন্য বাছা বাছা ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। আমার মতে এখন যদি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার এক-দশমাংশ উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইবে; অধুনা কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০,০০৯ ছাত্র ডিগ্রীর মোহে মুগ্ধ, আমি বলি, মাত্র ৩০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করুক।

ক্রমশঃ দেখান যাইবে যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারেব পথ কিরূপ সংকীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার জন্য দেশের যুবকগণ জীবন-সংগ্রামে কিরূপ বিধ্বস্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—Excellent raw materials exist in the young men of Bengal all over the country—বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে মানুষ তৈয়ারীর অনেক কিছু মূল্যবান উপাদান নিহিত আছে। বাস্তবিকই বাংলার ছাত্রগণকে পৃথিবীর যে কোন জাতির ছাত্রবৃন্দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—তুলনায় তাহাদের মস্তক অবনত করিতে হয় না। বাংলার ছেলেরা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। দামোদর বন্যা, খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ প্লাবনের সময় যখন সাহায্যকল্পে তাহাদের নিকট আমার আবেদন পাঠাইয়াছিলাম তখন দেখিয়াছি বাংলার যুবকবৃন্দ দলে দলে আসিয়া অসামান্য স্বার্থত্যাগ করিয়া সূর্য্যতাপ ও জল-কাদার ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া আহার, বিহার, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া আর্ত্তের সেবায় অগ্রসর হইয়াছে। অনেক সময় তাহাদের স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের অনুপাতে সফলতা দেখা যায় নাই সত্য, কিন্তু সে দোষ তাহাদের নয়—সে দোষ নেতৃবৃন্দের, পরিচালকগণের।

সেদিন মৌলানা মহম্মদ আলি বলিয়াছেন, আমাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে সংস্কার করিতে হইবে। ইহা খুব খাঁটি কথা। এখন অনেক বিষয় সংস্কার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে ছিলাম—সিরাজগঞ্জের যোগেশবাবুর পরলোকগত অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী, লর্ড সিংহ, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি আমরা সব সমসাময়িক ছিলাম—তখন আমাদের ধারণা ছিল কেবল বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিলে, বড় চাকুরী, ব্যারিষ্টারি বা সিভিল সার্ভিস লইয়া পদমর্য্যাদা বাড়াইতে পারিলে বোধ হয় বাঙ্গালী জীবনের সার্থকতা হয়। এখন সময়ের

কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত রাজনীতিক নেতা বলিয়াছেন, আমরা প্রতি বৎসরে শতাব্দীর মত অগ্রসর হইতেছি। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কবি গাহিয়াছিলেন—"অসভ্য তাতার অসত্য জাপান………।" আজ জাপানকে 'অসভ্য' বলিলে, নৌ-সেনাপতি টোগো হয়ত কলিকাতা বা বোম্বাইএর উপর গোলাবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিবেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ক্ষুদ্রকায় নগণ্য জাপান মহাশক্তিশালী বিরাট রাশিয়ার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত, তখন রাশিয়ার সেনাপতি কুরুপাট্‌কিন্ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা বানর, ওদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিব কি?" কিন্তু জাপান আজ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর যে-কোন ক্ষমতাশালী সভ্য জাতির সঙ্গে জাপানের তুলনা হইতে পারে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাণিজ্যে, রণকৌশলে, রাজনীতিতে জাপান যে-কোন ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষ। কিন্তু কোথায় আমরা? পৃথিবীর মানচিত্রে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন, প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আট্‌লান্টিক পর্য্যন্ত, জাপান হইতে মিশর পর্য্যন্ত সব স্বাধীন। পারস্য আফ্‌গানিস্থান এক সময় করদ রাজ্যের মত ছিল। লর্ড কার্জ্জন কাবুলের আমীরকে বিলাতে দূত পাঠাইতে সম্মতি দেন নাই, রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইত—এখন কাবুলের আমীর সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্য একদিকে রাশিয়ার, অন্যদিকে ইংলণ্ডের করতলস্থ ছিল। রাশিয়া ও ইংলণ্ড তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছিল—এখন পারস্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছে।

রিস্‌লি সার্কুলার (Risley circular) প্রত্যাহৃত হইয়াছে কিনা জানি না। আমি একথা বলি না, ছাত্রগণ প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবে, কিন্তু আজকালকার যে সব প্রধান সমস্যা ও আলোচ্য বিষয় যেমন—স্বরাজ-সাধনা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অত্যাচারী মোহন্তদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির রক্ষার উপায়—যাহা দ্বারা আজকাল

খবরের কাগজের স্তম্ভ পূর্ণ থাকে—এ সমস্ত পড়িতে কেহ নিষেধ করে না—বলে না এসব না পড়িয়া পাঠ্যপুস্তকের মামুলী বচন মুখস্থ করিতে হইবে। প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার—আজ যাঁহারা ছাত্র, কাল তাঁহারা জাতি হইয়া দাঁড়াইবেন। বাঙ্গালী জাতি আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে সুপ্ত।

এখন সময়ের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লর্ড সিংহ আমার বন্ধু, ব্যক্তিগত হিসাবে কিছু বলিতেছি না। তিনি অমায়িক, সদাশয়। তিনি প্রথমে বড় লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন,—পরে 'লর্ড' উপাধি পান এবং তারপর একটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তাও হইয়াছিলেন। ১৫ বৎসর আগে এসব হইলে মূর্চ্ছা যাইতাম। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর সে মোহ—সে ভাব নাই। সার হেনরী কটন্ ভারতবন্ধু—আজীবন সিভিলিয়ান ছিলেন। তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, "তোমরা সিভিল সার্ভিসের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? One Indian Civilian means an Indian lost to the country for ever—একজন ভারতীয়ের সিভিলিয়ান হওয়ার অর্থ দেশমাতার একটি সুসন্তান চিরতরে বিচ্যুত"। সেরূপ বলা যাইতে পারে, one Lord Sinha means one more acquisition to the bureaucracy—একজন লর্ড সিংহের অর্থ আমলাতন্ত্রের আর একজন সহায়কের সৃষ্টি। আমলাতন্ত্রের সহায়ক—দেশের কেহ নয়, দশের কেহ নয়—কাজেই দেশের পক্ষে মৃত। ভূপেনবাবু যে কি করিয়া লী কমিশনের রিপোর্ট স্বাক্ষর করিলেন, আমি জানি না। কিন্তু যাক সে কথা; ছেলেদের কথাই বলি। ছাত্রেরা Paradise Lost মুখস্থ আওড়াইতেছে—ও তাহার সহিত ভট্টি কাব্য ও রঘুবংশের ২।৪ সর্গ তোতা পাখীর মত শিখিতেছে। যথা :—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

"পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ" এই কথার উপর আবার মল্লিনাথ, তারাকুমার ও সারদা বাবুর টীকা ও টীপ্পনী আছে। শুধু এই সব করিলে চলিবে না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এডিনবার্গে যখন বি-এস্ সি পড়ি, তখন "India and the British Rule"—ভারতে ব্রিটিশ শাসন—নামে একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম। ফলে লর্ড বায়রণের মত, "awoke one fine morning and found myself famous."—এক সুপ্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম এক নামজাদা লোক হইয়া পড়িয়াছি। এইভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছি, অবসর মত সমাজসংস্কার আন্দোলন করিয়াছি, নানা প্রকার কলকারখানা গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, বই লিখিয়াছি আবার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণা করিয়াছি। সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আষাঢ়ান্ত বেলা—৫টায় কাক ডাকে—সন্ধ্যা হয় ৭ টায়। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে যাইতে কত কাজ করা যায়! কিন্তু কিসে কিসে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, আজকালকার ছেলেদের মনে সে প্রশ্ন উঠে না,—প্রশ্ন হইতেছে কি করিয়া সময় নষ্ট করিব? কিছু দিন পূর্ব্বে সুরমা উপত্যকা, শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, শিলচর, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম—সব জায়গায় এই একই কথা বলিয়াছি। শ্রীহট্টে অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিয়াছি—সেখানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নাই। সেখানকার মুসলমানরা অধিকতর স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া মনে হইল। করিমগঞ্জের জাতীয় বিদ্যালয় স্বদেশ-প্রেমের উৎস স্বরূপ। ২০।২২ বৎসরের একটি যুবকের যে স্বদেশ-প্রেম দেখিলাম, তাহাতে মনে হয়, আমি তাহার পায়ের ধূলা লওয়ার যোগ্য নই।

প্রকৃত শিক্ষা বলিতে কি ভট্টির দুই সর্গ ও Paradise Lost-এর এক অধ্যায় বুঝায়? ইহার সহিত আবার বাইবেল আছে। কিন্তু শুধু বাইবেল কেন, উপনিষদই বা হইবে না কেন? মৌলানা আক্রাম খাঁ কোরাণের সুন্দর অনুবাদ করিতেছেন—তাহাই বা কেন পাঠ্যপুস্তক

তালিকাভুক্ত হইবে না? আমি মুসলমান ভাইদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি, কেন কোরাণ পাঠ্যপুস্তক হইবে না? কিন্তু যাক্ সে কথা। ছেলে হয়ত কলিকাতার হোষ্টেলে থাকেন। অভিভাবকেরা মাসান্তে ৪০।৫০ টাকা পাঠান (তাহার উপর মা হয়ত মাঝে মাঝে চুরি করিয়া কিছু কিছু পাঠাইয়া থাকেন)। কিন্তু এই দু'বৎসরে ছেলে কি শিখে? নির্দ্দিষ্ট পাঠ শেষ করিবার জন্য কি দু'বৎসরের প্রয়োজন হয়? তাহারা দুই বৎসরে যাহা শিখে আমি যে-কোন ছাত্রকে দুই মাসে তাহা শিখাইয়া দিতে পারি —না পারিলে শাস্তি গ্রহণ করিতে রাজী আছি। বাকী ২২ মাস কি হয়? বৎসরে ছয় মাস ছুটি। ছুটি হইলে কেতাব বই ছুঁইবার দরকার নাই। প্রথম হইতেই ঠিক হইয়া থাকে—বাড়ীতে ভাল লাগে না—মামার বাড়ী আছে, আত্মীয় বাড়ী আছে—হয়ত কাহারও কাহারও * * * আছে। তারপর সকাল হইতে দুপুর বেলা পর্য্যন্ত আড্ডা—দুপুরে নিদ্রা—ঘুম হইতে উঠিয়া তাসের আড্ডা বা গল্পগুজব—রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। আজ-কাল পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা আবার কলিকাতার ছেলেদের হুবহু অনুকরণ করা আরম্ভ করিয়াছে। যখন শহরের ছেলে পাড়াগাঁয়ে যায়, তখন পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা হাঁ করিয়া দেখে—মনে ভাবে শহর হইতে না জানি কি আজগুবি চিজ আসিয়াছে—কত কি জানে—কত কি দেখিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা—কত গভীর বিদ্যা তাহাদের! আমি বাগেরহাটের কথা জানি—সেখানকার ছেলেরা ভাবে বাগেরহাটের পড়া যেন পড়াই নয়। প্রেসিডেন্সী, সিটী কলেজের ছেলেদিগকে তাহারা অদ্ভুত মনে করে ও দেখে; দেখে, তাহারা অদ্ভুত ফ্যাশানে চুল ছাটে, অদ্ভুত ফ্যাশানে তেড়ী কাটে—হাতে নূতন নূতন রকমের রিষ্ট ওয়াচ্, দাঁত মাজিবার কত রকম সরঞ্জাম—অঙ্গরাগের কত রকম দেশী-বিলাতী উপকরণ।

অনেক ছাত্র ভাবেন—এদেশে প্রকৃত শিক্ষা হয় না—বিলাতী ডিগ্রীই প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক। ১৯১২ সালে Conference of the

Empire Universities-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের সম্মেলনে, বলিয়াছিলাম, তোমরা ভারতবর্ষের ডিগ্রীকে নগণ্য মনে কর, বিলাতী ডিগ্রীকে বড় মনে কর। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিবে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্জ্জন, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রী-বিশারদ, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর, (যিনি তিনবার ঐ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন এবং যিনি আর ইহজগতে নাই)—ইঁহারা সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

চার বৎসর আগে একবার বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছি। তখন দেখিয়াছি জাপানী ছাত্র বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বা কোন বিশিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবাব জন্য ইংলণ্ডে আছে। তাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হইত "তোমরা কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েব ডিগ্রী লইতে আসিয়াছ?"—তাহারা তৎক্ষণাৎ জবাব দিত "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে কি তোমরা বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অপেক্ষা হীন মনে কর?"—কিন্তু বাংলা দেশ ও-বিষয়ে একেবারে উদার, বিশ্বপ্রেমিক। বাংলা সব শিখিয়াছে —দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব অস্বীকার করিতে বাঙ্গালী সঙ্কুচিত হয় না— অস্বীকার করিতে পারে না শুধু পিতৃত্বকে। ইংলণ্ডের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যাচার্য্য—নিষ্পেষিত পদদলিত জাতির বন্ধু—এইচ, জি, ওয়েলস্ বলিয়াছেন, 'যেদিন ছাপাখানা আবিষ্কার হইল সেইদিন হইতে বড বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কমিয়া গেল।' এক সময়ে ইসলামীয় সংস্কৃতি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, হইতে ৮৷১০ হাজার ছাত্র পদব্রজে, ভিক্ষা করিয়া স্পেনের কর্ডোভা, গ্রাণাডা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। আমাদের দেশের নালন্দা, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ও এক সময়ে জ্ঞানের উৎস ছিল। এখন শিক্ষা-লাভের জন্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার প্রয়োজনীয়তা খুবই কম— বাড়ী বসিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। আমাদের দেশেই অনেকে

নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে অতি হীন অবস্থা হইতে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন—উদাহরণস্বরূপ হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। ইঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল না। আজকাল হাটে, মাঠে, ঘাটে কত বি-এ, এম-এ দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রচেষ্টা নাই—নূতনত্ব নাই—মৌলিকত্ব নাই—চিন্তা করিতেও যেন তাহারা নারাজ। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়, তিনি ছাপাখানায় দিনের বেলা কাজ করিতেন, আর রাত্রি কালে জাগিয়া পড়িতেন—পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট হইতে বই আনিতেন—সারারাত পড়িয়া সকালেই আবার ফিরাইয়া দিতেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ছিল। তিনি তড়িৎ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা—তাঁহার তড়িৎ সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি বৈজ্ঞানিক জগৎ স্বীকার করিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের (American War of Independence) সময় তিনি দৌত্য কার্য্যে ইংলণ্ডে এবং পরে ফরাসী দেশে গিয়াছিলেন। পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ও ঐতিহাসিক H. G. Wells বলিতেছেন :—"*It is no longer necessary for the student to* go to a particular room, at a particular hour, to hear the golden words drop from the lips of a particular teacher. The young man, who *reads at 11* o'clock *in the* morning in the luxurious rooms in Trinity College, Cambridge, will have no very marked advantage over another young man *employed during the day, who reads at 11* o'clock at night in a bed-sitting room at Glasgow !"—এখন আর পাঠার্থীর পক্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনিবার প্রয়োজন নাই। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া এক যুবক বেলা

১১টায় পাঠ শিক্ষা করিতেছে—অপর দিকে আর এক যুবক সারাদিন অন্নসংস্থানের জন্য কর্ম্মব্যস্ত থাকিয়া রাত্রি ১১টায় গ্লাস্‌গো শহরের একটি অনাড়ম্বর শয়নকক্ষে বসিয়া অধ্যয়নরত—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ?

আমি একবার কেম্বিজের Trinity College—ট্রিনিটি কলেজে, অতিথি ছিলাম। রাজা যখন ঐ কলেজে যান তখন তাঁহার জন্য যে ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, তাহারই পাশের ঘরে আমি ছিলাম—ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার প্রাচুর্য্যে কয়েকদিন ভাল ঘুম হয় নাই। কলেজের আয় বাৎসরিক ১০।১৫ লক্ষ টাকা। ওখানে পড়িতে হইলে মাসে ৪।৫ শত টাকা লাগে; বড় বড় অভিজাত শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে ও বড় বড় সওদাগরের ছেলেদের সঙ্গে থাকিতে হয়। সেখানে দু'ঘণ্টা বক্তৃতা শুনিয়া যাহা শিখিবে—বাগেরহাট কলেজের কুঁড়ে ঘরে বসিয়া দুই ঘণ্টা নিবিষ্টচিত্তে পড়াশুনা করিলে, ঠিক তাহাই শিখিবে। সাজ আসবাবে করে কি? শিক্ষা লইয়া কথা। সিলেট্ হইতে আসিবার সময় দেখিলাম—কলেজের ইমারত বাবদ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সিলেট্ মুসলমান-প্রধান স্থান—দরিদ্রের টাকায় বড় বড় দালান উঠিল—কিন্তু কয়জন গরীবের ছেলে টাকা খরচ করিয়া বি-এ, এম-এ, পর্য্যন্ত পড়িতে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ভ্রাতাদের অনেক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে—ভালই, কিন্তু গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া যে বড় বড় দালান উঠে আমি তাহার বিরোধী।* আজ ঢাকা কলেজে এক হাজার বৃত্তি দিলে এক হাজার মেধাবী ছেলের পড়ার সুবিধা হইবে। প্রকৃত শিক্ষার যত সুবন্দোবস্ত হইবে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ততই মীমাংসা হইয়া যাইবে। ঢাকায় বা সিলেটে—

* ঢাকার বিরাট অট্টালিকাগুলি একরকম বিনা খরচায় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রকার সৌধমালায় প্রবাস করিয়া গৃহস্থ ঘরের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের মাথা বিগড়াইয়া যায়।

মাসে ৪০।৫০ টাকা কয়জন গৃহস্থ ছেলের পড়ার জন্য খরচ করিতে পারে? আমি চাই মুসলমানদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হউক।

এই যে মহামূল্য সময় নষ্ট হইতেছে—২৪ মাসের মধ্যে ২২ মাস আহার, নিদ্রা, খোশগল্প ও তাস পাশায় কাটিতেছে—ইহাতে নিজের জীবনের ও দেশের কত ক্ষতি হইতেছে? ডিগ্রী লাভ করিতে দুই মাসই যথেষ্ট; তাহা ছাড়া শুধু ডিগ্রী আর নকরী লইয়া একটা জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নকরীর মায়াও ত ঘুচিয়া গিয়াছে। ১৫।২০ বৎসর আগে মুসলমান যুবকরা বি-এ পাশ করিলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারিত, আজ সে পথ বন্ধ। সদরওয়ালা হইতে আরদালী পর্য্যন্ত গণনা করিলে দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র ০'৮ জন অর্থাৎ হাজার করা আট জন সরকারী চাকুরী করেন। তন্মধ্যে আরদালি, চৌকীদার, কনেষ্টবল প্রভৃতি সকলই আছে। কয়জনে বা মুন্সেফী, ডেপুটী, বা সব-ডেপুটীগিরি পায়? অথচ ইহার জন্যই কংগ্রেসে গিয়া প্যাক্ট্ করিতে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, স্বরাজ মানে কি এই যে, স্বরাজ হইলে দেশের লোক ইংরাজ কর্ম্মচারীর ন্যায় গরীবের অর্থ শোষণ করিয়া উচ্চ বেতন পাইবে, আর হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়েরা ৬৪ হাজারী মিনিষ্টারী বা ৪ হাজারী হাইকোর্টের জজিয়তির জন্য বখ্রা আরম্ভ করিবে? আমি বুঝি স্বরাজ হইলে যাহারা শিক্ষিত, তাহারা চাষী মুসলমানের ছেলে, বাগ্দীর ছেলে, চামারের ছেলে প্রভৃতিকে লইয়া নৈশ বিদ্যালয় করিবে, পূজার ছুটিতে গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষা দান করিয়া যাহারা নীচে পড়িয়া আছে তাহাদের টানিয়া তুলিবে। কেবল ভাল ছেলে হইলে চলিবে না; "ভাল ছেলে" পারিতোষিক পায়, সকলের কথা মত চলে, নাদুস্-নুদুস্ শরীর, যেমন চালাও তেমনি চলিবে। ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম "পুত্তলিকার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না" ইত্যাদি; ভাল ছেলেও ঠিক সেই রকম। ব্যক্তিত্ব নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, এমন কি নিজের জন্যও ভাবিতে পারে না।

আমি ভাল ছেলে চাই না, ডানপিটে ছেলে চাই। বাঙ্গালী যে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া নিভিয়া যায়—ভাল ছেলে সাজা তাহার একমাত্র কারণ। অন্যান্য দেশে কিন্তু এ রকম হয় না। বিলাতেরই একটি ছেলেকে, লেখাপড়া করে না বলিয়া, বাপ মা ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিল—হয় আত্মনির্ভরশীল হইতে নয়ত ম্যালেরিয়ায় মরিতে। সেই ২০।২২ বর্ষীয় যুবকই এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য জয় করিয়া ইংলণ্ডকে উপহার দিয়াছে। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় অতগুলি প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছে, অতটা বৃত্তি পাইয়াছে, যেমন মাছ ধরার জন্য বড়শী ফেলে, তেমনি ভাল ছেলে জুটাইবার জন্য বৃত্তির লোভ দেখান হয়। কিন্তু এই সব জলপানিওয়ালা ছেলে পাস করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন এক কড়া দুধ জ্বালে দিলে যেমন গড়্‌গড়্ করিয়া উঠে আবার থামিয়া যায় সেইরূপ তাহাদের শক্তি, সামর্থ্য সব নিস্তেজ হয়ে যায়। এমন ভাল ছেলে দিয়া কি হইবে? লেখাপড়া দরকার, সারাজীবন লেখাপড়া করিতে হইবে। আমি যখন যেখানে যাই, বই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পিরোজপুরে গিয়াছি, বোটে করিয়া নদীতে থাকিতাম; ১টা হতে ৪টা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতাম এবং যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহাদের সঙ্গে সকালে ১২টা পর্য্যন্ত ও বিকালে ৪টার পরে দেখা করিতাম, যেন লেখাপড়ার ব্যাঘাত না হয়। বাঙ্গালী সময়ের মূল্য বুঝে না, রোজ ২।৩ ঘণ্টা করিয়া পড়িলেই বিদ্যাদিগ্‌গজ হইতে পারা যায়।

আমাদের দেশে প্রায় ৩০,০০০ ছেলে কলেজে পড়ে, বিলাতেও প্রায় ২৬,০০০, অথচ বিলাতে শতকরা ৯৫ জন আর এখানে মাত্র ৫ জন শিক্ষিত। এখানে শিক্ষিত মানে যাহারা ক, খ, গ, লিখিতে পারে অর্থাৎ বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা লেখা পড়া করি শুধু চাকরীর জন্য। আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, ল' কলেজ তুলিয়া দিলে

উপায় নাই। প্রতি বৎসর শত শত ছেলে এখান হইতে পাস করিয়া আইন ব্যবসায়ীদের অন্নসমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে মাত্র। ইহাতে দেশের কি লাভ? আমি ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করিতেছি, আমি শিক্ষক, আবার ছাত্রও বটে, কেননা ছাত্র না হইলে শিক্ষক হওয়া যায় না। যার অনেক বিষয় জানা আছে সে এক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদান করিতে পারে—শত গুণ জানিলে তবে এক গুণ দেওয়া যায়। গোয়টে বলিয়াছেন—পাশ করিয়া শিক্ষক (lecturer) হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর নাই, কারণ সে যতটুকু শিখিয়াছে আমাকেও ততটুকু শিখাইবে, ঘানির বলদের মত গণ্ডির বাহিরে আর যাইবে না। অগাধ পণ্ডিত যিনি তাঁর কাছে কত নূতন ভাব পাইবে, কোন্ বই পড়িতে হইবে, কোন্ জিনিষ দেখিতে হইবে তাই তিনি বলিয়া দিবেন। এখন ছাত্রদের মহামূল্য সময় Paradise Lost মুখস্থ করিয়া কাটিয়া যায়, বিদ্যাবুদ্ধি ঐ একখানা বইতেই নিবদ্ধ। বাস্তবিক বলিতে গেলে জ্ঞানের সুরু কোথায় আর শেষ কোথায় কেহ জানে না। জগতে অসামান্য লোক যাঁহারা, শক্তিশালী প্রতিভাশালী যাঁহারা, তাঁহারা শুধু বই মুখস্থ করিয়া শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী হন নাই। ভারতবর্ষে আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিং, হায়দর আলী প্রভৃতি কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, অথচ, ইঁহারা সকলেই বড় বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা লেখা পড়া জানিতেন না, হজরত মহম্মদও তাই। কিন্তু তাই বলিয়া বলিনা যে, গণ্ডমূর্খ হইলেই সব হইবে। মাড়োয়ারী ভাইরা আমাদের এখানে আসিয়া ব্যাবসা করে বলিয়া, আমরা তাহাদের বলি ছাতুখোর, আর আমরা নিজেরা চালাক। ঘোড়াও খুব চালাক, বেগে দৌড়িতে পারে, তাহার উপর চড়িতে হইলে লাগাম দিয়া চড়িতে হয়। আজ বাঙালী-ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়া মাড়োয়ারী ও ইংরেজ ব্যাবসাদারেরা সুখে চড়িয়া বেড়াইতেছে। এম্-এ, বি-এ, পাশ করা বাঙালী

বাবু মাড়োয়ারীর কাছে ৫০।৬০ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরির জন্য আবেদন হাতে দৌড়াইতেছে। অনেক মাড়োয়ারী ব্যাবসাদার ইংরেজী জানেন না, কিন্তু ৪০ জায়গায় তাহাদের ৪০টি মোকামে কাজ চলিতেছে। পুরানো কাগজে, নাগরীতে কি ছাইভস্ম হুণ্ডি লিখিয়া দেয়, তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ ইংরেজী জানেন না, অথচ তিনি আজ বহু ক্রোড়াধিপতি। মাড়োয়ারীরা একপ্রকার অশিক্ষিত বলিলেও হয় এবং ভাটীয়ারা কেহ কেহ ইংরাজী জ্ঞানবিশিষ্ট বটে, কিন্তু ডিগ্রীধারী নয়। তাহারা বড় বড় কাপড় কলের স্বত্বাধিকারী, সকলেই বড় ব্যাবসাদার, তাই বলিয়া মূর্খ নয়। তাহাদের বিদ্যা কম থাকিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাঙালীর চেয়ে ঢের বেশী। আসল কথা, ব্যাবসা, বাণিজ্যও করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে রোজ ২।১ ঘণ্টা করিয়া পড়াও যায়। পড়িলে মন সতেজ থাকে, কাজে উৎসাহ জন্মে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়, আর ডিগ্রীর মোহও কাটিয়া যায়। আজকাল গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা বেতন ২৫৲, ক্রমে ৪০৲ পর্য্যন্ত হয়। আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি, ধরাপৃষ্ঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রাজুয়েটের ন্যায় হতভাগ্য জীব আর নাই। অথচ এই উপাধির জন্য অনেকের চুল পাকিয়া যায়, শরীর জীর্ণশীর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। কার্ণেগী অনেক বই লিখিয়াছেন, তাঁহার মত ধনী পৃথিবীতে মাত্র ২।৪ জন হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় বলে পিটার্সবার্গের লোহার খনির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি ৯০ কোটী টাকায় তাঁহার ব্যাবসা বিক্রয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও পরহিতব্রতে সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় করেন। মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসিয়া লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইয়াছে এবং হইতেছে। আর আমরা ফিন্‌ফিনে উড়ানী, সুগন্ধি তৈল এবং নানা প্রকার বিলাস ব্যসনে মগ্ন হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছি ও ডিগ্রীর গর্ব করিয়া নিজেদের অসারতা ও অপদার্থতার পরিচয় দিতেছি। যে মুস্তাফা কামাল পাশার

নামে পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার প্রবল শক্তি ইউরোপের উপর এসিয়ার জয় ঘোষণা করিতেছে, তিনি ডিগ্রীধারী কিনা জানি না, কিন্তু তিনি দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং তার উপর সাহসী। ৫।৬ বৎসর আগে মাদ্রাজে ৩।৪ হাজার ছেলের সামনে বক্তৃতা উপলক্ষে বলিয়াছিলাম, 'I often travel with my books and research scholars'—আমি সদাসর্ব্বদা পুস্তক ও গবেষক ছাত্র সমভিব্যাহারে ফিরি। এখনও আমি তাই করিয়া থাকি। অনেকে বলেন যে, আমি এখন তাঁত, চরকা, টানা, নলী লইয়া থাকি এবং রসায়ন শাস্ত্র ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গত দুই বৎসরে স্বাধীন গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তেমন জীবনে হয় নাই। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়ি না, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়।

এখন গ্রামে গ্রামে গিয়া জঙ্গল কাটিতে হইবে, পুকুর কাটিতে হইবে, ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইবে, নিজে কোদাল ধরিতে হইবে। হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া জলের অভাবে কত লোক মারা যাইতেছে। ভদ্রলোক যদি সাধারণের স্বার্থের জন্য কোদাল ধরেন তবে দেখাদেখি শত শত লোক সঙ্গে আসিবে। গভর্ণমেণ্টের আশায় বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। তাহারা ৩০ কোটি টাকা শুষিয়া লইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও ঐরূপ কিছু দিয়া বিদায় করে। মহামতি গোখলে আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বাংলা দেশে আসিয়া যখন বাংলার নেতাদের মত জানিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "কি, একজন মারাঠী আসিয়া বাংলার নেতা হইবে? তাহা হইতে দিব না,"—যেমন অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে মানে না, ভাবে, 'আমরাই বাংলার নেতা হইবার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছি।' বিফল হইয়া গোখলে বরিশালের অশ্বিনীবাবু এবং পরে ঢাকার নবাব আলী চৌধুরী প্রভৃতির

সঙ্গে দেখা করেন। নবাব আলী চৌধুরী পাকা কথা বলিয়াছিলেন যে, বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষার জন্য হিন্দুরা যদি এক পয়সাও না দেয় এবং ইহার জন্য যদি মুসলমানদের বেশী ট্যাক্স দিতে হয়, তাও স্বীকার, তবু নিম্নশিক্ষার বহুল প্রচলন চাই। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৭০।৭৫ জন মুসলমান। শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে তাহারাই লাভবান হইবে, না ৬৪ হাজার পাইয়া দেশকে বিক্রয় করিবে? গোখলে দেখিয়াছিলেন যে স্যর হারকোর্ট বাটলার যে ভাবে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী তাহাতে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিতে প্রায় ৫০০ বৎসর লাগিবে। আজ জাপানের চক্ষু ফুটিয়াছে, সেখানে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে; কাবুলেও তাহাই সুরু হইয়াছে। কাবুল হইতে সহস্র সহস্র যুবক উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী যাইতেছে, ইংলণ্ডে যায় কিনা জানি না। পারস্য এতদিন একদিকে একটা কুমীরের গ্রাস ও অন্যদিকে একটা সিংহের 'হাঁ' এর ভিতর পড়িয়াছিল, যেমন সে নিষ্কৃতিলাভ করিল অমনি 'মজলিস্' বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা প্রচলিত করিল। জগলুল পাশাও তাই করিয়াছেন। আমি চাই মুসলমান ভাইরাও বোম্বাইএর মুসলমানদের মত হউন। স্যর ইব্রাহিম করিমভাই, বড় বড় মিলের মালিক ও অন্যান্য বোরা সওদাগরগণের জাহাজ পারস্য আরবদেশের উপকূলে বাণিজ্যব্যপদেশে যাতায়াত করে। তাহারা সবাই বড় বড় বণিক। স্বাধীন ব্যাবসা না করিয়া যদি কেবল শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দরজায় গিয়া কুর্ণিশ করি তাহা হইলে আত্মমর্য্যাদা থাকে না। চাকুরীই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, মুসলমান ভাইদেরও যখন চাকরী একচেটিয়া হইবে তখন তাঁহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

বিবাহের বাজারে কোনো এম্-এ বা বি-এ পাস পাত্রের ৫।৭ হাজারের কমে পোষাইবে না। কত গরীব মেয়ের বাপ ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইবে, কত ঘরে বিষাদের ছায়া পড়িবে! যদি বলা যায়, ধিক্ তোমাদের লেখা

পড়ায়, আবার দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছ! অমনি নাকি সুরে বলিবে—"কি করিব,—বাপ মার কথা অমান্য করি কিরূপে, তাঁহারা আমার জন্য এত করিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি তো বলিয়া থাকি "বাঙ্গলা দেশের অবিবাহিত যুবকরা এক একজন ভাবী স্নেহলতার হত্যাকারী।" অশ্বিনী বাবু বলিতেন, "এখানকার ছেলেরা কেবল বিবাহের বাজারে স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতৃ-মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা. দেখায়।" অনেক বাপ মাও ছেলের বিবাহ দিয়া তাহার জন্য যাহা খরচ হইয়াছে তাহার সুদে আসলে আদায় করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকেন। এমার্সন বলিয়াছেন "After a certain period parents become malefactors instead of benefactors" অর্থাৎ যখন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্ব চালান হয় তখন বাপ মা হিতৈষণা ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর অত্যাচারী সাজিয়া বসেন। চাণক্যও এই কথা বলিয়াছেন। আরও কত অন্ধ কুসংস্কার আমাদের উন্নতির অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা আর কত বলিব। বাঙ্গালী ছেলেদের জীবন ঘরে এক প্রকার, বাহিরে আর এক প্রকার; এই দ্বিধা-বিভক্ত জীবন বহন করিয়া ব্যক্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেয়। মা বলিয়াছেন আজ গ্রহণ—পূর্ণগ্রাস, অসুর আসিয়া দেবতাকে গ্রাস করিবে, অতএব যাত্রা নাস্তি, হাঁড়ি ফেলিতে হইবে, স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তাই মানিয়া লইলাম অথচ ক্লাশে পড়িয়াছি "Shadow of the earth creeps over the moon etc."—পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়ে ইত্যাদি।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ক্রমেই প্রবলতর হইতেছে। মাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান-এর প্রতিনিধি পাকা কথা বলিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের একজন শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একটা বিরাট জাতি-সংগঠন শুধু বাংলা দেশেই সম্ভব, যদিও বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫২ আর হিন্দুর শতকরা ৪৮ জন। কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের ভাষা এক, রক্ত এক, দেশ এক। ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু ছিল।

"Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a Hindu"—বাঙ্গালী মুসলমানের গাত্রচর্ম্মের নীচে একজন করিয়া হিন্দু লুক্কায়িত ; কিন্তু বিহার হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত যদিও হিন্দুর সংখ্যা বেশী তবু জাতি সংগঠন তাহাদের পক্ষে এত সোজা নয়, কারণ তাহারা মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া উর্দ্দু, পারসী ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাংলা দেশে ছিল না, এখন হইয়াছে। ভালই হইয়াছে, বদ্ রক্ত বাহির হওয়াই মঙ্গল। যত আলোচনা, সমালোচনা হয় ততই সবাই বুঝিবে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। জাপানে দেখা যায় বাপ বৌদ্ধ বা সিংটো, ছেলে খ্রীষ্টান ; ইহাতে তাহাদের ধর্ম্মে বাধে না, কারণ দেশপ্রেম জাপানের আসল ধর্ম্ম। আলিগড়ে সেদিন বলিয়াছি—"তোমাদের দেশপ্রেম যেন দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম না করে।" আজ যদি স্বরাজ হয় তবে কি মুসলমান ভ্রাতারা কাবুলের আমীরকে ডাকিয়া আনিবে, আর তাহদের সঙ্গে যোগ দিয়া হিন্দুদের গলা কাটিবে? তাহা হইবে না, কারণ মুসলমান হইলেও তাহারা দাসত্ব ও পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইবে না। ইতিহাসে কি দেখি? মুসলমান রাজত্বের সময়ও রাজসাহী, বরেন্দ্র ভূমিতে সর্ব্বত্র হিন্দুদের জমিদারী। আওরঙ্গজেব শিবাজীকে পরাজিত করিবার জন্য জয়সিংহকে পাঠাইলেন, প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর পাঠাইলেন মানসিংহকে—ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা হিন্দুদের বিশ্বাস করিতেন। আকবরের সময় তোডরমল রাজস্ব-সচিব ছিলেন। আমি ছেলেবেলায় ভাবিতাম গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড বুঝি ব্রিটিশরাজের কীর্ত্তি, পরে জানিলাম, তাহা নয়, সের শাহ উহা তৈয়ারী করিয়াছেন, আর আমাদের কর্ত্তারা উহার উপর ২।১ কোদাল মাটি ও সুরকী ফেলিয়াছেন! তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি, এমন বাঙালী মুসলমান কি আছেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব না করেন?

তাজমহল লইয়া কি হিন্দুরা গর্ব্ব করে না? কেহ কি বলে যে, বিদেশী রাজা সাজাহান ইহা করিয়াছেন? তাজমহলকে পৃথিবীর মধ্যে অলৌকিক, অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন, তাই দেখিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি বিমুগ্ধ; ইহার ভিতর হিন্দুরও মস্তিষ্ক ছিল। বিদেশী ভাব এখানে আসে না। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন এদেশে ছিল না—থাকিবেও না। দু'চার দিন নাড়াচাড়া খাইয়া দেশ হইতে দূর হইয়া যাইবে।

তারপর অস্পৃশ্যতা,—এ ভণ্ডামী আর চলিবে না। বরফ খাইব, সোডা খাইব, ষ্টীমারে বাবুর্চ্চির রান্না খাইব, হোটেলে খাইব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখিব, তাহা হয় না। কাল শ্রদ্ধানন্দ স্বামী আসিয়াছেন, কিন্তু যতদিন হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না করিবে ততদিন শত শত শ্রদ্ধানন্দ আসিলেও মুসলমানদের ভয় পাইবার কারণ নাই। দুই চার জনকে শুদ্ধ করিলে কি হইবে? বোরা সম্প্রদায় আগা খাঁর শিষ্য, কিন্তু মৃত্যুর পর হিন্দুদের মত তাহাদের দায়ভাগের ব্যবস্থা হয়। একজন বোরাকে হিন্দু করা হইয়াছিল, ইহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি চলে। বোরা হিন্দুসমাজে আসিল, কিন্তু বেচারাকে লইয়া কেহ খায় না,—বাগ্দী, ডোমের মত তাহাকে তফাতে থাকিতে হয়, তাহার সহিত বিবাহাদি চলে না; তখন সে বলিল, ইহা অপেক্ষা মুসলমান সমাজেই তাহার থাকা ভাল ছিল। ইস্‌লাম্ ধর্মের মত উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই, উচ্চ নীচ বলিয়া কোন পার্থক্য নাই, আমীর আর ফকির পাশাপাশি বসিয়া নমাজ পড়ে, অতিথি আসিলে একপাত্রে ভোজন করে,—সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব। ইস্‌লাম্ ধর্ম্মপ্রচারকেরা যখন ভারতবর্ষে আসিয়া সাম্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ছুঁৎমার্গ এখন ভাতের হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়াছে। বাংলার যুবকবৃন্দ, সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন ছিল তেমনি আছে, তেমনি চলিতে থাকিবে—ইহা করিলে হইবে না। সব দেশ জাগিয়াছে, একবার হিন্দু-মুসলমান

গলাগলি হইয়া দাঁড়াইলে দেখা যাইবে স্বরাজ করতলন্যস্ত, কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। শ্রদ্ধানন্দ আসিয়াছেন আসুন, যতদিন হিন্দুরা প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে না পারে, ততদিন মুসলমানেরা নাকে সরিষার তৈল দিয়া ঘুমাইবে, তাহাদের কোন ভয় নাই। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বলিয়াছেন, "করিতে পরি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ।" বাঙালী যুবক দরকার হইলে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু জুজুর ভয় বাঙালী যুবকের গেল না। এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াইতে না পারিলে হিন্দু ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। এসব ছাই পাঁশ দূরে ফেলিয়া হিন্দু জাতিকে বক্ষ বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে; নোংরা দেশাচার পাপাচার আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। ছাত্ররা ডাকিলে আমি না সাড়া দিয়া থাকিতে পারি না, তাহারা ভবিষ্যতের আশা, তাহাদের দিকে চাহিয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও বাঁচিয়া আছি। বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে, শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের অভাব। উপযুক্ত নেতা থাকিলে কি হইতে পারে তাহা জগলুল পাশা, মুস্তাফা কামাল পাশার কথায় বলিয়াছি। বিপদ সকল দিক দিয়া দেখা দিয়াছে, মুসলমানদেরও এ ডাকে সাড়া না দিয়া উপায় নাই। এখন ভাবিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে যে, আবহমান কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার যে প্রবৃত্তি তাহাকে কি করিয়া নষ্ট করা যায়। কত রকম সামাজিক ব্যাধি রহিয়াছে, এ দূর না করিলে জাতিগঠন হইবে না। একটা জাতিকে উঠিতে হইলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব দিক দিয়া তাহাকে আগাইতে হইবে, শুধু একদিক দেখিলে চলিবে না।

ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ

(১)

অধুনা কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ ২৫।৩০ হাজার ছাত্র ডিগ্রীর মোহে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি এই কথা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, যদি বাছাই করিয়া ইহার দশ ভাগের এক ভাগকে কলেজে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে সরকারী চাকুরীর জন্য এবং উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা একটু ধারাপাতের হিসাব জানেন, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, প্রতি বৎসর কতগুলি সরকারী চাকুরী খালি হইয়া থাকে। মাত্র যে কয় জন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য চাকুরীয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ জন্য সহস্র সহস্র বালককে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রলুব্ধ করা সর্ব্বনাশের কারণ নহে কি?

আবার আজকাল ব্যাবসা-বাণিজ্য মন্দা বলিয়া রেলওয়ে, পোর্ট কমিশনার, পোষ্ট অফিস, তার অফিস, কাষ্টম আফিস প্রভৃতি বিভাগেও অসম্ভব রকম ব্যয়সঙ্কোচ হইতেছে। সুতরাং চাকুরীর নূতন পদ সৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা লোপই পাইতেছে। তাহা ছাড়া বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর চাকুরী পাওয়ার আশাও এক রকম অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাকে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টাকাল অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হয় এবং ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কারণ, দলে দলে লোক আসিয়া বলে যে, "মহাশয়, কি করিয়া ব্যাবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করা যায়? আপনি ত বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনিই

এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন।” আমি প্রথমেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, “বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ মাড়াইয়াছ কি না?” অবশ্য তাহারা ম্লানমুখে বলে যে,—হ্যাঁ, বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি।” এমন কি, কেহ কেহ বলেন যে, বি-এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছি। আমি অমনই উত্তর দিই যে, “আর আশা ভরসা নাই।”

ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর ব্যবস্থাপত্র দানের ন্যায়—অর্থাৎ ভাল করিয়া রোগ নির্ণয় করিবার এবং নাড়ী টিপিবার আগেই—ব্যবস্থাপত্র লিখিতে হয়। যে সকল যুবক আমার নিকট আসেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, আমি যেন তাঁহাদের চেহারা দেখিয়াই বলিয়া দিই, কোন্ ব্যবসার দিকে তাঁহাদের রুচি আছে, কি করিলে ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করা যায় এবং মূলধনই বা কোথায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, ৪।৫ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া A, B, C, D, বি-এল্-এ ব্লে ইত্যাদি সুরু করিয়া ২০।২১ বৎসর পর্য্যন্ত ডিগ্রীর মোহে পড়িয়া জীবনের যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু উৎসাহ, সবই লোপ পাইয়াছে। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা এম-এ, বি-এল্ হইয়া আদালত হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা সামান্য কেরাণীগিরিও না জুটাইতে পারিয়া অগত্যা ব্যাবসা করিতে আসিয়াছেন। আমি বলিয়া থাকি যে, “ঠিক হইয়াছে; তোমরাই ব্যাবসাদার হইবার উপযুক্ত বটে!” এই প্রকার আলাপে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহাও বুঝিতে পারি।

কিন্তু উপায় কি, যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে অপ্রিয় সত্য কথা বলাই ভাল। কথাটা তাই স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি। দেখিতে হইবে, আমাদের মূল গলদ কোথায়। বাঙালী জীবনের গোড়াতেই বিষম গলদ রহিয়া যাইতেছে। মনে করুন, এক জন এম-এ, বি-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, অমনই কি তাঁহার ওকালতীতে পসার হইবে? প্রথমতঃ

তাঁহাকে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের নিকট কিছু দিন শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। তারপর ধীরে ধীরে হয়ত তাঁহার 'পসার' জমিতে পারে। ডাক্তারেব বেলাও ঠিক তাই।

এইত গেল ডিগ্রীধারীদের কথা। ব্যাবসা-ক্ষেত্রেও শিক্ষানবিশী অতি তরুণ বয়স হইতে আরম্ভ করা দরকার। মাত্র উচ্চ প্রাইমারী অথবা বড় জোর মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইয়া বালকদিগকে ভাল ব্যাবসাদারের নিকট বিনা মাহিনায় (দরকার হইলে কিছু সেলামী দিয়াও) ভর্ত্তি করাইতে হইবে, এমন কি, মহাজনের গদীতে ঝাড়ুদারের বা তামাক-সাজার কাজ লইয়াও প্রবেশলাভ করিতে হইবে। যদি এই প্রকার কোন সুবিধা না হয়, তাহা হইলে হাটে-বাজারে নিরন্তর ঘুরিয়া কোথা হইতে কোন্ জিনিষ কি দরে ক্রয় করা হয় এবং কোথায় বা সেগুলি বিক্রয় করা হয়, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, হাওড়ার হাট ইহার একটি মস্ত শিক্ষার স্থল। বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে হইলে যেমন পরীক্ষাগার দরকার, ব্যাবসা-ক্ষেত্রে হাট-বাজার গঞ্জগুলিও ঠিক সেই প্রকার। আমি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বড় বড় গঞ্জে মহাজনের গদি আছে। তাঁহারা কখনও খুচরা জিনিষ বিক্রয় করেন না, কেবল পাইকারদের নিকট মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। ছোট ছোট ফড়িয়ারা সেই মাল লইয়া হাটের দিনে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সেই সকল দ্রব্য খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রথমতঃ দরকার হইলে মহাজনের নিকট ৫০।১০০ টাকা জমা দিয়া মাল লইতে হয়, কিছু দিন তাহাদের সহিত লেন-দেন হইলে এবং বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিলে আর টাকা জমা দিবার প্রয়োজন হয় না।

মনে করুন, পঞ্চাশ টাকার মাল লইয়া টাকা প্রতি দুই পয়সা মুনফায় বিক্রয় করিলাম। এক শত পয়সা, অর্থাৎ এক টাকা নয় আনা রোজগার হইল। মহাজনের টাকাও শোধ দিলাম। রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া

এই কাজ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে এইরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে করিতে ইহাতে আত্মপ্রত্যয় স্বতঃই দেখা দিয়া থাকে। আমি নিজে জানি যে, আমাদের দেশের বাড়ীর সন্নিকটে একটি বিরাট গঞ্জে একজন তরুণ-বয়স্ক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী প্রকৃতপক্ষে লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাঁহার ব্যাবসা-আরম্ভ করেন। কিন্তু অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে তিনি ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে গঞ্জের সমস্ত ব্যাবসা করতলগত করিয়াছেন। এই ব্যাবসাদার কলিকাতা হইতে কাপড়, লবণ, লোহা-লক্কড়, কেরোসিন প্রভৃতি মাল আমদানী করেন এবং সেই স্থানের পাট, ধান প্রভৃতি দ্রব্য এবং সুন্দরবনের কাঠ, মধু, মোম প্রভৃতি কলিকাতায় চালান দিয়া থাকেন। সাহা, তিলী প্রভৃতি পূর্ব্বেকার ব্যবসায়িগণ তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত গঞ্জ এখন তাঁহার অধিকৃত বলিতে পারা যায়।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতি বৎসর ৪০।৫০ কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়; ব্যাবসাদারগণ আমাকে হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এই ৪০।৫০ কোটি টাকার লভ্যাংশ অন্যূন ১০।১২ কোটি টাকা রেলি, ডেভিস্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় ও জার্ম্মাণী বণিক্‌গণের এবং তৎপরে ভাটিয়া, মাড়োয়ারী প্রভৃতির (middle man) হস্তগত হয়। অবশ্য ছোট-খাটো ব্যাপারীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান কতক কতক আছেন, এ কথা স্বীকার্য্য। এতদ্ভিন্ন নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কলাই এবং যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারীরা চাষীদের নিকট দাদন দিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী যে কত অসহায়, অকর্ম্মণ্য, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়।

শুধু মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদারদিগের সমবেত আয় প্রায় ২৫।৩০ লক্ষ টাকা হইবে। তন্নিকটবর্ত্তী নেত্রকোণার অন্তর্ভুক্ত গৌরীপুরের জমিদারদের আয় প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা হইবে, কিন্তু এই জমিদাররা যে কত অপদার্থ তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের জমিদারীর পাট মাড়োয়ারী

এবং অন্যান্য বিদেশীয় বণিক্গণ পূর্ব্বেই দাদন দিয়া যায়, এবং মরসুমে আসিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব জমিদার (যাঁহাদের আয় ৩ হইতে ৭ লক্ষ টাকা করিয়া হইবে) যদি এই পাটগুলি নিজেরাই তাঁহাদের কাছারীতে অন্যূন ২ মাসের জন্য গোলাজাত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে দরিদ্র কৃষকগণ অনেকাংশে লাভবান হইতে পারে, এবং ব্যবসায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অর্থাৎ আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি সে ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে কৃষকগণ য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারী বণিকগণের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলী হইত না।

বাংলা দেশের জমিদারদিগের ন্যায় অপদার্থ জীব পৃথিবীতে আর আছে কি-না সন্দেহ। অবশ্য আজ এই অর্থনীতিঘটিত দুর্দ্দিনে জমিদার-দিগের বিষয়-সম্পত্তি লাটবন্দী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ২০।২৫ বৎসর যাবৎ যখন পাট ১০।১৫।২০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছিল, তখন জমিদারীর মুনাফা বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা নির্ব্বিবাদে আদায় হইয়াছে। কিন্তু সে সময় তাঁহারা শহরের বিলাসকুঞ্জে অলস জীবন যাপন করিয়া পল্লীমাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কি তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন?

বাংলা দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সমষ্টি করিলে কয়েক শত কোটি টাকা হইবে। ইহার লব্ধ মুনাফাও ১৫।২০ কোটি টাকার কম হইবে না। কিন্তু ইহার সামান্য ভগ্নাংশও বাঙালীর হস্তে পৌঁছায় কি-না সন্দেহ। ইহা কি কম পরিতাপের—কম লজ্জার কথা!

পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বাঙ্গালী চাকুরীর মোহে বাণিজ্যলক্ষ্মীকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া আজ 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করিয়া এক হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-রোল উত্থিত করিতেছেন, এবং কখন বা আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতেছেন!

এই সর্ব্বনাশের মূল কারণ কি, পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহাই বুঝাইতেছি বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রত্যেক ছেলেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হইয়া মাত্র যদি প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেকে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, এবং বাকি ছেলেদের ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইবার পর ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবস্থার কত উন্নতি হয়! কোটি কোটি টাকার কাঁচা মাল কি প্রকারে এবং কত হাতের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহা শিক্ষা করিতে শিক্ষানবিশীরূপে তাহাদিগকে যদি নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে আর অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হয় না। প্রকৃত ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে ছোটো-খাটো ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কয় জন সেই "অপমান" স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?

আমি এমন অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি যে, পাটের মরসুমে (যাহা মাত্র ২।৩ মাস কাল স্থায়ী থাকে) একজন ফড়িয়া ২৫।৩০ হাজার টাকার মাল নিকটবর্ত্তী আড়তে সরবরাহ করিয়া ১০০০।১৫০০ টাকা রোজগার করিয়া থাকে এবং বাকী ৮।৯ মাসকাল স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। অবশ্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষীগণের নিকট কিছু কিছু টাকা দাদনও করিয়া থাকে।

অনেক যুবক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, "মহাশয়, ব্যাবসা করিব, মূলধন কোথায়?" আমি বলি, "সাধুতা এবং বিশ্বাসই প্রকৃত মূলধন।"

আমাদের অভিভাবকগণ ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে কত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকাল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে আই-এস্-সি, এমন কি বি-এস্ সি পাশ করিয়াও যে কি

প্রকার বেগ পাইতে হয়, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। প্রথমতঃ আই-এস্ সি পাস করিতে হইলে মাসে ৪০৲ হিসাবে দুই বৎসরে প্রায় ১০০০৲ টাকা খরচ পড়ে। তারপর মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ৬ বৎসর পড়িতে হয় এবং এমন সৌভাগ্যবান ছেলে খুব কমই আছে, যে বরাবর ৬ বৎসরই এক এক বারে পাস করিয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ কয়েকবার ফেল্ হইয়া থাকে অথবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারে না। সুতরাং এম্-বি পড়িতে গড়ে ৭ বৎসর লাগে এবং মাসিক ষাট টাকার কমে একটি ছেলেকে ডাক্তারী পড়ান যায় না। তাহা হইলে পড়ার খরচ পড়ে ৭২০ × ৭ = ৫০৪০ টাকা। সুতরাং আই-এস্ সি + এম-বি পড়ার খরচ অন্যূন ৬০০০৲ এবং বি-এস্ সি + এম্-বি, পড়ার খরচ ৭০০০৲ টাকা। আমি ন্যূনকল্প হিসাবই এই স্থানে দিলাম।

এই ত গেল কেবল পাস করার খরচ। একজন হাইকোর্টের জজ্ বলিয়াছিলেন, "The woes of the decree holder only begin when he gets the decree" ; Decree holder এবং Degree holder উভয়ই তুলনীয় অর্থাৎ একজন ডাক্তারী পাস করিলেই অমনই যে তাহার পসার হইবে, ইহা ভুল ধারণা। এই কলিকাতা সহরে অন্যূন ২ হাজার ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন। তাহা ছাড়া হোমিওপ্যাথী এবং ডিপ্লোমাবিহীন অন্ততঃ আর এক হাজার চিকিৎসক আছেন। বর্দ্ধমানের ন্যায় ছোটো খাটো সহরেও প্রায় ৪০ জন ডাক্তার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ডিপ্লোমা পাইয়াও অনেকে পেটের অন্ন-সংস্থান করিতে পারিতেছে না।

আমার এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মাত্র একটি ছেলের জন্য অভিভাবক ৬।৭ হাজার টাকা অম্লান বদনে খরচ করিয়া থাকেন এবং পসার জমাইবার জন্য আরও ৩।৪ হাজার টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু যদি সেই

ছেলেকে বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৫ শত করিয়া টাকা দিয়া তাহাকে গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপারী বা ফড়িয়ার কাজে অভ্যস্ত করান, তাহা হইলে পরিণামে অন্ততঃ সে আড়তদারে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালীর বিশেষতঃ ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যবসায়ের প্রতি আদৌ মতিগতি নাই!

(২)

কয়েক বৎসর হইতে এক ধুয়া উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্থকরী নহে, অতএব ব্যাবসা-বাণিজ্য শিক্ষা করিবার জন্য নূতন একটি ফ্যাকালটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভব করাইয়া না লইলে আর চলিতেছে না। বলা বাহুল্য, প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-কম্ পাশ করিয়া এ দেশের বহু ছাত্র কর্ম্মজীবনে প্রবেশ-লাভের পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। ফলে বহু বি-কম-এরই সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহার মধ্যে ষোল আনাই ফাঁকিদারী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি ব্যবসায় শিক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে কলিকাতায় ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা, পোস্তা, হাওড়ার হাট, চেতলার হাট এবং মফঃস্বলের বড় বড় গঞ্জ (যেমন মৈমনসিংহের ভৈরববাজার) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য অবস্থায় থাকিয়া, দৈহিক পরিশ্রম করিয়া এবং মানসিক বুদ্ধি খরচ করিয়া পাকা ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করিয়া সাকরেদী করিতে হইবে। নতুবা কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাস করিলেও নামের শেষ ভাগে বি-কম্ জুড়িয়া দিলেই ব্যাবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। এই সকল উপাধি-ধারীরা পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া, কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়ান ও বড়

বড় প্রবন্ধ-রচনা দ্বারা বিদ্যা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই করিতে সমর্থ হন না। তাহার পর পরিণামে তাঁহারা 'নৈশ ক্লাসে' ভর্ত্তি হইয়া শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং (Short-hand ও Typewriting) শিখিয়া, মাড়োয়ারী অথবা কচ্ছী (যাহাদিগকে আমরা "অশিক্ষিত" বলি,) প্রভৃতির আফিসে ৩০।৪০ বা ৫০৲ টাকা বেতনের কেরাণী হইয়া, রোজ ৮।১০ ঘণ্টা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন। ইহাই সাধারণতঃ বি-কম-এর পরিণাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও প্রতি বৎসর বি-কম্ শ্রেণীতে ছাত্রের অভাব হয় না!

প্রায় ১৪ বৎসর হইল, আমি আসামে ছাত্র-সম্মিলনীতে আহূত হইয়া তেজপুরে গমন করি। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, কেবল তেজপুর সহর নহে, সমস্ত আসাম প্রদেশটাই মাড়োয়ারীর করতলস্থ। আমি সেখানে আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে, একজন বাঙ্গালী যদি একটি ৪০।৫০ টাকার শিক্ষকতা বা নকলনবিশী পায়, অমনই তোমরা অভিযোগ করিয়া বল যে, আসাম কেবল আসামবাসীদের জন্য। তোমরা চোখের উপর দেখিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না যে, তোমাদের এই আসামে এক জন মাড়োয়ারী গদিয়ান হইয়া যাহা উপার্জ্জন করে, বোধ হয়, আসামের সমস্ত বাঙালী রাজকর্ম্মচারীদের সমবেত আয় তাহার সমতুল্য হইবে না। অথচ এই মাড়োয়ারী ব্যাবসাদাররাই যে সমগ্র আসাম প্রদেশ পঙ্গপালের ন্যায় ছাইয়া ফেলিতেছে, সেদিকে আসামবাসীর হুঁস নাই, কেবল দুই দশ জন বাঙ্গালী সামান্য চাকরী করিতেছে বলিয়াই তাঁহাদের হা-হুতাশ!

তেজপুর সহরে মাড়োয়ারীগণ কেবল যে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য-গুলি একচেটিয়া করিয়া আছে, তাহা নহে, সন্নিহিত অঞ্চলের ব্যাঙ্কিং ও মহাজনীও দখল করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি, সেই অঞ্চলে যত বড় বড় ইংরাজের চা বাগিচা আছে, তাহারা তাহাতেও টাকা দাদন দিয়া থাকে। ইংরাজ যখন আসাম অধিকার করেন, তাহার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে

আসামে যাইতে হইলে ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে হইত, তখন রেল হয় নাই। কাজেই তখন আসাম যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ছিল। তখনও মড়োয়ারীগণ সেই সকল স্থানে, এমন কি, সাদিয়া সহরে—ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থানের দিকে যতদূর পর্য্যন্ত নৌকা-চলাচল সম্ভব হয়, ততদূর পর্য্যন্ত কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে শুধু বাংলা দেশে নহে, সমগ্র আসামেও তাহারা ব্যাবসা-বাণিজ্যের জাল বিস্তার করিয়াছে।

সিকিম ও ভুটান রাজ্যের প্রান্তদেশের সমস্ত ব্যাবসাও মাড়োয়ারীগণের অধিকৃত। মাড়োয়ারীগণ প্রথমতঃ সামান্য রঙ্‌চঙ্‌ওয়ালা বিলাতী কাপড়, লবণ ইত্যাদি গর্দ্দভ, অশ্বতর বা বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া যাইত। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য বিপদকে উপেক্ষা করিয়া, মাড়োয়ারীগণ পদব্রজে এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার লইয়া গিয়া সিকিম ও ভুটান-বাসীদের সহিত পশম, মৃগনাভি, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময় করিত—এখনও সেইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপে সামান্য মূলধন লইয়া ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া, তাহারা নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়া থাকে এবং সাহস, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে পরে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়।

এই স্থলে কালিম্পং সহরের কথাও বলি। এই নগরকে তিব্বত দেশের Inland Port অর্থাৎ সমুদ্র বা নদীতীরস্থ বন্দর না হইলেও বাণিজ্য-বন্দর বলে। তিব্বত হইতে ৬০।৭০ লক্ষ টাকার পশম, এতদ্ভিন্ন বড় এলাইচ প্রভৃতি এই বন্দর হইতে যাহা কিছু রপ্তানী হয়, সমস্তই মাড়োয়ারীদের হাত দিয়া হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা হইতে তাহারা অন্যূন ৮।১০ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। অবশ্য বাঙ্গালী দুই একজন কালিম্পংএ আছেন; কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যলাভের বা কেরাণীগিরির জন্য!

আমাদের বিলাসী, শ্রমবিমুখ বাঙ্গালী যুবকগণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা আহরণের জন্যই ব্যস্ত। সেজন্য তাঁহাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের অর্থ—কেতাবী বিদ্যার উপাধি বি-কম্—এই আত্মপ্রতারণার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই পাপের প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। দেশের কতক যুবক যে কেতাবী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক এবং জগতের সকল সভ্য দেশেই তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়াও ব্যাবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে কেতাবী বিদ্যা ব্যতীত হাতে-হাতিয়ারে তাহার জন্য প্রথমাবধি প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা উপাধিলাভ পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাঙ্গালী যুবকগণ আমাকে বলিয়া থাকেন যে, "মহাশয়, ব্যাবসা করিব, কিন্তু মূলধন কোথায়?" শুনিয়া আমার হাসিও পায়, কান্নাও পায়! ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পর যখন বাঙ্গালী স্বাবলম্বী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তখন অনেক ভুঁইফোড় ব্যাবসাদার দেখা দিয়াছিল। দেশপ্রেমিক জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১০।১৫, এমন কি, ২০।২৫ হাজার টাকা লইয়া অনেক যুবক ব্যাবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই সেগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইল। কেন? শিক্ষার অভাব, সাকরেদির অভাব। শিক্ষানবিশী না করিলে কেহ একেবারে 'এণ্ড কোং' হইয়া বসিতে পারে না! বাঙ্গালীর ব্যাবসা করার অর্থ—প্রথমেই সদর রাস্তার উপর চেয়ার, টেবিল ও বৈদ্যুতিক বাতি-সংযুক্ত ঘর। গোড়ায় যখন এমন গলদ, তখন তাহার পরিণাম কি শুভ হইতে পারে? আগে কঠোর শ্রমসাধ্য শিক্ষানবিশী করা চাই। অভিজ্ঞতালাভ হইলে ক্রমে ক্রমে ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করিয়া থাকে।

মাড়োয়ারীগণ সত্যই লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া, ছাতু খাইয়া, পিঠের উপর একমণ দেড়মণ বোঝা বহিয়া, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এইরূপ অনবরত পরিশ্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু আমাদের গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি—এক দিনেই বড় লোক হইতে হইবে। রথ্‌চাইল্ড, কার্ণেগী, ফোর্ড অথবা সরাবই, চামারিয়া, গোকুলদাস মোরারজী এক দিনে গড়িয়া উঠে না।

সম্প্রতি আমার একজন ধনী, কৃতী মাড়োয়ারীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার সুযোগ হয়; আমি নয়াদিল্লীতে শ্রীযুক্ত শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলার বাড়ীতে ৩।৪ দিন অবস্থান করি। সকলেই বোধ হয় জানেন যে ঘনশ্যাম বাবু অতি অল্প বয়সেই কলিকাতায় আসিয়া ব্যাবসার সূত্রপাত করেন। অবশ্য তাঁহার পিতা রাজা বলদেও সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। জ্যেষ্ঠ যুগলকিশোর বাবু আদৌ ইংরাজী জানেন না, কিন্তু কলিকাতার রূপার বাজারের এক জন রাজা। ইনি সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ও দানশীল। কিন্তু ঘনশ্যাম বাবু অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা সকল বিষয়ে অধিক কৃতী। ইনি ১০।১২ বৎসরের মধ্যে ভাল রকম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া অর্থ ও রাজনীতি-ঘটিত অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ভারতের সহিত সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিসংক্রান্ত কিরূপ সংযোগ-সম্বন্ধ, সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মধ্যম ভ্রাতা বোম্বের শেয়ার মার্কেটের এক জন ধুরন্ধর। ইনি ইংরাজী যৎকিঞ্চিৎমাত্র জানেন। সে দিন আমি তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে তিনি বলিলেন,—"মাফ করুন, ইংরাজীতে আমার দখল বড়ই কম।" কাজেই আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে বাধ্য হইলাম।

দিল্লীতে এবং গোয়ালিয়রে ইঁহাদের কাপড়ের কল আছে। এতদ্ভিন্ন লণ্ডন ও নিউইয়র্ক সহরে ইঁহাদের ব্যবসায়ের শাখা আছে। যদি কেহ কলিকাতার টেলিফোন গাইড খুলিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন

যে, তাঁহাদের এক কলিকাতাতেই ব্যবসায়ের কতগুলি শাখা-প্রশাখা আছে। প্রভূত অর্থশালী হইয়াও ইহারা প্রত্যেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, এবং ইঁহাদের পুত্রগণও মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়া প্রত্যেকেই তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত।

আমাদের দেশেও যে কয়জন কৃতী ব্যবসায়ী আছেন, (যাঁহাদিগকে বড় বড় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া বা ইহুদী সম্প্রদায়ের বণিকদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে) তাঁহারাও কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন। আমি শুধু বাংলা দেশে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষে এই কথা অনেকবার বলিয়াছি যে, বাংলা দেশের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত, যদি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে একটি ডিগ্রীর ছাপ লইয়া বাহির হইয়া আসিতেন! কিন্তু অর্থাভাববশতঃ বেশী দিন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, এবং ১৫ টাকা বেতনে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝাটের সহিত যুদ্ধ করার পর তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হয়। কিন্তু ডিপ্লোমাধারী হইলে তখনই তিনি একটি চাকরী পাইতেন, এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি হইত!*

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—যিনি সম্প্রতি সমগ্র ভারতের ফেডারেটেড চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন—তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না। কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে আজ অর্থনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে বাংলা দেশের তিনি এক জন মুখপাত্রস্বরূপ। এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে।

---

* মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী স্যর এ, পি, পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা ছলে সম্প্রতি বলিয়াছেন, "পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা দ্বারা কখনও প্রকৃত যোগ্যতা ও মৌলিকতার পরিমাপ করা উচিত নহে। পরীক্ষা প্রথায় কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার অভ্যাস জন্মে, বিচারবুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তির উন্মেষ হয় না।"

বাংলার যুবকগণ আজ যে নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইতেছে, তাহার একটি প্রধান কারণ—বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও ডিগ্রীর মোহ। প্রকৃতপক্ষে এই মিথ্যার আবরণে দেশের যুবকগণ অকর্ম্মণ্য ও অলস হইয়া উঠিতেছে।

পাস করিয়াই বাঙ্গালী তরুণরা একটি চাকরীর আশায় বসিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চাকরী দুষ্প্রাপ্য। এই চাকরীর মোহাবর্ত্তে পতিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা-প্রণালী পূর্ব্ব হইতে এমনভাবে গঠিত হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামে সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িতেছে। অনেক ডিগ্রীধারী যুবকের দুঃখপূর্ণ পত্র প্রায়ই আমার হস্তগত হয়। নিম্নে একখানি উদ্ধৃত করিলাম :—

"শ্রদ্ধাভাজনেষু,—

"বাঙ্গালী যুবকের দুর্গতির কথা, ভুল-ভ্রান্তির কথা, সত্যকার দরদ দিয়া, আপনার মত আর কেহ ভাবে কি না, জানি না, তাই আজ কোন পরিচয়ের সূত্র না থাকা সত্ত্বেও আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে ভুল-ভ্রান্তি ঘটিতেছে তাহা আপনি সাধারণভাবে বক্তৃতায় ও লেখায় বলিতেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবক আমি, মেধায় মধ্যস্তরের (mediocre intellect) হইয়াও, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, কতকটা গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া, আইনের প্রতি তেমন আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও আইন পড়িয়াছি। আমি এক জন দর্শনশাস্ত্রের এম-এ, অধিকন্তু বি-এল।

* * * *

"মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বল্প পুঁজি হইতে এম-এ, বি-এল হইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছি; আজ আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। কাকা, ছোট ভাই-বোন—সকলে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের খাবার দিতে

হইবে, ভরণ-পোষণ করিতে হইবে। এ পারিবারিক কর্ত্তব্যের কিয়দংশও যদি পালন করিতে না পারি, তবে স্বর্গে অথবা নরকে কোথাও আমার সুখ অথবা শান্তি নাই। বিবাহ করি নাই, এই যা-রক্ষা। ওকালতী (Practice) করিব না, ঠিক করিয়াছি। আজ অনন্যোপায় হইয়া আমার রুচি অনুযায়ী কোন Teacher's Training College-এ বহু চেষ্টা করিয়া ভর্ত্তি হইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় আগামী মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে, বি-টি ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতে পারিব। তারপর এম-এ, বি-এল, বি-টি হইয়াও সবই অন্ধকার!"

শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণের ব্যর্থ জীবনের এ হাহাকার আর কত দিন শুনিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

ডিগ্রীর মোহ আমাদের কতদূর পাইয়া বসিয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। গত ১৪।২।৩৬ তারিখের সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিলাম এবৎসর প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারের অঙ্কে উঠিয়া গিয়াছে। দেশের এতগুলি তরুণ তরুণী "বহ্নিমুখং পতঙ্গমিব" ছুটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনো উদ্বেগ নাই, অধিকন্তু উচ্ছ্বসিত উল্লাসে আত্মহারা হইয়া সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন "উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান একটি দোষ এই যে, ইহা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিখায় না। এইজন্য 'শিক্ষিত" লোক পাড়াগাঁয়ে থাকিতে চায় না। ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ বা ৪০।৫০ টাকা বেতনে এঁদো গলিতে আলো বাতাস বর্জ্জিত স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বাস করিয়া ক্ষয়রোগ বাধাইবে তবুও সহরের মায়া ছাড়িবে না!

ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্ত্তব্য

কতকগুলি বিষয় লইয়া আমি কিছুদিন হইতে কাগজপত্রে লিখিতেছি, এবং সর্ব্বত্রই বলিয়া বেড়াইতেছি। বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই আমি বলিয়া থাকি যে, কেবল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এবং সেই পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া আর কিছু হইবে না। আর তাহা হইতে প্রকৃত লেখাপড়াও শেখা যায় না। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাহিরের বইও অনেক পড়া চাই। তাহা না হইলে লব্ধ শিক্ষা কিছুমাত্র ফলবতী হইবে না। যাহারা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়া আই-এ, বি-এ পাস করে, তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রায় কিছুই হয় না। প্রকৃত জ্ঞান কিসে লাভ হইতে পারে, সে চিন্তাও তাহাদের মনে আসে না। আজ একুশ বছর এই ভাবে বলিতেছি। বাঙ্গালীর ছেলেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—পাস করিয়া চাকুরী করিব, যেন ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

কিন্তু পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই এমন কি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইবারও সুবিধা বা অবসর ঘটে নাই। তাঁহাদের দু'একজনের নাম করিতে পারি। পৃথিবীর বিখ্যাত মনস্বিগণের অনেকেই নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্ এডিসন্ গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন। তিনি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ হীন ছিল যে, বিদ্যালাভ করিবার কোন সুযোগই তিনি পান নাই। ছেলেবেলায় তাঁহার মা তাঁহাকে পাঠশালে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার গুরুমশায় আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার মাথার মধ্যে গোময় ভিন্ন অন্য কিছু নাই এবং লেখা পড়া

শেখা সেরূপ হাঁদা ছেলের কর্ম্ম নয়। তাঁহাকে পাঠশালা ছাড়িতে হইল। ইহার পর এডিসন্ রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে ফেরিওয়ালার কাজ করিতেন। তাহার পর নিজের চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা কিরূপে তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বিজ্ঞান-জগতে 'যাদুকর' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন! এ তো গেল বড় বৈজ্ঞানিকের কথা।

তাহার পর দেখা যাক্ বর্ত্তমানে পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি কে। পূর্ব্বে ছিলেন রক্‌ফেলার। আর এখন যিনি শ্রেষ্ঠ ধনী তাঁহার নাম হেন্‌রি ফোর্ড। ফোর্ডও ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি একজন মধ্যবিত্ত কৃষকের সন্তান। বাল্যে হেন্‌রিকে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হইল তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে একটি গর্দ্দভ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্কুলের শিক্ষা ফোর্ডের কিছুই হয় নাই। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় হেনরিকে তাঁহার পিতা জমাজমির কাজ দেখিতে বলিলেন; কিন্তু হেনরির সে কাজ পছন্দ হইল না। তিনি তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমাকে কোন বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবিশী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" পিতা পুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে এক কারখানায় ঢুকাইয়া দিলেন। সেই হেনরি ফোর্ডের বিশাল কারখানা আজ জগদ্‌বিখ্যাত। পৃথিবীর অনেক দেশেই তাঁহার মোটরের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতি দিন চার হাজার মোটর এই সব কারখানা হইতে তৈয়ারী হইতেছে। তাঁহার ধন আজ অপরিমেয়। গড়ে তাঁহার বার্ষিক আয় ত্রিশ চল্লিশ কোটী টাকা—অর্থাৎ দৈনিক দশ লক্ষেরও অধিক। আমাদের এই সমগ্র জেলাটার ভিতর, তাই বা কেন, সমগ্র বাংলা দেশে বোধ হয়—আর বোধ হয় কেন, এমন দুই একজন মাত্র জমিদার আছেন যাঁহাদের বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে-বালককে

পাঠশালাতে পণ্ডিত মহাশয়রা গর্দ্দভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ও একজন বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক আছে।

আর একজন চার্লস্ সিব্রুক। ইনিও স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া লেখাপড়া শিখেন নাই। পাঁচ বছর বয়স হইতে চার্লি ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একজন জোয়ানের কাজ করিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তরি-তরকারির ক্ষেত্রে কাজ করিতে ভালবাসিতেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁহার ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন তরিতরকারি বছরে বিক্রয় হয় প্রায় পনর লাখ টাকার। কিন্তু বাস্তবিক তিনি কোন স্কুল কলেজে পড়িয়া শিক্ষালাভ করেন নাই। নিজে নিজের ক্ষেত্রে কাজ করিতেন আর অবসর সময়ে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক পড়িতেন। কিছুদিন চাষ-আবাদের পর চার্লি দেখিলেন যে, জমিতে নিয়মিত ফসল উৎপাদন করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সার দেওয়া দরকার, নিয়মিত সার না পড়িলে ক্রমে ক্রমে জমির উৎপাদন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাই তিনি এক এক একর অর্থাৎ তিন তিন বিঘা জমিতে প্রায় দুইশত টন (২৮ মণে এক টন) সার দেন। চার্লস্ কৃষিকার্য্য করিয়া এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক বছর বৃষ্টি না হইলে আমরা মারা যাই। হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকার এই দোষ। বেহারে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরও অনেক স্থানে ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা যদি পরিশ্রম না করি, কেবলমাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগে বসিয়া থাকি, তবে আমরা অন্নহীন হইব না তো হইবে কে? আবার কেবল লোকজনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কৃষি কাজ হয় না। লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও খাটিতে হইবে। সেই জন্য কথায় আছে, 'খাটে খাটায় পুরো পায়।' না

হইলে সুযোগ পাইলেই তাহারা কাজে ফাঁকি দিবে,—কথায় বলে, 'বামুন গেল ঘরে তো লাঙ্গল তুলে ধরে।'

আমাদের দেশে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতেই প্রচুর দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। পল্‌তায় আমাদের এনামেলের কারখানা আছে। সেখানে একটি লাউ গাছ হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ২০০ লাউ হইয়াছিল। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। ইহা ছাড়া বারাকপুরে দেখিয়াছি যে ছোট ছোট জমিতে তরিতরকারি করিয়া সেখানকার কোন কোন পশ্চিমা শ্রমজীবী বেশ গৃহস্থ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা এই সব জমিতে নানা প্রকার তরিতরকারী প্রস্তুত করে, এবং কলিকাতায় অথবা ঐখানেই পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। বছর বছর তাহারা জমিতে সার দেয়। জাপানে এই সার অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। জাপানের কৃষকেরা গৃহস্থের বাটী হইতে মলমূত্র অতি যত্নের সহিত লইয়া যায়। এছাড়া গোময়, ঘোড়ার মল তো আছেই। চীনেও এরূপ চলিতেছে।

এ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত। এবারে বর্ত্তমান চীন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব। এই চীন একটি মস্ত দেশ। এ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ কোটী। এ যাবৎ চীন আমাদেরই মত পরপদানত ছিল। কিন্তু এখন সে তাহার তিন হাজার বছরের জড়তা দূর করিয়া পৃথিবীর বুকে সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় পতাকা হাতে লইয়া তরুণ চীন দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এখন দেখা যাক, কি করিয়া এতখানি উন্নতি লাভ করিল। চীনে বিভিন্ন ধর্ম্মের বহু লোক বাস করে। চীনের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় এক কোটী। কিন্তু এই সকল বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে 'ছুৎমার্গ' বলিয়া কোন কুসংস্কার নাই। কিন্তু এ জিনিষটা আমাদের উন্নতির পথে একটা মস্ত বিঘ্ন আর আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরাই বেশী গোঁড়া। তাঁহারা যখন মুসলমানের

হাতে প্রস্তুত গোলাপ জল, কেওড়া লেমনেড, সোডা পান করেন, তখন তাঁহাদের জাতি বিচার থাকে না। কিন্তু যদি কোন নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়, তাহা হইলে বিশ হাত দূরের খাদ্য তাহাদের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া যায়। জানি না হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। হাঁ, চীনের কথা বলিতেছিলাম। এ যাবৎ গৃহবিবাদই চীনের সমস্ত অবনতির মূল কারণ ছিল। কিন্তু চীন এক্ষণে নব বলে বলীয়ান হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চীনের এই একতা এবং উন্নতির প্রধান কারণ চীনের যুবক ও ছাত্রসঙ্ঘের অক্লান্ত চেষ্টা। দেশের সাধারণ লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য চীনের 'যুবকসঙ্ঘ' উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চীনে যখন সময় সময় স্কুল কলেজ বন্ধ হয়, তখন কলেজের ও স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা দলে দলে নিজের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসে। এই সব পাঠশালায় হাজার হাজার চীনা বালক-বালিকা লেখাপড়া শিখে। এছাড়া তাহারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করে। এবং বয়স্ক লোকেরাও কলেজের ছেলের নিকট লিখিতে পড়িতে শিখে। চীন-জাপান যুদ্ধে চীন যখন তাহার দুর্ব্বল অবস্থা বুঝিতে পারিল, তখন প্রথমে প্রায় ১০।১৫ হাজার ছাত্র চীন হইতে বাহির হইয়া বিদেশে শিক্ষা-লাভ করিয়া আসিল। তাহার পর হইতে এই ভাবে চীনে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে। যে-সব ছাত্র দেশের ভিতরে গিয়া লোককে লেখাপড়া শিখায়, তাহারা শহর হইতে যাইবার সময় সঙ্গে কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্যাদি লইয়া যায়। সেই সব সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের জীবিকার সংস্থান করে। এদেশে যাহারা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র তাহারা নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সহজে লেখাপড়া শিখাইতে পারে। মাঝে আমি ঢাকায় গিয়াছিলাম। ঢাকা সহরে প্রায় ১১টি হাইস্কুল আছে। তাহা ছাড়া কলেজের ছাত্র দুই হাজারের বেশী হইবে। এই সব স্কুলের প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় চারশত ছাত্র আছে। সর্ব্বসমেত

প্রায় সাড়ে চার হাজার ছেলে পড়ে। তাহাদের ভিতর নীচের চার ক্লাস বাদ দিয়া ধরি বাইশ শ'। এই বাইশ শ' ছেলে গ্রীষ্মের বন্ধে দিনে একটু কম ঘুমাইয়া এবং পূজার ছুটিতে কম আমোদ করিয়া, দলে দলে ভাগ হইয়া দেশের ভিতর যদি এমনি ভাবে ছোট ছোট বালক বালিকাদের লেখাপড়া শিখায়, তাহা হইলে কি সুফল হয়! আর এমনি করিলে সাম্প্রদায়িক বিবাদও অনেক কমিয়া আসে, এমন কি পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কি আর বলিব—এ বিষয়ে আমাদের মুসলমান ভাইরাও বিশেষ পশ্চাৎপদ। তাহারাও যদি প্রত্যহ নয় ঘণ্টা করিয়া ঘুমায়, তাহা হইলেও কাজ করিবার ও পড়িবার যথেষ্ট সময় থাকে। ছেলেদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কিছু না কিছু জমিজমা আছে। ছেলেরা যদি সেখানে দুটা তরকারীর বীজও পোঁতে, কোদাল হাতে কাজ করে, তাহা হইলেও তাহাদের সংসারের কত আসান হয়। কেহ কেহ অবশ্য আজকাল কিছু কিছু করিতেছে; কিন্তু তেমন আশাপ্রদ কাজকর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, কেবল স্কলারশিপ্ আর মেডেল পাইলেই চলিবে না। ছাত্রদের উদ্দেশ্য হইবে মানুষ হওয়া,—স্কলারশিপ এবং মেডেল পাওয়া নয়।

বৰ্ত্তমান ছাত্ৰসমাজ ও বিলাসিতার প্রাবল্য

পরলোকগত ডাক্তার চুণীলাল বসুর নিকট শুনিয়াছি, তিনি যখন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি প্রত্যহ তাঁহার বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়ী হইতে মেডিকেল কলেজ পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন। অধিকন্তু সকালে কলেজ করিয়া স্নানাহারের জন্য মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরিতেন। অপরাহ্নে পুনরায় হাঁটিয়া কলেজ করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না; সুতরাং দুইবারই চুণীলালকে অতখানি পথ হাঁটিয়া পাড়ি মারিতে হইত। একদিন দুইদিন নহে, পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল এইরূপ কষ্ট করিয়া তবে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবনের এই তপস্যা তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনকে কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন।

আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছাত্রজীবনে একাধিক্রমে ছয় বৎসরকাল (১৯১০—১৬) ব্যাঁট্রা হইতে হাঁটিয়া সেণ্ট্ জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিতেন। সে আজ ২০ হইতে ২৫ বৎসরের কথা। তখন বাসের প্রচলন হয় নাই, হাওড়ার পারে ট্রামও ছিল না। যুবক জগদীন্দ্র প্রত্যহ তেলকল ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া হাঁটিয়া সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে যাইতেন ও তথা হইতে পাঠান্তে গৃহে ফিরিতেন। বলা বাহুল্য ব্যাঁট্রা হইতে তেলকলঘাট দুই মাইলের অধিক হইবে; এবং চাঁদপালঘাট হইতে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজও দুই মাইল হইবে।

এখন ট্রাম ও বাস অহরহঃ যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে ছাত্রেরা ও যুবকগণ একেবারে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি একটি ছাত্রকে প্রত্যহ এক মাইল হাঁটিয়া কলেজ করিবার কথা বলা যায়

তিনি হয়ত মূর্চ্ছা যাইবেন। ইহাতে যে কি কুফল ফলিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইদানীং আমি বিশেষজ্ঞদিগের লিখিত অনেক স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পড়িতেছি। তাহাতে লণ্ডন প্রভৃতি নগরে যানবাহনের আতিশয্য নগরবাসিগণের স্বাস্থ্যের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার উল্লেখ আছে। সারাদিন চৌকিতে বসিয়া মাথা ঘামাইয়া ও কলমবাজী করিয়া (Sedentary habits) পূর্ব্বে কেরাণীকুল অফিসের পর হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিত ও তজ্জনিত শ্রমে তাহাদের দেহ-মনের গ্লানি ও জড়তা দূর হইত। কিন্তু এখন ঐ সকল স্থানে ২।৩ মিনিট অন্তর হয় বাস, না হয় ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথে রেল গাড়ী (Tube Railway) যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে এদেশে যখন ট্রাম ও বাস ছিল না, তখনও দেখিয়াছি কলিকাতার কেরাণীবাবুরা শ্যামবাজার, বাগবাজার অঞ্চল হইতে লালদীঘির সরকারী দপ্তরখানা (Writers' Building) ও ঐ অঞ্চলের বহু সওদাগরী অফিস পর্য্যন্ত পদব্রজে গমনাগমন করিতেন। এখন বাড়ী হইতে পা বাড়াইতে না বাড়াইতে হয় ট্রাম, নয় বাসে আরোহণ—ফিরিবার পথেও পুনরায় ঐরূপ! ইহাতে কেরাণীবাবুদের প্রতিদিন দু'আনা, দশ পয়সা গড়পড়তা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহাদের গড়পড়তা মাসিক আয়ের কথা ভাবিলে হতাশ্বাস হইতে হয়। খুব বেশী করিয়া ধরিলেও তাঁহাদের মাসিক বেতন গড়ে ৬০্-এর বেশী নয়। তাঁহাদের ঘরে ছেলে-মেয়েরা দুধ দূরের কথা, সকালে-বিকালে এক পয়সা, দু'পয়সা করিয়া জলখাবার—এমন কি সামান্য দুইটি মুড়ি পর্য্যন্ত খাইতে পায় কিনা সন্দেহ! ঐ দুই আনা দশ পয়সা বাঁচাইতে পারিলে শুধু যে পুত্রকন্যাদের কিছু খাদ্য দেওয়া যায় তাহাই নহে, অধিকন্তু হাঁটিয়া যাতায়াত করিলে শরীর ও মন সতেজ ও কার্য্যক্ষম থাকে।

কথায় বলে, 'ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া'—আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। এই যে ব্যাধি, এক পা হাঁটিব না—ইহা শারীরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের একটি মূল কারণ হইয়াছে।

উক্ত অবতরণিকার পর আধুনিক ছাত্রজীবন কত ব্যয়সাধ্য হইয়া যাইতেছে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

অতি হীন অবস্থা হইতে চারিত্র ও স্বাবলম্বন গুণে উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছেন, এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত আমেরিকা, ইউরোপ এবং আমাদের দেশেও বিরল নহে; কিন্তু ইঁহারা হইলেন নিয়মের ব্যতিক্রম। আমাদের দেশের সাধারণ যুবকগণ বাল্যকাল হইতেই শিশুর মত অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী। ইঁহাদের অভিভাবকগণের ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

আজকাল একজন কলেজে-পড়া ছাত্রের মাসিক খরচা গড়ে ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা। যেহেতু তাঁহারা শিক্ষার্থী সেই হেতু তাঁহাদের যাবতীয় আবদার ও দাবী পূরাইতে অভিভাবকগণ বাধ্য। ছেলের মাসোহারা জোগাইতে পিতামাতাকে ভূসম্পত্তি, এমন কি পৈতৃক ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হয়; আপনাদিগকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য বঞ্চিত করিয়া ইঁহারা দিনের পর দিন সংসারের একঘেয়ে হয়রাণি পোহাইয়া চলেন—ছেলে মানুষ হইবে এই ভরসায়! ভবিষ্যতের আশা-ভরসাস্থল এই সকল বাবাজীরা যখন ছুটিতে (কলেজগুলি বৎসরে প্রায় পাঁচ মাস, সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ থাকে) গৃহে পদার্পণ করেন, তখন গৃহস্থালীর তুচ্ছ কাজকর্ম্মে তাঁহাদের খুঁজিয়া পাইবার যো নাই—তাঁহাদের অমূল্য সময় আড্ডা, পরচর্চ্চা, তাস, পাশা কিংবা সখের থিয়েটারে অতিবাহিত হয়; তদুপরি কিছুক্ষণ করিয়া দিবানিদ্রা! পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার্থী যখন গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহাকে গো-সেবা, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত। সংক্ষেপে অধ্যয়নের সঙ্গে তাঁহাকে নিজের জীবিকাও অর্জ্জন করিতে হইত। হোষ্টেল বা ছাত্রাবাসগুলি—বিশেষতঃ যেগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,—ছাত্রগণকে বিদেশী-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার পক্ষে এক

একটি চমৎকার আওতা। কুক্ষণে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতার বেসরকারী কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের হাতে পনেরো লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন! তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে ঐ টাকায় নির্মিত হইল কতকগুলি প্রাসাদোপম ছাত্রাবাস। আধুনিক রুচির মাপে এই সকল হোষ্টেলে আরাম-বিরামের এত পরিপাটি ব্যবস্থা যে, ৪৫৲ টাকার কমে এখানে কোনও ছাত্রের চলে না। অনেকের ইহাতেও কুলায় না। আমার কয়েকটি পাঞ্জাবী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষেও দেখিয়াছি যে, লাহোরে ছাত্রদের মাসে গড়ে ১০০৲ টাকারও বেশী করিয়া খরচ পড়ে। তাহারা অভিভাবকদের "ছাল তুলিয়া" ছাড়ে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা সর্ব্বদা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের স্বপ্ন দেখেন এবং এ দেশেও উহার পত্তন করিতে চাহেন। টেনিস খেলার জন্য ছেলেদের ব্লেজার কোট ও পাজামা চাই। ক্রিকেট খেলার জন্য ফ্লানেলের পোষাক চাই—আরও কত কি। ইহার উপর প্রসাধনের পালা—তাহাতেও একরাশ টাকা চাই। এরূপ অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া ছাত্রেরা বিদেশী পণ্যের এক একজন সেরা প্রচারক হইয়া দাঁড়ায়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্যারীতে ছিলাম, অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম যে পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আগত প্রবাসী ছাত্রেরা এত স্বল্প ব্যয়ে দিনপাত করে যে তাহা শুনিলে সহজে প্রত্যয় জন্মে না। য়ুরোপের প্রাচীনতম প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়—বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চায় শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বলিয়া যাহার খ্যাতির অন্ত নাই—সেখানেও ছাত্রদিগকে অতি অল্প ব্যয়ে চালাইতে হয়। হেয় কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামীর আড্ডা বলিয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রতি মনীষী বার্ণার্ড শ' যে তীব্র কটাক্ষ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বয়ং র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ এই মত পোষণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন অনেক ক্ষেত্রে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করে।

তারপর এই সকল গ্রাজুয়েটদিগের অর্থকরী শক্তির দৌড় কতদূর দেখা যাক্। অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বোম্বাই-এর অধ্যাপক কে, টি, শা মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছি যে, বোম্বাই অঞ্চলের একজন গ্রাজুয়েটের মাসিক আয় গড়ে ২৫৲ টাকার বেশী নহে! সে আজ ৪।৫ বৎসরের কথা; বর্ত্তমানে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজী গ্রাজুয়েটদের লক্ষ্মীভাগ্যও বোম্বাই-এর অনুরূপ! তাই মনে হয় যে, পঞ্চনদের আজব দেশে বুঝিবা উপকথার মত দুধ ও মধুর স্রোত বহিয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ আজগুবি কাণ্ড ঘটিবে কেন?

১৯২৯ সালের লাহোর প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, এখানে তাহারই পুনরুক্তি করিতে চাই,—"ধিক্ সে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে, যাহা আপনাদের ঘরের বোনা মোটা কাপড় ফেলিয়া বিলাতী কলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বসনে প্রলুব্ধ করে ও বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া হুকা ও ফর্সিকে অবজ্ঞা করিতে শেখায়। ধূমপানই যদি করিতে হয়, তবে বিলাতী সিগারেট ত্যাগ করিয়া স্বদেশী বিড়ি পান করুন। উহা খাঁটি স্বদেশী, উহার তামাক দেশী, পাতা দেশী, দেশী লোকের হাতেই উহা নির্ম্মিত। অপর পক্ষে বিলাতী সিগারেটের তামাক আসে বিদেশ হইতে, বিদেশী কাগজে ও বিদেশী কলে উহা পাকানো হয়; শুধু উহা পান করিয়াই আপনারা বৎসরে দুই কোটি করিয়া টাকা বিদেশীয়দের গ্রাসে তুলিয়া দিতেছেন। গণ্ডিয়ার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি বিড়ির কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, মধ্য প্রদেশের সেই শুষ্ক অনুর্ব্বর অঞ্চলে প্রায় ৫০০০০ নর-নারী ও বালক-বালিকা বিড়ি বাঁধিয়া গড়ে দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত রোজগার করে। এইরূপে এই কুটীর শিল্পটির কল্যাণে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোকের মুখে ক্ষুধার গ্রাস উঠিতেছে। এই সকল বিড়ির ক্রেতা কাহারা জানেন? পদস্থ কর্ম্মচারী, পশারওয়ালা আইন

ব্যবসায়ী কিংবা সভ্যতাভিমানী কলেজের ছাত্র নহে—কুলী, মজুর ও গাড়োয়ান শ্রেণীর মধ্যেই এই বিড়ির কাটতি। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যেন সমাজের গলগ্রহ বিশেষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহারা মাটিতে সোনার ফসল ফলাইয়া তুলে, সেই চাষীদের বঞ্চিত করিয়া ইঁহাদের উদর স্ফীত হয় এবং দেশের প্রভূত ধনসম্পদ ইঁহাদেরই বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া বিদেশে যায়।"

অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এইরূপ বিলাসব্যসনে ব্যয় করার মধ্যে যে কতদূর স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা রহিয়াছে, তাহা কয়জন ছাত্র বিচার করিয়া থাকে জানি না। যে সকল ছাত্র এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে অভিভাবকদের শোষণ করে, তাহাদের দৃষ্টি দানবীর কার্ণেগীর আত্মজীবনের নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি :—

"কি কষ্টেই না আমাদের দিন কাটিত! শীতকালে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া কোনরূপে প্রাতরাশ সারিয়া বাবা ও আমি কারখানায় যাত্রা করিতাম। কারণ দিবালোকের পূর্ব্বেই সেখানে পৌছানো চাই। মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণের জন্য মাত্র জলযোগের ছুটি এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তবে নিষ্কৃতি। সময় আর কিছুতে কাটিতে চাহিত না, কাজেও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম না; কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও আমার একটি সান্ত্বনা ছিল। আপনার জন ও পরিবারের জন্য আমার সাধ্যমত কিছু করিতে পারিতেছি—এই চিন্তাই আমাকে আনন্দ ও উৎসাহ দিত। পরবর্ত্তী জীবনে আমি রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই প্রথম সপ্তাহের পারিশ্রমিক হস্তগত হইলে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, পরে ক্রোরপতি হইয়াও তাহা করি নাই। সেই দিন প্রথম অনুভব করিলাম যে, আমি আর পিতামাতার গলগ্রহ নহি—আমি তাঁহাদের সহায়, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহে তুল্য দায়ী।" (কার্ণেগীর আত্মজীবনী পৃঃ ৩৪)

আমারই প্রায় সমসাময়িক কালের সাহিত্যিক এচ, জি, ওয়েল্‌স্ সাউথ কেনসিংটনের একটি বিজ্ঞানবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে লণ্ডনে সপ্তাহে মাত্র এক গিনি হিসাবে একটি ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। তাহাতেই তাঁহার দিন কষ্টে চলিত। তাঁহার আত্মচরিতের একস্থানে বলিতেছেন, "আমারই সম্মুখে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শীর্ণ দুইটি লোককে লেবরেটরীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। সাউথ কেনসিংটন বিদ্যালয়ের সেই কৃচ্ছ্রতার ফলে আমি সারা জীবন ভগ্ন স্বাস্থ্যের বোঝা বহিয়াছি। মাত্র এক গিনিতে আমার সপ্তাহের খরচ চালাইতে হইত। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আমার শরীর শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার দেহ একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল।"

এডিনবরাতে ১৮৮২—১৮৮৮ সালে অবস্থানকালে বার্ষিক মাত্র ১০০ পাউণ্ডে আমি বেশ আরামেই বাস করিতাম। ঐ ১০০ পাউণ্ড ভিন্ন স্বজনদের নিকট হইতে ক্বচিৎ আর কিছু টাকা পাইতাম।

এইবার সিনেমা ব্যাধির কথা কিছু বলিব। ইহা মদের নেশার মত ছাত্রদের পাইয়া বসিয়াছে। বালকরা পর্য্যন্ত জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া সিনেমার টিকিট কিনিয়া থাকে। বহু কলেজের ছাত্র—উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যাহাদের দেহে পুষ্টির অভাব লক্ষিত হয় তাহাদেরও সপ্তাহে দুই একবার করিয়া সিনেমায় না গেলে চলে না। জনৈক নবীন চিকিৎসক (শ্রীযুক্ত সুধীর বসু) এবিষয়ে সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"কলিকাতার অলিতে গলিতে এবং মফঃস্বল সহরগুলিতেও ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ছবিঘর গজাইতেছে। ইহাতে যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই হইতেছে তাহা নহে—অনেক ক্ষেত্রে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। শিক্ষা, চিত্তবিনোদন বা চারুশিল্পের দিক দিয়া ইহার যে সার্থকতা আছে তাহা এখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার

সবাকচিত্রগুলির কামোদ্দীপক দৃশ্য ও কথাবার্ত্তা তরলমতি ছাত্র ও ছাত্রী-দের পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। * * * * বিজ্ঞাপনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় যে সকল প্রাচীরপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহাও কম মারাত্মক নহে, নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন নর ও নারী মূর্ত্তি এবং তাহাদের কদর্য্য ও আপত্তিজনক হাবভাব—ইহাই হইল এই সকল প্রাচীরপত্রের বিশেষত্ব। যে সকল তরুণ-তরুণীর যৌনবোধ সবেমাত্র জাগ্রত হইতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিষতুল্য। এই সকল ছবি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। যাহারা কখনও সিনেমায় যাইবার কথা মনেও স্থান দেয় না তাহারাও ঐ সকল নির্লজ্জ ছবি দেখিয়া প্রলুব্ধ হয়। * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শিক্ষায়তনগুলির, যাঁহাদের হস্তে কোমলমতি ছাত্রদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।”

ফল কথা সিনেমাগুলি একপক্ষে যেমন ছাত্রদের নীতির ও স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে, অপর পক্ষে তাহাদের সামান্য পুঁজিতেও ভাগ বসাইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অল্পপরিসর বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের দূষিত বায়ু সেবন, একদৃষ্টে ছবির পর্দ্দায় চাহিয়া থাকা, সর্ব্বোপরি কামোদ্দীপক ভাবের উদ্রেক—ইহাই হইল সিনেমার সর্ব্বনাশা কুফল।

প্রাগে ছাত্রজীবন

ধন-কুবেরের দেশ আমেরিকাতেও বহু ছাত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইউরোপ মহাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রগণ এত অল্প ব্যয়ে চালাইয়া থাকে যে, শুনিলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্ববিশ্রুত ও সুপ্রাচীন প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে শ্রীমতী ডোরা রাউণ্ডের চিত্তাকর্ষক বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। উহা হইতে তথাকার ছাত্রজীবন ও ছাত্র-সমাজের আবহাওয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে।

"য়ুরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র প্রাগের বিদ্যাপীঠটিই আধুনিক ছাত্র-সমাজের সম্মুখে এমন একটি আদর্শ ধরিয়াছে, যাহার মধ্যে অতীত ও বর্ত্তমানে, প্রাচীন ও নবীনে একটা পারম্পর্য্যের ধারা বজায় আছে। ইহা হইল আন্তর্জ্জাতিকতার ধারা। এই আন্তর্জ্জাতিক বোধের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি গঠিত হইয়াছিল এবং বহু প্রলয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করিয়া আজিও সেই উদার আদর্শকে আঁকড়াইয়া আছে; য়ুরোপের অপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ন্যায় তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে নাই। যুগধর্ম্মের অনুকূল এই বিশ্ববোধই প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গে একটি অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য ও আধুনিকতার ছাপ দিয়াছে।

"সম্রাট চতুর্থ চার্লস্‌ কর্ত্তৃক ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশে বিদ্যালয়ের অভাবমোচন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, পরন্তু তিনি এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যেখানে দেশবিদেশ হইতে দলে দলে বিদ্যার্থিগণ আকৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া প্রাগে বক্তৃতা করিতে আসিতেন

এবং তাঁহাদের যশঃ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড এমন কি সুদূর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড হইতেও বহু ছাত্র আসিত। আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরে এবং প্যারী সহরের পূর্ব্বে ইহাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। দেখিতে দেখিতে ইহার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে জ্ঞানলিপ্সু পণ্ডিত ও ছাত্রগণ প্রাগ্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সম্রাট চার্লসের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া নিরঙ্কুশভাবে জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন হইলেন।

বর্ত্তমানে পূর্ব্বকথিত আন্তর্জ্জাতিক বোধ কয়েকটি কারণে সমধিক সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির লোকে পুরুষানুক্রমে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসবাস করিয়া এমন একটি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া সহজ নহে। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানে বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে কোনও বিধি-নিষেধের বালাই নাই। শ্লাভ সভ্যতা ও রীতিনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পক্ষে এমন একটি দ্বিতীয় কেন্দ্র সারা মধ্য-য়ুরোপে নাই। অধিকন্তু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অনেকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন দেশেও চেকোশ্লোভাকিয়ার ছাত্রদিগের জন্য ঐরূপ ছাত্রবৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ইংল্যাণ্ডে এরূপ কোনও পালটা ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে।

চেষ্টা করিয়া বিদেশ হইতে আনীত এই সকল ছাত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাগের ছাত্রসমাজে জাতি ও বর্ণগত বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। এখানকার মোট ছাত্রসংখ্যা ২০,০০০, তন্মধ্যে ১৬,০০০ চেকোশ্লোভাক, কিন্তু চেক্ বা শ্লোভাক কোনও একটি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা পূর্ণ ১২,০০০ হইবে না। অবশিষ্ট চার হাজার গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহাদের দেহে জার্ম্মাণ, হাঙ্গেরীয়ান, রুমেনিয়ান কিংবা পোল রক্ত প্রবাহিত। বাকী চার হাজার যাহারা গণতন্ত্রের প্রজা নহে তাহাদের

অবস্থা আরও জটিল। জাতি হিসাবে ইহাদের কতক পোল, কতক ইউ-ক্রেনিয়ান—কিন্তু পৌর অধিকারসূত্রে ইহারা ভিন্ন দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট। এতদ্ব্যতীত প্রাগে প্রায় ১,২০০ ইহুদী ছাত্র আছে।

এই সকল বিদেশী ছাত্র স্বভাবতঃ জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পৃথক পৃথক দলে থাকিতে উৎসুক। কিন্তু এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস কেবল যে বিদেশী ছাত্রদের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ছাত্রগণের মধ্যেও এই অভ্যাস পরিব্যাপ্ত। অধ্যাপনার বিষয় বিভাগ ও বিদ্যাভবনগুলির অবস্থান ইহার অন্যতম কারণ। বিদ্যায়তনের গৃহগুলি নগরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত। পৃথক পৃথক গৃহে পৃথক পৃথক বিষয়ের অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। এক বিষয়ের (Faculty) শিক্ষার্থীদের সহিত অপর বিষয়ের শিক্ষার্থীদের মেলামেশা করিবার প্রয়োজন ও সুযোগের অভাব। খেলা-ধূলা কিংবা কোনওরূপ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা নাই। ফলে এক একটি বিষয়কে (Faculty) কেন্দ্র করিয়া যেন এক একটি পৃথক জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে!

কতকগুলি কারণও এই বিচ্ছিন্নভাবের জন্য কতকাংশে দায়ী। এই সকল ছাত্রের অনেককে ভরণপোষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং দাতাগণের ধর্ম্ম, রাজনীতি বা জাতিগত বৈষম্য ছাত্রগণকেও স্পর্শ করে। জার্ম্মাণ ছাত্রাবাসে কেবলমাত্র জার্ম্মাণ ছাত্রগণই বাস করে; ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা, ভূস্বামী ও চাষীদের মধ্যে চিরন্তন কলহের ফলে যে বিশেষ রাজনৈতিক দল (Agrarian Party) গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের জন্য অপর একটি হোষ্টেল। অনেক সময় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন জার্ম্মাণ

ক্যাথলিক ছাত্রদের হোষ্টেল। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের (Faculty) ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রাবাসে কিয়ৎপরিমাণে মেলামেশা করিবার সুযোগ পায় সত্য, কিন্তু তাহা আশানুরূপ নহে। একত্র আহার ও বাস ভিন্ন এই সমস্ত ছাত্রাবাসে অপর কোনরূপ মিলনের আয়োজন বা ব্যবস্থা নাই। সুতরাং একত্র অধ্যয়ন-ব্যপদেশে পৃথক পৃথক বিদ্যাভবনে এক একটি দলের সৃষ্টি হয়, যাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তরের শিক্ষার্থী-দের সহিত আলাপ আলোচনার সুযোগ ছাত্রদের বড় ঘটে না। অধিকন্তু প্রাগ্ একটি বৃহৎ নগর। এক এক বিষয়ের (Faculty) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য পৃথক গৃহ বা গৃহ-সমষ্টি সারা সহর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দরিদ্র ছাত্রগণ নিজ নিজ বিদ্যাভবনের নিকট বাসস্থান খুঁজিয়া লয়, তাহাদের হাতে এমন অর্থ থাকে না যে, ট্রামভাড়া ব্যয় করিয়া দূরের ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিতে যাইবে।

মাত্র একটি ছাত্রাবাসে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ছাত্রীদের জন্য বুডেক (Budec) নামে একটি হোষ্টেল আছে। এটি যথার্থই আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন। এখানে স্বদেশী কিংবা বিদেশী বলিয়া কোনওরূপ পার্থক্য নাই। ছাত্রী নহে এরূপ লোকও এখানে থাকিতে পারে। তবে অধিকাংশই ছাত্রী। এই হোষ্টেলটি খুব সস্তা বলিয়া এখানে অত্যন্ত ভিড়, কারণ ছাত্রীদের অনেককেই অতি অল্প খরচে চালাইতে হয়। এই দারিদ্র্যই এখানকার ছাত্রীসমাজকে একটি প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। বুডেক হোষ্টেলের সর্ব্বোচ্চ তলায় প্রায় বিশটি ছাত্রী থাকে। স্ব স্ব দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে বৃত্তি আসে তাহাতে উহাদের ঘরভাড়া লাগে না। ইহাদের মধ্যে এমন একটি মধুর প্রীতির সম্বন্ধ আছে যে, এত অভাবের মধ্যেও ইহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় না। ইহারা প্রয়োজন মত পরস্পরের পোষাক-পরিচ্ছদ, পুস্তক বা চায়ের পেয়ালা অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, পরীক্ষার পূর্ব্বে একটি

মাত্র বাজা-ঘড়িতে সকলের ঘুমভাঙ্গানোর কাজ চলে। ইহাদের মধ্যে কাহারও বাড়ী হইতে কখনও যদি উপহার বা খাদ্যদ্রব্যের পার্শ্বেল আসিল অমনি ছোট-খাটো ভোজের পালা পড়িয়া গেল। জল খাবার বা চায়ের আসর কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ছাত্রীর ঘরেই জমে, খরচের অংশ যে যেমন পারে কিছু কিছু বহন করে। কিন্তু আয়োজন যতই দীন হউক না কেন ইহাদের উৎসবের আনন্দ তাহাতে বিন্দুমাত্রও ম্লান হয় না।

"কিন্তু জাতিবর্ণ বা পাঠ্যবিষয় নিরপেক্ষ হইয়া মিলিবার মত কয়েকটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠানও প্রাগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় যে মিলনের সুযোগ সম্ভাবনা নাই এই সকল স্থানে তাহা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে Studentsky Domov ও Akademicky Dum-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তটিতে বিদেশীয়গণের প্রবেশ নিষেধ না হইলেও উহার পরিচালনা সম্পূর্ণ চেকদের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন। প্রায় সাতাশটি জাতির ছাত্র ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত এবং ইহার পরিচালক সমিতিতে পাঁচটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি আছে। ইহার কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে চেক, আমেরিকান, রাশিয়ান, সুইস্, জার্ম্মাণ ইউক্রেনিয়ান, যুগোশ্লাভীয় সকলই আছে। সান্ধ্য বৈঠকে চেক ও হাঙ্গেরীয়ানদের মধ্যে সদালাপ জমিয়া ওঠে, কখনও বা ইংরেজী ভাষায় কথোপকথনের মজলিস বসে। এখানকার পাকশালার উপাদেয় অথচ অতি সুলভ ভোজ্য প্রত্যহ দুই সহস্র ছাত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, অধিকন্তু এখানে যেরূপ চা প্রস্তুত হয় সেরূপ প্রাগের অন্য কোনও ভোজনালয়ে মিলে না। ভোজনালয়ের ন্যায় ধোপীখানা, গোসলখানা এবং সুবৃহৎ পাঠাগার—সকলই দরিদ্র ছাত্রী-দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাগের মোট ছাত্র সংখ্যার ৪০ জনের মাসিক আয় পাঁচশত ক্রাউনেরও (১) কম।

(১) কিন্তু ইহার কমে কোনও ছাত্রের চলে না।

শতকরা ৩৮ জন দরিদ্র বলিয়া ছাত্র-দেয় বেতন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন যে সকল ঘরে বাস করে তাহার ভাড়া মাসে ১৫০ ক্রাউনেরও কম। এই সকল সস্তা ভাড়ার ঘরে না আছে যথেষ্ট আলো ও উত্তাপের ব্যবস্থা, না আছে স্নানের ব্যবস্থা। সাধারণ ছাত্রদিগকে মাসিক মাত্র ৩৫০ ক্রাউনের মধ্যে চালাইতে হয়। সুতরাং ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য সরকারকে একটা মোটা টাকা ব্যয় করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বেতন হইতে নিষ্কৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য শিক্ষাবিভাগ যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার অর্দ্ধেকের কম (বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ ক্রাউন) ব্যয় করেন স্থানীয় ছাত্রদের বৃত্তি দিবার জন্য। ইহার সহিত বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য করিতে যে ব্যয় হয় তাহা যোগ করিলে দেখা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক খরচের যে বরাদ্দ আছে তাহার শতকরা একভাগ ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হয়।" (২)

আর একজন লেখক প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"কায়িক পরিশ্রম ঘৃণার্হ নহে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রাগের একটি ছাত্রাবাস পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। শুনিলাম ছাত্রাবাসের ভবনটি ছাত্রদিগের কায়িক পরিশ্রমেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাত্রেরা স্বয়ং কায়িক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য এত জনসমাগম হইতে লাগিল যে, দর্শকের নিকট হইতে কিছু কিছু দর্শনী আদায় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইল। ছাত্রগণকে খুব মিতব্যয়ী বলিয়া মনে হইল। তাহাদের অনেকেরই গায়ে কোনও জামা দেখিলাম না। তাহাদের ঘরগুলি দেখিতে অতি সাদাসিধা।"

য়ুরোপের একটি প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়,—যেখানে অতি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়—সেখানেও মিতব্যয়ী ছাত্রছাত্রিগণের

(২) ১৯২৩ সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

মাসিক খরচ মাত্র ৩৫০ ক্রাউন অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ৩০৲ হইতে ৩২৲ টাকা। পক্ষান্তরে এদেশে ছাত্রদের মাসিক ব্যয় গড়ে ৪০৲ হইতে ৪৫৲ টাকা। লাহোরের ছাত্রদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এরূপ ব্যয়বাহুল্য যেমন অস্বাভাবিক তেমনই লজ্জাকর। এ ব্যবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে মঙ্গল নাই।*

ছাত্রগণ সহরের ব্যয়বহুল আরামের জীবনে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বরং ধূলি-ধূম সমাকীর্ণ সহরে থাকিয়া অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিবে তথাপি কোনও স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে যাইবে না। বাগেরহাট কলেজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উক্ত কলেজ ৫০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, কলেজের এক পার্শ্ব দিয়া নদী প্রবাহিতা, নৈসর্গিক শোভার প্রাচুর্য্য আছে। বহু অর্থব্যয়ে বিভিন্ন বিভাগের জন্য পাকা ইমারত, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র পাকা ছাত্রাবাস হইয়াছে—কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এসকল সত্ত্বেও সেখানে ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কলিকাতায় সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের অশেষ আয়োজন—অভিভাবকের প্রেরিত অর্থে ঐ সকল নিরঙ্কুশভাবে উপভোগ করা চলে; বাগেরহাটে সে সুযোগ নাই। বলা বাহুল্য বাগেরহাটে ছাত্রদের অধ্যাপকগণের সহিত মেলামেশা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে, যাহা কলিকাতায় অসম্ভব।

* আমার আত্মচরিতের (Life and Experiences etc.) দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ১৭শ অধ্যায় (Expensive habits of our students) অবলম্বনে লিখিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা বনাম পুরুষকার

আমাদের দেশে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হইলে কেহ লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়াছে বলিয়া খাতির পায় না। এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাহি যে, রাজনীতি বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ে যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কয়েকজন লোক আজকাল সর্ব্বদা লোকচক্ষের সম্মুখে বিরাজ করেন তাঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্‌, ইতালীতে মুসোলিনী, জার্ম্মাণীতে হিট্‌লার এবং রুশিয়াতে ষ্টালিন অন্যতম। যথাক্রমে তাঁহাদের স্থূল বিবরণ দিতেছি।

(১)

র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্‌ অতি হীন অবস্থাপন্ন এক দীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বদেশ স্কট্‌ল্যাণ্ডে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষার চলন আছে। এই নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যায়তনেই ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের শিক্ষাজীবনের সূচনা; প্রথম হইতেই শিক্ষকগণ ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও পারদর্শিতার পরিচয় পান, কিন্তু দারিদ্র্যদোষ তাঁহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইল। তিনি যখন মাত্র ১২।১৩ বৎসরের বালক সেই সময়ে একদিন তিনি এক আলুর ক্ষেতে অপর মজুরদের সহিত আলু খোঁড়ার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অপরের তুলনায় ঝুড়িতে আলু বোঝাই করিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে, এই অপরাধে ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন, উহার তিক্ত স্মৃতি তিনি পরজীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ভাগ্য পরীক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আলুর ক্ষেত হইতে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডকে লণ্ডনের কর্ম্মব্যস্ত কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া গেল।

অক্সফোর্ড বা অপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন, তিনি বরাবর এইরূপ অভিলাষ পোষণ করিতেন, কিন্তু দারিদ্র্যের পেষণে তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। ইনি আত্ম-চেষ্টায় ইংরাজী ভাষায় অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং প্রতিভা বলে তিনবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়া এই মনীষী উত্তরকালে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য: "I believe more careers are ruined by going to the university than made" অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মরুপ্রান্তরে আসিয়া জীবনধারা পথভ্রান্ত ও শুষ্কই হয়, উৎসারিত হয় না।

(২)

ইতালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ও অধিনায়ক, যিনি আজ সভ্যজগতের বিস্ময় ও ত্রাস উৎপাদন করিতেছেন, সেই মুসোলিনীর প্রথম জীবনও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ছিল। এমন দিনও গিয়াছে যখন তাঁহাকে ত্রিশ ঘণ্টা অনাহারের পর ভিক্ষালব্ধ রুটির টুকরায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। পরে তিনি এক মুদীর দোকানে মুটোগিরি করিতেন এবং খরিদ্দারের গৃহে সওদা পৌঁছাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (Secondary) শিক্ষালাভের সুযোগ হইলেও উচ্চ শিক্ষার দ্বার ইঁহার নিকটও উন্মুক্ত হয় নাই, কিন্তু ইনিও আত্মচেষ্টায় নানা বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন।

(৩)

মুসোলিনীর ন্যায় হিট্‌লারও জগদ্‌বিদিত পুরুষ। ইনি আজ জার্ম্মাণীর হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া ইনি অন্নসংস্থানের জন্য ভিয়েনা নগরের এক ঠিকাদারের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যহ ইঁহাকে ঠেলা গাড়ীতে করিয়া ভগ্ন গৃহের ধ্বংসস্তূপ হইতে আবর্জ্জনা

বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হইত, তাহাতে যাহা কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন তাহাতেই দিনপাত করিতে হইত। বলা বাহুল্য ইহার ভাগ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাও (Secondary education) জুটে নাই, অথচ স্বকীয় শক্তি সামর্থ্য বলে আজ যে উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেরই অধিগম্য।

(৪)

রাশিয়ার একছত্র অধিপতি ষ্টালিন, চাষাবের ঘরে জন্মলাভ করেন। ইনি বাল্যকালে জুতা সেলাই করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিবার অপরাধে ইনি বহুবার সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত হন; কিন্তু দারিদ্র্য ও পীড়নের পেষণে পড়িয়াও তাঁহার অন্তরে গভীর পাঠানুরাগ ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তিনি নানাপ্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতেন।

(৫)

পূর্ব্বে র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড-এর কথা বলিয়াছি। ইনি এক সময়ে শ্রমিক দলের নেতা ছিলেন। অপর দুইজন শ্রমিক রাষ্ট্র-নেতার উল্লেখ করিব—তাঁহারা উভয়েই Cabinet Minister অর্থাৎ রাষ্ট্র সচিবের পদ লাভ করেন। ইঁহাদের নাম টি, এচ, টমাস্ ও ফিলিপ স্নোডেন। টমাস্ প্রথম জীবনে বস্ত্রের দোকানে দীন বালক-ভৃত্যের কার্য্য করিতেন এবং স্নোডেনের পিতা সামান্য তন্তুবায় ছিলেন।

ইংলণ্ডের অন্যতম রাজনীতি ধুরন্ধর উইন্‌স্টন্ স্পেন্‌সার চার্চ্চিলের প্রতিভাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা রাখে নাই। বাল্যে ইঁহার অনন্য-সাধারণ ধীশক্তির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই। বিশ্ববিশ্রুত হ্যারো স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁহার মনীষা বা বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র বিকাশও হয় নাই, নিতান্তই সাধারণ স্তরের ছাত্রে ও তাঁহাতে কোন পার্থক্য ছিল না।

তাঁহার পিতা লর্ড র‍্যান্‌ডলফ্ (Randolph) চার্চ্চিল পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও রূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই, তাই তিনি উইন্‌স্‌টনকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পুত্রের মধ্যে যে কত বৃহৎ সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল তাহার কোনও আভাষই তিনি পাইয়া যান নাই। মৃত্যুকালে যদি কেহ তাঁহার নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিত যে উত্তরকালে পুত্রের কীর্ত্তি ও প্রতিভা পিতার প্রতিভাকে পরিম্লান করিয়া দিবে তাহা হইলে লর্ড চার্চ্চিল কখনও সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

কিন্তু হ্যারো স্কুলের সেই স্থূলবুদ্ধি উইন্‌স্‌টন্ যখন স্যাণ্ড্‌হার্ষ্টের সামরিক বিদ্যালয়ে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন তখন তাঁহাতে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কোথায় একটি উপলখণ্ডে তাঁহার প্রতিভার ধারা যেন এতদিন চাপা পড়িয়াছিল, হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল। সকল জড়তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সেই স্থূল বুদ্ধি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। আজ তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা আর কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এখন একজন প্রথিতনামা সাংবাদিক ও গ্রন্থকার, কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ এবং নিপুণ চিত্রশিল্পী। বিদ্যালয়ের সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্বল করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু অসামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়াছে। ফলে পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় তিনি এক্ষণে বহু র‍্যাংলার (Wrangler) ও কলেজের অধ্যক্ষকে অক্লেশে পরাভূত করিতে সক্ষম।

স্কুল কলেজের কেতাবী শিক্ষা-নিরপেক্ষ হইয়া যে সকল কীর্ত্তিমান পুরুষ সভ্যজগতে সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছেন, আর্ল রেডিং তাঁহাদের অন্যতম। ইনি যখন রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া ভারতে আসেন তাঁহার ৪৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা, হুগলী নদী দিয়া একখানি বিলাতী জাহাজ কলিকাতা বন্দরের অভিমুখে আসিতেছে; বালক

রেডিং সেই জাহাজে নগণ্য ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত। সেদিন যদি কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিত যে, প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়া বালক যখন দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণ করিবেন তখন মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে, তাহা হইলে সেই ভবিষ্যদ্বক্তাকে বাতুলালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা হইত।

আর দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আয়র্ল্যাণ্ড এখন সাধারণতন্ত্র। ইহার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট (অর্থাৎ ডি-ভ্যালেরার পূর্ব্ববর্তী) কস্‌গ্রেভ্ যৌবনের প্রারম্ভে কোন এক মদের দোকানের ভৃত্য ছিলেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারিতেন না। অথচ বিপ্লবের সময় তিনি ইহার একজন প্রধান নেতা হইয়াছিলেন।

আয়র্ল্যাণ্ডের অপর নেতা মাইকেল কলিন্‌স্ এক সময়ে পোষ্ট অফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন; কিন্তু অবসর মত পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। যখন নিজ দেশে স্বাধীনতা সমর আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া তাহাতে যোগ দিলেন।

জগদ্বিখ্যাত সাবান প্রস্তুতকারক লর্ড লেভারহিউল্‌ম্ উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকেও কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লর্ড বার্কেনহেড্ এক স্থলে বলিতেছেন, "প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে ল্যাঙ্কাশায়ারের বোণ্টন সহরের নগণ্য এক মুদীখানার দোকান, সেখানে দাঁড়াইয়া কর্ম্মনিরত এক বলিষ্ঠ ও খর্ব্বকায় বালক, তাহার আননে তরুণ-সুলভ প্রফুল্লতার দীপ্তি; সেদিন অন্ততঃ দুইটি চক্ষু ভিন্ন তাহাতে আর কোন বিশেষত্বই লক্ষিত হয় নাই।

* * * *

"সেই বালকই উত্তরকালে সাহস ও উদ্যমের বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী-ধুরন্ধর হইয়াছিলেন। সাহস ও উদ্যম ইংরাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জগতে তাহার সকল প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র উহাই।

* * * *

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—তরুণ লেভার অল্প কয়েক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার পরই তাঁহাকে কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততায় মগ্ন হইতে হয়।"

এই সমুদয় জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ভিন্ন যাঁহারা আত্মচেষ্টায় পাঠাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা পরজীবনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমাদের গড়পড়তা ডিগ্রিধারীকে সামান্য খবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সগর্ব্বে উত্তর দেন, "হাঁ মহাশয়, ইহা ত আমাদের পাস করিবার সময় পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের মধ্যে ছিল না।" ইঁহারা সাধারণ বিষয়ে এত অজ্ঞ যে তাহা ভাবিলে হাস্যোদ্রেক হয় না বরং করুণায় চোখে জল আসে।

আমাদের দেশে কর্ম্মক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই। সৈন্যবিভাগে কিংবা নৌবাহিনীতে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেও চলে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে সেখানেও আমরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই। কলম-পেশা করা ও আত্মধিক্কার দেওয়া আমাদের সম্বল হইয়াছে। পতিত জাতির একটি প্রধান লক্ষণ হইল শাসকদের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করা। আমরা ভুলিয়া যাই যে—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

আমি সমগ্র ভারতবর্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছি যে, স্যার রাজেন্দ্রনাথ যদি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে B. E. কিংবা C. E. উপাধির তক্‌মা লইয়া বাহির হইতেন তবে তাহা বাংলা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই কথা হইত। ডিগ্রীর খাতিরে তিনি বড় জোর একজন ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনীয়ার বা একসিকিউটিভ-ইঞ্জিনীয়ার হইয়া জীবনযাত্রা সমাপ্ত করিতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান রাজেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেকালের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু দারিদ্র্যনিবন্ধন তথাকার

ব্যয়সাধ্য শিক্ষা সমাপন করিতে অক্ষম হইয়া ১৫৲ টাকা বেতনে বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন! ডিগ্রী অভাবে তিনি উচ্চপদে বঞ্চিত হইলেন সত্য কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে শাপে বর হইল। তিনি স্বাবলম্বী হইয়া অসামান্য মেধাবলে ব্যাবসাক্ষেত্রে অশেষ কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। প্রায়ই দেখা যায় যাঁহারা উচ্চপদে আরূঢ় থাকেন তাঁহারা মাসকাবারের বাঁধা বেতনের সুখে আবদ্ধ হইয়া পড়েন ও তাঁহাদের জীবনস্রোত একঘেয়ে পথে চলে। নিজস্ব গণ্ডীর বাহিরে তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে চাহে না। কিন্তু ব্যাবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্তি হইলে প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হয়।

তারপর মাড়োয়ারী বা ব্যবসায়ী হইলেই যে গণ্ডমূর্খ হইবে, এরূপ কোন নিদর্শন পাই না। আজকাল অনেক মাড়োয়ারী শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নহে পরন্তু অর্থনীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রতিভা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ বম্বের রাজাবাহাদুর মতিলাল শিবলাল ও কলিকাতার ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নাম করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ না হইয়াও যে বিদ্যাবত্তায় ও ঐশ্বর্য্যে বরেণ্য হওয়া যায় সেরূপ দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী সমাজেও একান্ত বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি মাত্র আট টাকা বেতনে ছাপাখানার নগণ্য কম্পোজিটর রূপে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন, কিন্তু আত্মচেষ্টার বলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন, অধিকন্তু ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ইহার সংকলিত বিরাট ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান গভীর পাণ্ডিত্যের আকর বিশেষ। শুধু তাহাই নহে, ইংরাজী ভাষায় ইনি যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তখনকার দিনে তাহা অত্যন্ত দুর্লভ ছিল সন্দেহ নাই!

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের প্রথম জীবনও দুঃখকষ্টে কাটিয়াছিল। একদা তিনি শোভাবাজারে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ

করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে ক্লাইভের দূত, পার্শী ভাষায় লিখিত দলিলপত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, এমন একটি লোকের অন্বেষণব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইল। নবকৃষ্ণের পার্শীভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল—উহারই বলে তিনি সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করেন।

বিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকার হাটখোলার মদনমোহন দত্তের অধীনে সামান্য পাঁচ টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন। কালক্রমে বাজার সরকারের পদ হইতে তিনি ফেয়ারলি ফার্গুসন্ কোম্পানীর বানিয়ান পদে উন্নীত হন এবং নিজে জাহাজের মালিক হন।

স্বনামধন্য মতিলাল শীল প্রথম জীবনে মাত্র আট টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন।

অন্যত্র বলিয়াছি যে, সংবাদপত্র সম্পাদনে যাঁহারা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন যথা, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ এবং বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি এবং লাহোর "ট্রিবিউন" পত্রের সম্পাদক শ্রীকালীনাথ রায়—ইঁহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মাধারী নহেন। অবসর মত অধ্যয়নে নিরত থাকিয়া ইঁহারা জ্ঞানার্জ্জন করেন এবং পরিণামে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন।

কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছি (৯৯ পৃঃ) যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা ব্যতিরেকে কেবল যে ব্যাবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেই কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় তাহা নহে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা যাইতে পারে! রক্ষণশীল দলের নেতা বোনার ল' (Bonar Law) ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইঁহার সম্বন্ধে লর্ড বার্কেনহেড বলিয়াছেন—"He was the young merchant whose intellectual advancement marched side by side with his business progress." অর্থাৎ ব্যাবসাক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন এবং মনীষাতেও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন।

জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালী

নদীমাতৃক বাংলা দেশ চিরদিনই শস্যশ্যামলা। কবি গাহিয়াছেন, 'মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর, ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল তোমার কানন সভাতে'। কবিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব রাজ্যের পরিচয় যদিও খুব কম তথাপি এই বর্ণনা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নহে। ধনে, ঐশ্বর্য্যে, শিল্প-কলায় বহুদিন হইতে বাংলার খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিল। ঢাকার মসলিন সুদূর পশ্চিম দেশেও রপ্তানি হইত। দেশবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না সত্য, কিন্তু গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। তাহাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ই যথেষ্ট ছিল। তারপর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার পথও অধিকতর দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে! অভাব অভিযোগ আজ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্বল, শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরর্থক উপাধি সম্বল করিয়া জীবন-সংগ্রামে আজ দিশা-হারা, কেহ কেহ বা আত্মহত্যায় সকল জ্বালা জুড়াইতেছে—দৈনিক সংবাদপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসায়িগণ আজ তাহাদের ব্যাবসা হারাইয়াছে। জমিদার, মহাজন সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বলিতে গেলে বাংলা দেশ আজ শ্রীহীন ও পরদ্বারস্থ। বিদেশী বণিকগণ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা এইখানে আসিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেছে, আর দেশের যুবকগণ 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' করিয়া দেশ-বদেশে চাকরী অন্বেষণে ধাবমান। দেশের কৃষিজীবীরাও আজ আলস্য-পরায়ণ হইয়া উপবাস করিতে বসিয়াছে। আগের মত তাহারা আর জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। একটু ধীরচিত্তে দেশের এই নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের কথা ভাবিলে, নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালীজাতি দিন দিন ধ্বংস হইতে গভীরতর ধ্বংসের পথে

অগ্রসর হইতেছে। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধির কবলে পড়িয়া কতদিন যে এই জাতি টিকিয়া থাকিবে, ইহাই ভাবিবার কথা। বাঙ্গালী জাতি আজ জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত। আমার বহু প্রবন্ধে বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা দিন দিন কিরূপভাবে জটিল হইয়া পড়িতেছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, জানিনা কবে ইহাদের চৈতন্য হইবে।

বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দশা আত্মকৃত। অলসতা, অকর্ম্মণ্যতা, শ্রমবিমুখতা আমাদিগকে দিন দিন একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। ৫০।৬০ বৎসর আগের কথা—তখন দেশে ধোপা, নাপিত, পাট্‌নি, মুটে-মজুর সবাই বাঙ্গালী ছিল, বর্ত্তমানে তাহাদের মুখের গ্রাস অ-বাঙ্গালী আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। এই কলিকাতা সহরে সেলাই-জুতির মধ্যে একটিও বাঙ্গালী দেখা যায় না। আমাদের দেশে মুচির অভাব নাই। তাহারা জানে শুধু পরের কাছে হাত পাতিতে। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা, না খাইয়া মরিবে, কিন্তু কিছুতেই কাজ করিবে না। ধোপার অন্ন গিয়াছে। এই কলিকাতা মহানগরীতে কদাচিৎ দুই একটি বাঙ্গালী ধোপা দৃষ্ট হয়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা, বাঙ্গালী ধোপারা এই সহরে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত, জাহাজের কাপড় ধোয়া তাহাদের একচেটিয়া ছিল, কিন্তু অধিকতর কর্ম্মপটু এবং শ্রমশীল পশ্চিমাদের নিকট এখন তাহারা হটিয়া যাইতেছে। সহরের গোয়ালাদের অধিকাংশই পশ্চিমা। শুধু অ-বাঙ্গালী নয় বিদেশীরাও এখানে অন্ন সংস্থান করিতেছে, সহরের ছুতারের কাজ এবং জুতা তৈরীর কাজ তাহাদের প্রায় একচেটিয়া। আজ যদি বাংলা দেশ হইতে বাঙ্গালী ও পশ্চিমা মুসলমানদের জুতার দোকান-গুলি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে দেশের জুতা ব্যাবসার কোনই ক্ষতি হইবে না। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমি দেখিতাম, এখন যেখানে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, সেইখানে খোলার ঘরে শত শত বাঙ্গালী মুচি ঠন্‌ঠনিয়ার চটি

প্রস্তুত করিত, তালতলায়ও চটি তৈয়ারী হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই চটি ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালী মুচিরা গেল কোথায়? শুধু বাঙ্গালী নয়, পশ্চিমা মুচিরাও আজ চীনাদের নিকট পরাস্ত। তাহারা নিজেরা চর্ম্ম-সংস্কারের কারখানা (Tannery) খুলিতেছে। বালিগঞ্জ পাগলাডাঙ্গা অঞ্চলে চীনাদের এরূপ অনেকগুলি ছোট ছোট Tannery আছে। তথাকার প্রস্তুত চামড়ায় জুতা তৈয়ারী করিয়া তাহারা প্রচুর লাভবান হইতেছে। পুরুষের ন্যায় তাহাদের মেয়েরাও অত্যন্ত শ্রমশীল। আজ ঢাকা সহরে ১৪।১৫টী চীনা জুতার দোকান। তাহারা দ্বারে দ্বারে নতজানু হইয়া জুতার অর্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালী জুতা ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু দোকান করিয়া বিজলী পাখার তলায় বসিয়া দিন কাটায় না। কি করিয়া ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয় তাহা তাহারা সবিশেষ জানে। আর একটি জিনিষও তাহারা দখল করিয়াছে, সেটি ছুতারের কাজ। সহরে বাঙ্গালী ছুতার এক প্রকার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা আবহমান কাল প্রচলিত ধারায় কাজ করিয়া আসিতেছিল, নূতন কিছু শিখিবার তাহাদের আগ্রহ ছিল না। এই অবসরে চীনারা নূতন উদ্যম ও নব নব কর্ম্মপটুতার দ্বারা এই শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং বাঙ্গালী ছুতারদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। P. W. D. প্রভৃতির সমস্ত কাজই তাহারা করিয়া থাকে। জাহাজ, ট্রাম, বাস প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে হইলে তাহাদের না হইলে চলে না। ট্যাংরা অঞ্চলে ক্যাণ্টন কারপেণ্টারি (Canton Carpentry), হিং এণ্ড্ কোং প্রভৃতি চীনাদের বড় বড় কারখানা পরিদৃশ্যমান হয়।

এইবার বাংলার খেয়াঘাটগুলির কথা বলিতেছি। সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিদেশী না হইলে আমাদের খেয়া পারাপারও চলে না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির অধীনস্থ সমস্ত খেয়া ঘাটগুলি পশ্চিমারা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, কারণ তাহারা

আমাদের দেশের পাট্‌নীদের ন্যায় অলস নহে এবং তাহাদের কর্ম্মশক্তিও অনেক বেশী। একটু বিপরীত স্রোত ও বায়ুর মুখে কখনই দেশী পাটনীরা নৌকা চালাইবে না। কিন্তু পশ্চিমারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সব সময়ে সকল কাজেই অগ্রসর, দিন, দুপুর সকল সময়েই তাহারা প্রস্তুত।

এইবার বাংলার ব্যবসায়ীর দিকে তাকান যাক। আমি একথা বহুবার বলিয়াছি যে, যদি একজন বৈদেশিক হাওড়া ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রবেশ করে, তবে বড়বাজারের দু'ধারের গগন-স্পর্শী হর্ম্ম্যমালা দেখিয়া সে নিশ্চয়ই বলিবে যে, ইহা মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়ার দেশ। বাংলার প্রধান প্রধান ব্যাবসা আজ অ-বাঙ্গালী-অধিকৃত। রেলওয়ে হইবার বহু পূর্ব্বে ইহারা পদব্রজে এদেশে আসিয়াছে, আজ শুধু কলিকাতা সহরে নয়, বাংলার প্রধান প্রধান গঞ্জে ও বন্দরে এমন কি নিভৃত পল্লীতে পল্লীতেও তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথাকার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিতেছে। ইহার কারণ কি? অন্য প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। ইহা কি আমাদের নিদারুণ অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দেয় না? বাঙ্গালী এতদিন ব্যাবসা করিয়াছিল প্রতিযোগিবিহীন হইয়া; ফলে ব্যাবসার সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাহাদের খুব কম ছিল, তদুপরি গদিয়ান ভাবের বশে ও পয়সার গরমে তাহারা আজ সমূলে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে হৌসের মুচ্ছদ্দিরা সবাই বাঙ্গালী ছিল; আজ একজনও বাঙ্গালী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মতিলাল শীল, রামদুলাল সরকার প্রভৃতি বাংলার ব্যাবসা-জগতের ধুরন্ধরবৃন্দের জীবনীপাঠে তখনকার ব্যাবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বাঙ্গালীর কতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। এক মতিলাল শীলই ৮।১০টী ফার্ম্মের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। আমদানী ও রপ্তানীর জন্য তাঁহার নিজের জাহাজ ছিল। রামদুলাল সরকার ও প্রাণকৃষ্ণ লাহাও

অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া বাংলার ব্যাবসা-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন।* কথায় বলে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। যেদিন বাংলা তাহার ব্যাবসা হারাইয়া পরের গোলামীর দিকে নজর দিয়াছে, সেইদিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। একে ত বিদেশী বণিক্‌গণ কোটী কোটী টাকা দেশ হইতে শুষিয়া লইতেছে, তাহার উপর অ-বাঙ্গালীরা, যাহা বাকী ছিল তাহাও অধিকার করিয়া লইয়াছে। আমার আত্মচরিতে স্পষ্টই দেখাইয়াছি যে, প্রতি মাসে দশ কোটী টাকা বাংলা হইতে অ-বাঙ্গালীরা লইয়া যাইতেছে, বাংলা গেল কোথায়? যদি জানিতাম, তাহারাও আবার অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া বাংলার ধনভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিতেছে, তাহা হইলে কিছু বলিবার ছিল না।

* বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে কয়জন দেশীয় ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাগুণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন রামকমল সেন তাঁহাদের অগ্রগণ্য। নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে আরও ভাগ্যের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় রামকমলের সমকক্ষ বিরল। বিশ্বনাথ মতিলাল যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও লবণ গোলাসমূহের দেওয়ান ছিলেন—তিনি মাত্র আট টাকা বেতনে চাকুরী জীবন আরম্ভ করেন। লোকের ধারণা যে, কর্ম্মত্যাগ করিবার কালে তিনি বারো হইতে পনেরো লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের পিতা মাত্র পাঁচ টাকা বেতনে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি ফেয়ারলি ফার্গুসন কোম্পানী ও আমেরিকান কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। আজকালকার টাকার বাজারে যিনি অবিসংবাদী সম্রাট সেই মতিবাবুও প্রথম জীবনে মাত্র দশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন। রামকমলও স্বকীয় চেষ্টায় সৌভাগ্যশালী হন। ইনিও এক কালে ডাক্তার হাণ্টারের হিন্দুস্থানী প্রেসে মাত্র আট টাকা বেতনের কম্পোজিটর ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণের তুলনায় ইঁহার সঞ্চিত বিত্ত কম (দশ লক্ষ) হইলেও পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানগরিমায় ইনি দেশবাসীর নিকট অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন হইয়াছিলেন।" [রামকমলের মৃত্যুতে Friend of India (1844) নামক সংবাদ পত্রের উক্তির অনুবাদ।]

কিন্তু বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনা তো দূরের কথা, নিজের পৈতৃক ব্যাবসা আজ বাঙ্গালী রক্ষা করিতে পারিল না। আজ যদি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী আবার ধীরে ধীরে অ-বাঙ্গালীদের ন্যায় তাহার সেই পূর্ব্ব ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতির ধ্বংস অতি সন্নিকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া জীবনধারণ চলে না, আমি একথা বহুবার বলিয়াছি এবং আজও ইহা বলিতে পশ্চাৎপদ নই, এই মিথ্যা মোহই আমাদের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। যুবকগণ, যাহারা দেশের আশা ভরসাস্থল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তকমা লইয়া বাহির হয়, তাহাদের অধিকাংশই তখন ভগ্নস্বাস্থ্য ও অবসাদগ্রস্ত। কোন-রকমে দিন চালানোর মত একটি চাকুরী মিলিলেই তাহারা জীবন সফল মনে করে। কাজে উদ্যম থাকে না। চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে পারিবে কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের দিকে মোটেই লক্ষ্য করিবে না। এইখানে একটি কথা বলিবার আছে, বাংলা দেশে হাজার করা মাত্র ৮ জন সরকারী চাকুরীজীবী। যাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বা অবসর গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই পদ খালি হইয়া থাকে সুতরাং হিসাব করিয়া দেখিলে জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে ২।১ জনের চাকুরী হইতে পারে। এই চাকুরিয়াদের মধ্যে আরদালী, বেয়ারা, চৌকিদার, কনষ্টেবল সকলকেই ধরা হইয়াছে। কাজেই এই চাকুরীকে উপজীবিকা ধরিলে জাতি কখনই টিকিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইহাদিগকে শুধু অকর্ম্মণ্যই করে নাই, একটি মিথ্যা অভিমান ইহাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। নিজেরা বাজার করিতে অপমান বোধ করে, পল্লীর হাল চালের সহিত ইহাদের বিরোধ, পৈতৃক ব্যাবসাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এ দেশে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাদৃশ সুফল ফলে নাই। কারণ দেশের তথাকথিত শিক্ষিতেরা শ্রমের মর্য্যাদা

শিখে নাই। প্রকৃত শিক্ষা সর্ব্বকালেই মানবজীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু চাকুরীর জন্যই বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, এই ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক।

বাঙ্গালীর জীবন সংগ্রামে হটিয়া যাওয়ার কারণ কি, তাহার সামান্য কিছু বলিলাম। আর একটি কথা বলিয়া শেষ করিব, সেটি আমাদের সামাজিক প্রথা; সামাজিক প্রথা নয়—সামাজিক কু-প্রথা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যাকে আমরা সনাতন গ্রন্থি বলি, সেটা আমাদের মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।" শতধা বিভক্ত এই বাঙ্গালীজাতির মধ্যে যতদিন না ভেদাভেদ মুছিয়া যাইবে, ততদিন কর্ম্মের একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা কিছুতেই হইবে না। অন্নক্লিষ্ট দেশবাসী আজও যে মিথ্যা জাত্যাভিমানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। সকলকে টানিয়া তুলিতে না পারিলে, দেশের কল্যাণ হইবে না। ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব এই যে, কৃষক হোক, কর্ম্মকার হোক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুবিমল আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিয়া থাকে। মনীষী কার্লাইল্, Pilgrim's Progress-এর রচয়িতা বুনিয়ান ও রবার্ট বার্ণ্স্‌কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই দরিদ্র কৃষকসন্তান। আমাদের দেশের কৃষকগণ যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিয়াছে। দুই একটি বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তির আবির্ভাবে দেশ কখনই জাগিতে পারে না। সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং সকলের জীবন-ধারাকে সহজ ও সুগম করিতে না পারিলে, দেশের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত।

এই স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপ ও চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে জাতিভেদ আদৌ নাই। সেখানে কোনও ব্যাবসা অবলম্বন ইচ্ছাধীন—বংশানুক্রমিক নহে, অর্থাৎ আমাদের দেশে জুতাসেলাই যেমন চামার বা মুচিজাতির ভিতর নিবদ্ধ এবং মলমূত্রের অপসারণ অর্থাৎ

মেথরের কাজ ডোম, ধাঙ্গড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঐ সব দেশে সেরূপ নহে। এমন কি চীন বা জাপান দেশে পায়খানার মল সাধারণতঃ চাষীরা ভিক্ষা করিয়া লইয়া যায় এবং তাহা মহামূল্য সারে পরিণত করে। কিন্তু আমাদের হতভাগ্যদেশে ১৮৲,২০৲, ২৫৲ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি সম্ভ্রান্ত কাজ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত চর্ম্মপরিষ্কার কার্য্যে যে কোটি কোটি টাকা রোজগার হইতে পারে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

পরিষ্কৃত চর্ম্ম ও বাঙ্গালীর জুতার ব্যবসায়

এই অন্ন-সমস্যার দিনে জীবিকানির্ব্বাহক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়ের কথা গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমি বার-বার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালী কেবল ইউরোপীয় বা চীনা-জাপানীর সহিত নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বত্র পরাস্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অন্ন-সমস্যা যে-প্রকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী যদি প্রাণপণ করিয়া অন্ততঃ তাহাদের নিজের দেশে নিজের অন্নসংস্থান করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোন ভরসা নাই। বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইতে পারে, এ আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইব, কেমন করিয়া নানা প্রদেশের অ-বাঙ্গালীরা এই কলিকাতা সহরে কেবল মাত্র জুতার ব্যাবসা করিরা বৎসরে কম পক্ষেও সওয়া কোটী টাকা রোজগার করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে। ইহারা সামান্য মূলধন লইয়া ব্যাবসা আরম্ভ করে, কিন্তু অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের বলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে।

গত অক্টোবর মাসে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার একটি সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতার কয়েক সহস্র পশ্চিমা চামার ধর্ম্মঘট করিয়া ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে এক সভা করে। কলিকাতার কসাইটোলা অর্থাৎ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে ও আশে পাশে চীনা জুতাওয়ালাদের অধীনে প্রায় আট দশ হাজার পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা গড়ে প্রত্যেকে বারো আনা হইতে এক টাকা দিন-মজুরি পায়। যাহারা জুতার উপরের সাজ প্রস্তুত করে, তাহাদের দিন-রোজগার পাঁচসিকা। এই হিসাবে দেখা যায়, ইহারা মাসে রোজগার করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। এই ত' গেল

চীনাদের নিযুক্ত পশ্চিমা চামারদের কথা। ইহা ছাড়া টেরিটি বাজারে আমার বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি তোতা, লাকুচেঁদি, লালচাঁদ প্রভৃতি বড় বড় জুতাওয়ালাদের কারখানা আছে। সমগ্র উত্তর-কলিকাতা ব্যাপিয়া বহুশত পশ্চিমা জুতাওয়ালাদের ছোট ছোট কারখানাও আছে। এই সকল কারখানাতেও কয়েক হাজার পশ্চিমা কারিগর কাজ করে। এই সব ছোট ছোট জুতার কারখানার মালিকেরা এবং তাহাদের কারিগরগণ কম হইলেও বছরে আটত্রিশ লাখ টাকা রোজগার করে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, সমস্ত পশ্চিমা চামার ও জুতা-ব্যবসায়িগণ বৎসরে প্রায় আটষট্টি লাখ টাকা আয় করে। ইহা ছাড়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় শত শত 'সেলাইবুরুষ' দেখা যায়। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় পর্য্যন্ত ইহাদের ছড়াছড়ি। এই অ-বাঙ্গালী চামার কারিগরগণ বাংলা দেশে আসিয়া নিজেরা পেট ভরিয়া খাইবার সংস্থান করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেশ দু-পয়সা জমাইয়া নিজের নিজের দেশেও পাঠাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী মুচিরা একমুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে।

পূর্ব্বে কেবল চীনা জুতাওয়ালাদের কারিগরদের আয়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহারাই যদি বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টাকা পায়, তবে জুতা-ওয়ালারাও কমপক্ষে বৎসরে ষাট লক্ষ টাকা লাভ করে। চীনা জুতা-ব্যবসায়ীরা নিজেরাও কারিগর, এমন কি, তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও ব্যবসায়ে পুরুষদের বিবিধ প্রকারে সাহায্য করে। ইহারা সমস্ত দিন ছাড়া রাত্রিতেও অনেক সময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে চীনা এবং জাঠ মুসলমানদের বহু ছোটখাট ট্যানারি আছে। এই সকল ট্যানারির মালিকদের মাসিক আয় গড়ে ২৫০৲ হইতে ৫০০৲ পর্য্যন্ত। এই সকল ট্যানারিতেও শত শত পশ্চিমা চামার আছে।

মোটের উপর দেখা যায় যে, এই সকল চীনা এবং অন্যান্য অ-বাঙ্গালী

ব্যবসায়ী ও চামারগণ বৎসরে দেড় কোটী টাকারও বেশী রোজগার করিতেছে।

কলিকাতার বাহিরে বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এবং পশ্চিমাঞ্চলের বহু স্থানে যে-সকল জুতা ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশেরই প্রস্তুতকারক চীনা এবং ব্যবসায়ীও চীনা। ব্যবসায়ের লাভেরও শতকরা অন্ততঃ ৪০৲ টাকা ইহারা পায়।

পূর্ব্বে যাহাকে সেলাইবুরুষ বলিলাম ইংরেজীতে তাহাকে "কব্‌লার" বলে। "কব্‌লার" এবং "শু-মেকারে" কি তফাৎ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। শ্রীরামপুরের মিশনরী উইলিয়াম্ কেরীর নাম সর্ব্বজন-বিদিত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ স্থাপন করেন, তখন উইলিয়াম্ কেরী উক্ত কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একদা লাটসাহেব অন্যান্য বহু ইংরেজ সদস্যের সঙ্গে কেরী সাহেবকেও ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজে নিমন্ত্রিত একজন আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তি পার্শ্বস্থ আর একজনের কানে ফিস ফিস করিয়া বলেন যে, "এই কেরী না একজন 'শু-মেকার' ছিলেন?" কেরী সাহেব এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমার প্রতি অবিচার করিবেন না, আমি 'শু-মেকার' ছিলাম না, ছিলাম একজন সামান্য 'কবলার' মাত্র!" ("I was never a shoe-maker—but only a cobbler")

সোভিয়েট রুশিয়ার বর্ত্তমান হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, যিনি এখন লেনিনের পদে অভিষিক্ত, তাঁহার নাম ষ্টালিন। ইঁহার একজন জীবনীলেখক বলেন যে, "At one time he used to cobble shoes." ইউরোপ এবং আমেরিকার ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহু ব্যক্তি সামান্য "সেলাইবুরুষ" হইতে দেশের রাষ্ট্রে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বজন-মান্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে, অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিবে কিন্তু লোকে এমন পরম লাভজনক চর্ম্ম এবং জুতার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। স্বাধীনভাবে তাহারা যেখানে মাসে দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সেইখানে তাহারা সামান্য কুড়ি পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরি যোগাড় করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখন দুই চারিজন ভদ্রলোক এই চর্ম্মব্যবসায়ে নামিয়াছেন, কিন্তু যথোপযুক্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায় না থাকায় চীনা ইত্যাদি অন্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহারা অন্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঢাকা সহরের রমনা অঞ্চলে বহু চামার-জাতীয় লোক বাস করে, ইহারা অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে, কখন কখনও বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু এই ঢাকা সহরেই বহু পশ্চিমা সেলাইবুরুষ বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। বাঙ্গালীর ব্যর্থতার কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা দেখিয়াও দেখে না, ঠেকিয়াও শেখে না, তাহাদের কোন আশা নাই।

যত প্রকার শিল্প আছে চর্ম্মশিল্প যে তন্মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বাস্তব জগতে যে কত, তাহা অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। গত মহাযুদ্ধে এই চর্ম্মই আহার ও পানীয়ের আধাররূপে ব্যবহৃত হইয়া হাজার হাজার ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছে। বস্ত্রশিল্প যেমন লজ্জা নিবারণের জন্য জগতে আবশ্যক, চর্ম্মশিল্পও তেমনি নানা প্রয়োজনে আবশ্যক। বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা এই চর্ম্মশিল্প যে কোনও প্রকারে ন্যূন তাহা নয়। দেশের ধনাগম হিসাবে বিবেচনা করিলেও এই অবজ্ঞাত ব্যবসায়কে উচ্চ স্থান দিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলায়

এই শিল্প ও ব্যবসায় চিরকালই ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

চামড়ার দুইটি বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য ইহা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। (১) ইহা ক্ষণভঙ্গুর নয়; (২) ইহা অতি নমনীয় (flexible) অথচ স্থায়ী। দেশের শিল্পোন্নতির উপরই দেশের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। চর্ম্মশিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা দেশে কিরূপ অর্থাগম হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে এই শিল্পকে এই ভীষণ অন্ন-সমস্যার দিনে ঘৃণা ও উপেক্ষা করা যায় না।

আজ চৌদ্দ পনের বৎসর হইল আমাদের দেশে এই শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছে। বাংলায় এক ন্যাশন্যাল ট্যানারি ভিন্ন বাঙালীর মূলধনে এবং বাঙ্গালীর দ্বারা চালিত আর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারখানা নাই। টালিগঞ্জে জনৈক মুসলমানের একটি বড কারখানা আছে (জলন্ধর ট্যানারি)। বাংলা সরকার বাঙ্গালীর ঘৃণিত ও উপেক্ষিত এই শিল্পের শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট করিয়াছেন, ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ শিক্ষা পাইবার স্থান না থাকায় জনসাধারণ এই শিল্প সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল, এবং এই শিল্পও উন্নত হইবার সুবিধা পায় নাই। বর্ত্তমানে বহু ভদ্রসন্তান জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া চর্ম্মশিল্প ও চর্ম্মব্যবসায়ে মন দিয়াছে। এই ভীষণ অন্ন-সমস্যার কালে ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার কতটা সমাধান হইতে পারে, নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম।

১। কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়।—বহু মুসলমান ও ইংরেজ ধনী মফঃস্বলে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় চামারদের নিকট হইতে অতি অল্প মুল্যে চামড়া কিনিয়া মজুত করে। পরে ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। এই প্রকার কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ী অধিকাংশই বহু লক্ষপতি। বর্ত্তমানে আমেরিকা, জার্ম্মেনি, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই

শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা অল্প কথায় লিখিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশকে কাঁচা চামড়ার জন্য আমাদের দেশের চামড়ার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। বৎসর বৎসর আমাদের দেশ হইতে প্রায় কয়েক কোটী টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়।

কোনও বেকার বাঙ্গালী সামান্য মূলধন লইয়া অন্ততঃ তাঁহার গ্রামের কাঁচা চামড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া রপ্তানিওয়ালা ধনীদের নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার নিজের বেকারত্ব ও অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। তবে ইহাতে জাত্যাভিমান ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা চাই, যাহা বাংলার যুবকদের মধ্যে দুর্ল্লভ।

২। কাঁচা চামড়া পাকাইবার ব্যাবসা।—ভাল একটি কারখানা করিতে অনেক টাকার দরকার। সুতরাং সে কথা এখন থাক। অল্প মূলধনে যাহা হইতে পারে, যাহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। আস্তরের (lining) জন্য যে চামড়ার দরকার হয়, তাহা করিতে কলকব্জার দরকার হয় না, মূলধনও খুব বেশী লাগে না। অল্প করিয়া ছাগল অথবা ভেড়ার চামড়া কিনিয়া (দেশের গ্রাম হইতে জোগাড় করিয়া আনিলে পড়তায় আরও কম পড়ে) হাত-পাকাই করিয়া (ক্রোম অথবা ছাল দ্বারা) দিলে বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবনা হয় না। ব্যাপারীরা সন্ধান করিয়া নগদ মূল্যে উহা লইয়া আসে। ঐ প্রকার ফুটবল লেদার, সুটকেশ লেদার, হুড লেদার, হুড বার্নিস, লেদারও প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কলিকাতায় এইরূপ শিক্ষা পাইবার একমাত্র স্থান বাংলা সরকারের বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট। উহার বিস্তৃত বিবরণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়।

৩। জুতা প্রস্তুত।—যাহাদের মূলধন অল্প তাহাদের পক্ষে বাড়ী বাড়ী বা আপিস ঘুরিয়া অর্ডার সংগ্রহ করিয়া অর্ডার অনুপাতে চার পাঁচটি

কারিগর রাখিয়া জুতা প্রস্তুত করিলে অর্থকষ্টের মোচন হয়। নিয়মিতভাবে কাজ করিলে প্রত্যেক কারিগর রোজ এক জোড়া করিয়া জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। চারটি কারিগর রাখিলে প্রত্যহ চার জোড়া জুতা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রত্যেক জোড়ায় এক টাকা করিয়া লাভ রাখিলে দৈনিক ৪৲ টাকা উপার্জ্জন হয়; সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারটি কারিগরের সংসারও প্রতিপালিত হয়। গড়ে প্রত্যেক কারিগর খুব কম মাসিক ২৫৲ টাকা উপায় করিতে পারে এবং নিয়মিতভাবে কাজ করিলে কোনও ভাল কারিগর মাসে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্তও উপায় করিতে পারে। কিন্তু হতভাগারা মদ খাইয়া তাহাদের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক নষ্ট ত করেই, তাহা ছাড়া নেশা করিয়া, কাজ কামাই করিয়া, নিয়মিতভাবে কাজ করিলে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে বঞ্চিত হয়। একটি ভাল জুতার কারিগর নেশা না করিয়া নিয়মিতভাবে কাজ করিলে আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত কিন্তু অন্নকষ্টজর্জ্জরিত যে-কোনও গ্রাজুয়েট অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে। জুতার সাইজ এবং কারিগরের নৈপুণ্য হিসাবে জোড়া প্রতি আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত মজুরি পাওয়া যায়। এইরকম প্রতি জোড়ায় এক টাকা লাভ রাখিলে জুতার দাম যে বাজার দর অপেক্ষা খুব বেশী হয় তাহা নহে অথচ জিনিষটি ভাল হয়। এইরূপে বাড়ীতে বাড়ীতে, আপিসে আপিসে অর্ডার লইয়া কত চীনা নিজেদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে। এ কারবারের মস্ত একটি অসুবিধা যে, কারিগরদের দাদন দিতে হয় এবং অনেক সময় কারিগর এই দাদন লইয়া কিছুদিন কাজ করিয়া পলাইয়া গিয়া অন্য স্থানে নূতন দাদন লয়। অথচ দাদন না দিয়াও উপায় নাই, কারিগর রাখিলেই দাদন দিতে হইবে, উহা একটা প্রথা—এই প্রকারের জুতার কারবার কেন যে ফেল হয় তাহার একটি প্রধান কারণ এই। এমনও আজকাল দেখা যাইতেছে যে, চীনামুল্লুক হইতে নবাগত চীনা মাত্র দুই একটি এদেশী

কারিগর সহকারী স্বরূপ লইয়া, নিজেরা স্ত্রীপুরুষে কাজ করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এ-প্রকার চীনাদের কোনও দোকান নাই, একটি মাত্র ঘর ভাড়া লয় এবং সেই ঘরই তাদের কারখানা, খাইবার স্থান এবং বাসস্থান। এমন কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বল্পতুষ্ট জাত দেখা যায় না। দেখিতে ক্ষীণকায় হইলেও তাহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহারা সদাই আনন্দসাগরে ডুবিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

৪। জুতার কারবারের মত সুটকেস্, এটাশেকেস, হোল্ড-অল্, ডাক্তারী বাক্স, বেল্ট, বেডবাইণ্ডার প্রভৃতির কারবার অল্পমূলধন লইয়া এবং অল্প কারিগর লইয়া চলিতে পারে। অল্প মূলধনে ঐ প্রকার খুচরা অর্ডারি কাজই চলে কিন্তু তাহাতে যে-কোন লোক তাহার সংসার ভরণ-পোষণ করিতে পারে।

৫। আর একটি কারবার আছে তাহাতেও এমন কিছু মূলধনের দরকার হয় না। উহা জুতার উপরকার অংশ তৈয়ারী। মাত্র একটি জুতা সেলাইয়ের কল থাকিলেই হয় এবং তাহাও কিস্তিবন্দিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার সাজ প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনভাবে দৈনিক ন্যূনকল্পে ৪৲ টাকা উপার্জ্জন করা যায়। জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া কত শত চীনা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীনতার কদর বুঝে না, তাই পরাধীন আমাদের এত দৈন্য। চীনারা যে জুতা সস্তায় দিতে পারে তাহার অন্যান্য কারণ ছাড়াও আর একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের স্ত্রীজাতির নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য পায়। স্ত্রী-পুরুষে ক্ষমতানুযায়ী সমানভাবে পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আমাদের মত এত দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। অনেক সময় চীনা নারীরা জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য অর্থের সুবিধা করে। ঐ সাজ প্রস্তুত করার

জন্য কোন কারিগর রাখিলে ন্যূনকল্পে ৬০৲ টাকাও দিতে হইত। সুতরাং ঐ ৬০৲ টাকাই তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য বাঁচে, অর্থাৎ এই প্রকার সাজের কাজ করিয়া চীনা-গৃহিণীরা দৈনিক ২৲ টাকা করিয়া উপায় করিতে পারে। ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক গৃহস্থালীর কাজ ত আছেই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নারীদের শিল্প শিক্ষার জন্য অনেক স্থানে অনেক প্রকার সাড়া দেখা যাইতেছে এবং কোথাও কোথাও বা দু-একটি প্রতিষ্ঠানও হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যদি অনাথা স্ত্রীলোককে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার উপযোগী করাই হয়, তবে তাঁহাদিগকে অর্থকরী শিক্ষা দিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে এইরূপ সাজ প্রস্তুত অথবা ঐ প্রকার অন্য কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অর্থোপার্জ্জন হিসাবে অতিশয় কার্য্যকরী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখানে একটি নজীর না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ভবানীপুরনিবাসী কোন ভদ্রমহিলা মনিব্যাগ তৈয়ারী করিয়া মনোহারী দোকানে বিক্রয় করিয়া গড়ে মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করেন। সময়াভাবে রন্ধনকার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি একটি পাচক রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বামী একটু অসন্তুষ্ট হওয়াতে তিনি তাঁহার স্বামীকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, পাচক না রাখিয়া নিজে রন্ধন করিয়া তিনি সংসারের যাহা সাশ্রয় করিতেন; পাচক রাখিয়া সেই সময়টা এইরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার তিন গুণ সাশ্রয় করিতেছেন। ঠিক এইরূপ ধারণা লইয়া অনেক চীনা মহিলা রন্ধনের হাঙ্গাম না করিয়া সেই সময় তাহাদের ব্যবসায়ের কাজ করিয়া অনেক বেশী সাশ্রয় করে। ইহাদের হোটেল হইতে গৃহে খাদ্য পৌঁছিবার ব্যবস্থা থাকে। অধিকাংশের এই ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হোটেলে যাতায়াতের জন্য যে সময় নষ্ট হইবে, সেই সময়টুকু বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। 'Time is money'—ইহার তাৎপর্য্য ইহারা বে

ভালভাবেই বুঝিয়াছে, তাহা সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। আর একটি মহৎ গুণ ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায়—উহাদের সততা। ব্যাবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-দুইটি গুণের একান্ত দরকার সেই দুইটি এই জাতিতে বর্ত্তমান। আমার পরিচিত কোনও ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনও এক চীনা দোকানে তাহার মণিব্যাগ ফেলিয়া আসে। সে যেখানে যেখানে উহা ভুলিয়া রাখার সম্ভাবনা সেখানে সেখানে অনুসন্ধান করে। এই প্রকারে চীনার ঘরে অনুসন্ধান করিতে গেলে চীনা ব্যাগে কত টাকা আছে জিজ্ঞাসা করে। লোকটির হিসাব ছিল তাহার ব্যাগে কত আছে এবং সে তৎক্ষণাৎ তাহা বলে। লোকটির কথার সহিত টাকার মিল হওয়াতে চীনা দ্বিধা না করিয়া ব্যাগটি তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। ব্যাগে তাহার প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। এই প্রকার সততার নানা পবিচয় উহাদের কাছে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত ট্যানারি ব্যতীত কলিকাতা সহরতলীতে ছোটবড় প্রায় তিন শত ট্যানারি আছে। ইহার মধ্যে যে সমস্ত ট্যান্যরিতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত হয় তাহাদের অধিকাংশের মালিক চীনা। কতকগুলিতে শুধু তলার চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী। আর কতকগুলিতে বার্নিশ-করা চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক অধিকাংশই মুসলমান।

বার্নিশ চামড়া এবং তলার চামড়া প্রস্তুত করিতে কলের সাহায্য না হইলেও চলিতে পারে বলিয়া ঐরূপ কোনও কারখানায় যন্ত্রাদি বিশেষ নাই। কিন্তু ক্রোম চামড়া যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সেইজন্য চীনাদের অধিকাংশ কারখানায় কল স্থাপিত আছে। এই সমস্ত কারখানা ট্যাংরা, পাগলাডাঙ্গার দক্ষিণ ভাগ এবং ধাপা অঞ্চলে স্থাপিত। দিনের বেলায়ও সেই সব লোকালয়বিহীন স্থানে যাইতে ভয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোনও কোনও চীনা মালিক কারখানায় সপরিবারে

বাস করে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা যেন সমস্ত ভুলিয়া শুধু অর্থের জন্য দুর্গম, জঙ্গলপূর্ণ জনহীন স্থানে পড়িয়া আছে। এরূপ একনিষ্ঠ পরিশ্রমশীল জাতি সচরাচর দেখা যায় না। যে-সমস্ত চীনা কারখানায় সপরিবারে আছে সে সমস্ত কারখানায় মালিকের পরিবারবর্গ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কারখানায় কুলীদের কার্য্যের তদারক করে, এমন কি কার্য্যের প্রণালী পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করে। ততক্ষণ পুরুষেরা অন্যান্য দরকারী কাজ করিয়া সময়েব সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থাগমের সাশ্রয় করে। নেহাৎ যে-সমস্ত কাজ পুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না, সেই সব কাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজই নারীরা করিয়া থাকে। উহাদের কারখানায় উৎপন্ন চামড়াও বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এই সমস্ত চামড়া বাজারে চীনা ক্রোম্ বলিয়া বিখ্যাত। অধিকাংশ জুতা (শতকরা ৮০ ভাগ) এই চীনা ক্রোম্ হইতে প্রস্তুত। কম দামী জুতার চাহিদা বেশী, কাজেই সেই কম দামী জুতা প্রস্তুত করিতে এই চীনা ক্রোম এবং চীনা জুতা প্রস্তুতকারক একান্ত দরকার। এই চীনা ক্রোমের যে শুধু কলিকাতায় কাট্‌তি হয় তাহা নহে, কলিকাতার বাহিরেও ইহা চলিত আছে। তবে ভারতের বাহিরে রপ্তানি কখনও হয় না, কারণ, চীনা ক্রোম্ উৎকৃষ্ট চামড়া নয়।

চীনা ক্রোম্ জুতার উপরকার সাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। জুতাব তলারকার জন্য যে চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার কারখানাও কলিকাতায় কম নহে। এই সমস্ত কারখানা বালিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ৪নং পুলের নীচেই অবস্থিত। ইহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী জাঠ মুসলমান। "বার্ক ট্যান্‌ড সোল" তৈয়ারির ব্যবসায় ইহাদের একচেটিয়া। একচেটিয়া হইবার একটি কারণ উহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। "সোল লেদার" প্রস্তুত প্রণালীও অতিশয় শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। সেই শ্রম একমাত্র পাঞ্জাবীরাই সহ্য করিতে পারে বলিয়া উহারা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে।

আর কোনও সম্প্রদায়কে এ কাজে দেখা যায় না। ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত তলার চামড়া বাজারে ৪নং সোল বলিয়া খ্যাত। কলিকাতার বাজারে যেমন ৮০% জুতার উপরকার সাজের চামড়ার জন্য চীনা ক্রোম ব্যবহৃত হয়, ঐরূপ ৮০% ভাগ জুতার তলাকার জন্য এই ৪নং সোল ব্যবহৃত হয়। চীনা ক্রোম্ যেমন ভারতীয় চামড়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় সুলভ ঐরূপ এই ৪নং সোলও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কাজেই জুতার বাজারেও সমস্ত সুলভ জুতাই এই চীনা ক্রোম্ ও ৪নং সোল দ্বারাই প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই জুতা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়।

আর এক প্রকারের সোল লেদারের প্রচলন আছে, উহা জলন্ধর সোল নামে খ্যাত। এই সোল লেদার পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর হইতে আমদানি করা হয়। তথায় উহা কুটীরশিল্প। অধিকাংশ পাঞ্জাবী চামার উহা বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। ঐ হাট হইতে ধনীরা ক্রয় করিয়া মজুত করে। পরে রপ্তানি করে। বাজার-দর এবং জিনিষ হিসাবে উহা ৫৫৲—৭৫৲ মণ বিক্রয় হয়। বলা বাহুল্য, কলিকাতার চামড়ার সব ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী মুসলমান। মজবুতি হিসাবে এই সোল লেদার খুবই ভাল। জুতা প্রস্তুত করিবার জন্য আর এক প্রকার সোল লেদার ব্যবহৃত হয়, উহাকে রোল্‌ড বা কম্‌প্রেস্‌ড্ সোল বলে। ইউরোপীয় দোকান এবং দুই একটি খ্যাতনামা দেশী দোকান ব্যতীত উহার ব্যবহার হয় না, কারণ উহার দাম খুব বেশী তবে জিনিষ হিসাবে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের গরীব দেশে সস্তা জুতার চাহিদাই বেশী, কাজেই সাধারণ জুতায় উহা ব্যবহার হয় না। এই প্রকার দামী সোল ভারতবর্ষের মধ্যে কানপুর ও মাদ্রাজেই বেশী প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় এক বার্ড কোম্পানী করিত। বর্ত্তমানে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগীয় ট্যানারিতে কিছু কিছু প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কলিকাতায় সহরতলীতে চামড়া প্রস্তুত ব্যাপারে তিনটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে চীনারা ক্রোম্ চামড়া প্রস্তুত করে, পাঞ্জাবীরা সোল লেদার প্রস্তুত করে। আর এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা বাঙ্গালী মুসলমান। ইহারা পাঞ্জাবী বা চীনাদের মত কোনও 'লাইন' আঁকড়াইয়া নাই। ইহাদের কেহ কেহ ভেড়ার ক্রোম্ পাকাই করিয়া আস্তরের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ গরুর ছাল পাকাই করিয়া হুড বার্নিশের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ সুটকেস্ লেদার প্রস্তুত করে। তবে উহাদের অধিকাংশই হুড বার্নিশ প্রস্তুত করে। এই হুড বার্নিশ্‌ড্ লেদারের কাটতি খুব বেশী, কারণ উহার তৈরি চটীজুতা এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথাও প্রস্তুত হয় না অথচ ঐ চটীজুতার প্রচলন সর্ব্বত্র খুব বেশী। কাজেই এই হুড বার্নিশ প্রস্তুত কলিকাতায় একটি বড় কারবার। বাংলা দেশে এই হুড বার্নিশের চটীজুতা শুধু পুরুষরাই ব্যবহার করেন, কিন্তু বাংলা ছাড়া পশ্চিমে এবং অন্যান্য দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে খুব বেশী ব্যবহার করেন। যেখানে যেখানে এই চটীজুতার ব্যবহার আছে (ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র) সে-সকল স্থানে এক কলিকাতা হইতে এডেন পর্য্যন্ত উহা রপ্তানি হয়। এখানে একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক যে, এই চটীজুতার রপ্তানিওয়ালা ধনীরা সবই পাঞ্জাবী মুসলমান।

পরিশেষে মাত্র দু-একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। ভারতবর্ষে যত-প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে এই ঘৃণিত চর্ম্ম যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ যে-সমস্ত চর্ম্ম এদেশে একেবারে প্রস্তুত হয় না, তাহা ব্যতীত অন্য চর্ম্ম আমদানী একেবারে বন্ধ। ইহাতে দেশের কিছু অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইতেছে, বরং রপ্তানি হইয়া দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিলাতী জুতা এদেশে আমদানী হইত, আজ কয়েক বৎসর

যাবৎ আর তাহা হয় না বলিলেও চলে। কদাচিৎ দু-একটি বিলাতী দোকানে সামান্ত রাখিতে দেখা যায়। বিলাতী দোকানের এবং বিলাতী স্ত্রী-পুরুষের জুতা ৯০% এদেশের প্রস্তুত। সুতরাং এই জুতার তরফ হইতেও বিবেচনা করিলে দেশে যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে। কাজেই এই শিল্পকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শিল্প বলা হইয়াছে। সৌখীন ইংরেজ আমাদের প্রস্তুত জিনিষের মধ্যে এক জুতা ব্যতীত আর অন্য কোনও জিনিষ বিশেষ ব্যবহার করেন না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক চটীজুতা ছাড়া, অন্য কোনও জুতা প্রস্তুত হইত না, তখন দেশের আপামর সাধারণের অবস্থার জন্যই হউক বা জুতার মূল্যাধিক্য বশতঃ হউক, জুতা পরিবার সুবিধা ছিল না। পরে এই একনিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী চীনা জুতা ব্যবসায়ী এদেশে জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করার ফলে দেশের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে জুতা ব্যবহার করিবার সুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী জুতার আমদানিও বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেশে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হইয়াছে। তবে চীনাদের দেশে বেশ কিছু টাকা চলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের লোক যদি চীনাদের স্থলে আসিত, তবে আক্ষেপ হইত না, কিন্তু ভারতবর্ষে চীনাদের মত অধ্যবসায়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক দেখিতে পাই না।*

সম্প্রতি "হরিজন উত্তোলন" কার্য্যে ব্রতী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতে তত্রস্থ ভাগাড় ইজারা লইয়াছেন। তিনি অসামান্য কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া কয়েক জন মাত্র বাঙ্গালী যুবক আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রাসায়নিক, এই কারণে চীনা অপেক্ষা

* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সালের প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত। এই প্রবন্ধের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তথ্য কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের "সুট-অল কোং"-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান নিখিল রায় চৌধুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভাল পরিষ্কৃত চর্ম্ম (Tanned leather) প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই চর্ম্মে প্রস্তুত জুতা আমাদের খাদি-প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় হইতেছে। যাহাতে পাড়াগাঁয়ে পরিষ্কৃত চর্ম্ম সাধারণে প্রস্তুত করিতে পারে, এই জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না। যদিও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে অতি সামান্য বাসা খরচ (৫৲ টাকা মাত্র) দিয়া শিক্ষানবীশ-দিগকে রাখা হইবে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাহাতে তেমন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ টাকায় কলম পেশা করিয়া আজীবন কাটাইবে কিন্তু এই "ঘৃণিত" কাজ শিখিবে না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ২।৩ বছরে চীনারা ঢাকা সহরে তাহাদের ব্যাবসা-ক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বে কয়েকজন মুসলমান দোকানদার পাইকারী হিসাবে কলিকাতা হইতে জুতা আমদানী করিত, কিন্তু চীনারা (স্ত্রী ও পুরুষ) স্বয়ং যাইয়া ১৫।১৬ খানা জুতার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, সমস্ত বাঙ্গালী দোকানদারগণ ক্রমশঃ উৎখাত হইতেছে। কারণ এই প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারিতেছে না।

সর্ব্বশেষে অতি হীন অবস্থা হইতে বহু ক্রোড়পতি হইয়াছেন এমন একজন জুতা ব্যবসায়ীর নাম করিব। চেকোশ্লোভাকিয়া দেশের বিখ্যাত বাটা (Bata) আজ পৃথিবীময় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন। কোন্নগরে ইহার বিরাট কারখানা। আজ কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে ইহার দোকান ও শো-রুম। জুতার ব্যবসায়ে ইনি ক্রমশঃ অক্টোপাসের ন্যায় কলিকাতা সহরকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিতেছেন। ইনিও প্রথম জীবনে সামান্য জুতার কাজ করিতেন, যোগ্যতাগুণে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় অ-বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বে বহুবার আমি বাংলার বেকার শিক্ষিত যুবকদের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছি। তাহাদের কথাই আমি প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিতেছি এবং সেই সমস্যার সমাধানকল্পে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি। এই কার্য্য করিতে যাইয়া কিছু দিন হইতে আমার মনোযোগ আর একটি নূতন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা আজ শুধু আমার নহে, বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর পরাজয় এবং অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাংলার অর্থনৈতিক রাজ্য অধিকার, এই বিষয়টি আজ কেহই জোর গলায় বলিতে পশ্চাৎপদ হন না। আমি আমার "আত্মচরিতে" এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—সে আজ নিজদেশে পরদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবিকার্জ্জনের সকল ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী আজ বিতাড়িত, অ-বাঙ্গালী তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। কলিকাতার প্রায় কোনও ব্যাবসাই আজ আর বাঙ্গালীর হাতে নাই; মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বোম্বাইওয়ালা, দিল্লীওয়ালার দল ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীকে সকল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী যুবকদের দল তাহাদের বাড়ীতে কেরাণী ও সরকারগিরি করিবার জন্য আজ ব্যাকুল হইয়াছে। যখন কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাজপথ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বা সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর মধ্য দিয়া গমনাগমন করি, তখন আমার মনে কি হয় জানেন? দেখি পথের দুইধারে বড় বড় ৫।৭ তলা বাড়ী উঠিয়াছে। ঐ সকল বাড়ীর মালিক শতকরা একজনও বাঙ্গালী কি না সন্দেহ, কলিকাতা বাংলার সহর কি না, সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাকে সেন্ট্রাল এভিনিউ

দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয় বলিয়াই আমি শুধু ঐ পথটির কথা বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার সকল পথেই ঐরূপ আজ অ-বাঙ্গালী অধিবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চল আর কিছুদিন পরে পাঞ্জাবের সহর কি না তাহা চেনা যাইবে না। পাঞ্জাবীরা ঐ অঞ্চলের বহু বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। ভবানীপুর কালীঘাটের প্রত্যেক পথেই পাঞ্জাবী নরনারী ও বালক-বালিকা দেখা যায়, তাহারা ঐ অঞ্চলে বাস করিয়া কলিকাতায় নানাপ্রকার ব্যাবসা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আমি অ-বাঙ্গালী সমস্যার কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গালী যে সকল ব্যাবসা করে, তাহাতে অর্থ উৎপাদন হয় না, এই কথাটি আমি ভাল করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে বুঝাইয়া দিতে চাহি। গভর্ণমেণ্টের চাকর, উকীল, ডাক্তার বা স্কুল মাষ্টার কেহই অর্থ উৎপাদন করে না। তাহারা একরূপ পরগাছা, পরের অর্থ শোষণ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। বাংলা দেশে বহু ধনী জমিদার ছিল, তাহাদের ধ্বংসের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া দেখায়। ভাগাড়ে একটা মরা গরু পড়িলে যেমন বহু শকুনি তাহার উপর পড়িয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে তাহার দেহ হইতে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ এক একটা জমিদারবাটীতে বিবাদ বাধিলে উকীল, ব্যারিষ্টারের দল শকুনির মত তাহার উপর পড়িয়া সেই জমিদারের অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকে। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি উকীলদিগকে দোষী বলিতেছি না, উকীলগণ যে অর্থ উৎপাদন করে না, তাহাই দেখাইয়া দিতেছি। একটি বড় জমিদার ধ্বংস হইলে তাহা হইতে ১০ ঘর মধ্যবিত্ত ধনী গজাইয়া উঠিয়া থাকে। ডাক্তারদিগের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ব্যাবসা করে, তাহারা প্রকৃতই

অর্থ উৎপাদন করে। বাংলা দেশে যে পাট উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সমস্তই চট ও থলে হইয়া বিদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। তাহার ফলে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকা এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধিকেই আমি অর্থ উৎপাদন করা বলিতেছি। পাট বিক্রয় করিয়া বাংলা দেশ বিদেশ হইতে কত টাকা আনিয়া থাকে তাহা শুধু ১৯৩০ সালের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। ঐ বৎসরে আমরা পাট বিক্রয় করিয়া এক শত কোটি টাকা পাইয়াছিলাম। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।"

শুধু পাটের ব্যবসায়ের কথাই আমি বলিয়াছি। এদেশে বহু প্রকার উৎপাদক ব্যাবসা চলিতেছে এবং নূতন সহস্র সহস্র প্রকার ব্যাবসাও আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সকল বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি এখনও অবহিত হয় নাই। অ-বাঙ্গালীর দল আসিয়া কিভাবে বাঙ্গালীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং সে বিষয়ে পূর্ব্বেই আমি অনেক কথা বলিয়াছি। বিষয়টি বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে বলিয়া আমি বার বার ঐ একই কথা বলিয়া থাকি।

ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী

চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে মাড়োয়ারীর ছেলে ব্যবসায়ে পাকা হইয়া উঠে এবং বাজারের নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান রাখে ; ব্যাবসা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে লোক-চরিত্রও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে। তাই কাহারও সহিত দুই একদিন কারবার করিলেই সে বুঝিতে পারে যে, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দেওয়া সঙ্গত কি না। ফলে, সে সহজে কাহারও নিকট প্রতারিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে ধীরে ধীরে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন। "There is no royal road to learning" অর্থাৎ পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের কোনও সহজ সুগম পথ নাই। ব্যাবসা-ক্ষেত্রেও ইহা সত্য—এখানেও ফাঁকি চলে না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী যুবক কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ব্যাবসা ফাঁদিয়া বসে এবং প্রতারিত হয়। প্রথম হইতেই খরিদ্দার আসিয়া প্রলোভন দেখায়, এবং বলে—"মহাশয়, জিনিষ ধার দিন, মাসকাবারে মাহিনা পাইলেই টাকা শোধ করিয়া দিব"। এমন কি বেশী মুনাফা দিয়াও ক্রয় করিতে তাহারা ক্রটী করে না। এই প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া যুবক দোকানদার ধার দিতে থাকে। কাজেই ক্রমান্বয়ে অনেক টাকাও বাকি পড়িতে থাকে এবং পরিশেষে সে দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মাড়োয়ারীকে এ প্রকারে ঠকান যায় না ; কারণ, সে পূর্ব্ব হইতেই পাকা হইয়া ব্যাবসা আরম্ভ করে এবং ধারে মাল ছাড়িলেও দেনাদারের দোর চাপিয়া বসে—তাহার হাত এড়ান সহজ নয়।

অনেক বাঙ্গালী যুবক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, ব্যাবসা করিব, মূলধন কোথায় ?" অভিজ্ঞতালাভই মূলধনের প্রধান অঙ্গ—

তদপেক্ষাও বেশী প্রয়োজন বিশ্বাস-অর্জ্জন। এবিষয়ে মাড়োয়ারীগণ আদর্শস্থানীয়। ইহারা ব্যাবসা উপলক্ষে মহাজনের নিকট টাকা বা মাল ধার লইলে তাহা নিরূপিত কিস্তি-মত শোধ করিবেন—কোন প্রকারেই কিস্তি খেলাপ করিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একজন মাড়োয়ারী সত্য সত্যই "লোটা কম্বল" সম্বল করিয়া ব্যাবসার সূত্রপাত করে এবং পৃষ্ঠদেশে মাল লইয়া ফেরী করিয়া বেড়ায়। মধ্যাহ্নকালে কোন বৃক্ষতলে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া এবং 'ছাতু' দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া পুনরায় ফেরী করিতে বাহির হয়। কিন্তু আমাদের কোন যুবক ৫০০৲ টাকা ধার করিয়া ব্যাবসা আরম্ভ করিলেও শেষে দেখা যায় যে, সে আসল ভাঙ্গিয়া কিছুদিন পরে গা-ঢাকা দিয়াছে। তাহার যদি এক মোট কাপড় বড়বাজার হইতে মফঃস্বলের কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিতে হয়, তবে ইহাতে তাহার কি প্রকার ব্যয় হয়, তাহার একটা আভাষ দিতেছি। আমাদের যুবকগণ পৃষ্ঠদেশে একমণ বোঝা বহন করিতে অপারগ—পারিলেও লজ্জায় তাহা করিতে কদাচ রাজী নন। প্রথমতঃ, রিক্সা করিয়া বড়বাজার হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছাইতে অন্যূন ছয় আনা লাগে, তাহার পর সেখান হইতে মাল লগেজ করিয়া নিজের টিকিট কিনিয়া গন্তব্য ষ্টেশনে অবতরণ করেন। সেখান হইতে ষ্টীমারে মাল লইতে হইলে পুনরায় ষ্টীমার ভাড়া, মুটে ভাড়া ইত্যাদি, অধিকন্তু ষ্টীমার-ঘাট হইতে গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে আরও কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। এই ভাবে মাল আসে—কিন্তু শ্রীমান্‌গণের আবার মাড়োয়ারীদের ন্যায় ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই; সুতরাং একখানি দোকানও ভাড়া করিতে হয়। দোকান হইলেই চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সরঞ্জামও চাই—এবং একা দোকান চালান অসম্ভব; কাজেই একজন সহকারী অন্ততঃ একটি ভৃত্যেরও প্রয়োজন হয়। এই প্রকারে তাহার খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়। সুতরাং খুচরা বিক্রয় করিতে হইলে তাহার জোড়া প্রতি অন্যূন দুই

আনা বেশী না হইলে চলে না। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাড়োয়ারী অনায়াসে চারি পয়সা বেশীতে মাল ছাড়িতে পারে, কাজেই সে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই প্রকার সখের ব্যাবসা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাই আমাদের যুবকগণ ধারে মাল লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেও দিন দিন মূলধন খোয়াইয়া ফেলেন এবং মহাজনের টাকা শোধ দিতে না পারিয়া 'পুনর্মূষিক' হইয়া আইন পড়িতে আসেন, অথবা কেরাণীগিরির খোঁজে বাহির হন।

আমি অনেক ভদ্রলোক এবং ব্যাবসাদারের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে ধারে মাল দেওয়া বিপজ্জনক, দিলে টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া দিতে হইবে। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, "Don't treat money matters with levity, money is character" অর্থাৎ মানুষের চরিত্রগত পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত অর্থের ব্যবহার করিলে। একথা অত্যন্ত সত্য। আমার আত্মচরিতে এবিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালী যুবকের ব্যবসায়ে পরাজয়ের কারণ তাহার সততার অভাব। আমার জনৈক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র (M. Sc.) একটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি কিছুদিন ছুটি লইয়া জার্ম্মানী হইতে ব্যবহারিক রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন এবং এখানে একটি ছোট-খাটো tannery এবং তৎসংলগ্ন জুতার দোকান খুলিয়াছেন। কাজকর্ম্ম এক রকম ভালই চলিতেছিল, কিন্তু তিনি সেদিন আমার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সমস্ত দিন আমাকে কলেজে থাকিতে হয়; কাজেই সহকারী-রূপে দুই তিন জন আত্মীয় যুবককে ব্যবসায় গ্রহণ করি এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। তাহারা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" কয়েক মাস পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন

যে, তাঁহার এক পুত্র M. B. পাস করিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছেন। একজন বেকার যুবক প্রায়ই তাঁহার নিকট নিজ দুরবস্থার বিষয় জানাইত; একদিন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটি সুবিধা করিয়া দিতেছি। আমার ছেলের ডাক্তারখানায় অনেক প্রকার প্রসাধন-দ্রব্য সর্ব্বদাই থাকে; এ অঞ্চলে বহু ভদ্রলোকের বসতি হইতেছে, অথচ এ সব জিনিষের দোকান বড একটা নাই। আমি তোমাকে ডাক্তারখানা হইতে দশ পনর টাকার জিনিষ লইয়া দিতেছি—তুমি সেগুলি গৃহস্থ-বাড়ীতে ফেরী করিয়া টাকা ফেরৎ দিলে পুনরায় মাল পাইবে। এই প্রকারে যাহা লাভ হইবে তাহাতে আপাততঃ তোমার চলিয়া যাইবে।" যুবকটি বলিল, "মহাশয় আমি ভদ্রসন্তান, এই সকল মাল ঝুড়িতে করিয়া বহিলে বড খারাপ দেখায়।" সুট্‌কেশে ভরিয়া লইলে ভদ্রতার উপর আঘাত হইবে না বুঝিয়া তাহাকে একটি ছোট-খাটো সুট্‌কেশও দেওয়া হইল; কিন্তু যুবকটি মাল সমেত সুট্‌কেশ লইয়া সেই যে অন্তর্দ্ধান হইল, আর ফিরিল না। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের এইরূপ অসততার প্রমাণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ন্যাশানাল ট্যানারীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বি, এম, দাস আমাকে একটি বিবরণ দিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলেন যে, গত কয় বৎসরে তাঁহাকে প্রায় এক কোটী টাকার লেন-দেন করিতে হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পশ্চিমা মুসলমান ও জাঠদের সহিত। সামান্য কিছু লেন-দেন বাঙ্গালীর সহিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার সময় প্রায় প্রত্যেক বারই তাঁহাকে মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে, অথচ পশ্চিমাদের জন্য একবারও তাঁহাকে আদালতে যাইতে হয় নাই।

উপরিলিখিত ঘটনাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, বাঙ্গালী কেন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ, তাহার উপযুক্ত

শিক্ষানবিশী হয় না, সেইজন্য সব দিকেই তাহার গলদ থাকে, দ্বিতীয়তঃ একটু ধাক্কা খাইলেই সে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং হাত-পা ছাড়িয়া দিয় আবার কেরাণীগিরির খোঁজে বাহির হয়। মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যাবসা দারগণ কি ভাবে ব্যাবসা আরম্ভ করে, তাহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহারা দুই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পশ্চাদ্‌পদ হয় না এবং সহজেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে, কারণ, গোড়া হইতে চাল-চলন অতিশয় সাদাসিধা—দুই আনা হইতে চারি আনার মধ্যেই ইহারা দিন যাপন করিতে পারে। অধিকন্তু, ইহাদের সততা প্রশংসনীয়—ইহারা কখনও কিস্তি খেলাপ করে না, তাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহাজন ইহাদিগকে ধারে মাল ছাড়িয়া দেয় এবং উৎসাহও দিয়া থাকে। আমি জানি অনেক ব্যবসায়ীর কিস্তি কাল-বৈশাখীর ঝড়ে মারা গিয়াছে। আমাদের দেশে এ সব কারবারে বীমাপ্রথা থাকায় মালিক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ছিন্নবস্ত্রে কলিকাতায় মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি "কুছ পরওয়া নেই" বলিয়া পুনরায় তাহাকে মাল দিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কেন আজ বাঙ্গালী দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এ ভাবে চলিলে ভবিষ্যৎ যে কি দাঁড়াইবে, ধারণা করা যায় না। বেকার-সমস্যা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং অনেকে অন্নাভাবে—নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিতেছে। এ-সকল দেখিয়া শুনিয়াও আবার সেই একই জীবন-ধারায় বাঙ্গালী জাতি গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা বিদেশীরা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে দৃকপাতও নাই—ঐ বৃথা ডিগ্রীর মোহে ধাবিত হইয়া ভবিষ্যৎ যে কিরূপ অন্ধকার, তাহা এখনও বুঝিল না।

আমি নিজে বাঙ্গালী—তাই বাঙ্গালী জাতিকে আমি অন্তরের সহিত

ভালবাসি! যে সমস্ত কারণে বাঙ্গালী জাতি এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে অন্ন-সমস্যার সমাধানে অপারগ হইয়া সকল ক্ষেত্র হইতে দিন দিন বিতাড়িত হইতেছে, তাহা তন্নতন্ন করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছি। যাহাতে 'মা-লক্ষ্মী'দের নিকট আমার বার্ত্তা পৌঁছায়, সেইজন্যই বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে আমার প্রবন্ধগুলি নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতেছি।

আজ (১৭ই ফাল্গুন) প্রুফ দেখিবার পরেই সংবাদপত্র উল্‌টাইতে পর পর দুইটি সংবাদের উপর নজর পড়িল, যথা—

(১) বেকার সমস্যার পরিণতি—১৩৲ টাকা বেতনে এম, এ, পাশ কেরাণী।

ত্রিবান্দ্রম, ২৯শে ফেব্রুয়ারী—

এখানকার ষ্টেট্ মিলিটারী সার্ভিসে জনৈক এম-এ, এল্-টি মাসিক ১৩৲ বেতনে সিপাহীর-কেরাণী পদ গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যক্তি দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের একজন খ্রীষ্টান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই শত উপাধিধারী যুবক এই চাকুরীর জন্য আবেদন করে। সেই দুইশত আবেদনকারীর মধ্য হইতে এই ব্যক্তিকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।—ইউনাইটেড্ প্রেস

(২) **VARSITY EXAMINEES**

Number Shows Increasing Love For Education

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যে শিক্ষানুরাগের পরিচয়।

প্রথম সংবাদটি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উচ্চশিক্ষায় অভিলাষী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কিরূপ আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছেন তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বাঙ্গালী কোথায় গেল

আজ ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ আমি বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন চাঁপাতলা গোলদীঘির ধারে ও অখিল মিস্ত্রী লেনের সম্মুখের বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। তখন ইহা অবশ্য শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হয় নাই। পটলডাঙ্গার ন্যায় প্রকৃতপক্ষে এখানে দীঘি ছিল। এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছুতারপাড়া অবস্থিত ছিল, এখনও ছুতারপাড়া লেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এতদ্ভিন্ন অখিল মিস্ত্রীর গলির পূর্বাঞ্চলেও অনেক ছুতারের বসতি ছিল; ছুতারপাড়া ও এ-সকল অঞ্চলে হিন্দু ছুতারগণ নানাবিধ কাঠের কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত এবং এই সকল স্থান জম্‌জম্ করিত। আজ কলিকাতায় হিন্দু ছুতার খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যাহা বাঙ্গালী মুসলমান ছুতার আছে, তাহারাও সংখ্যায় দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহারা হাওড়া, আমতা অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু তাহারা চীনা ছুতারগণের সহিত প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে এবং সংখ্যায় কমিতেছে।

সেই সময় কলিকাতায় যাবতীয় গোয়ালা বাঙ্গালী হিন্দু ছিল। আমাদের যে দুধ যোগান দিত, সেও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ!" আজ বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় সংখ্যায় কয়জন?

ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যত বড় বড় কাঠের গোলা ছিল সে সমস্তই ছিল বাঙ্গালীর কারবার। এইগুলি প্রায়ই নিমতলায়

অবস্থিত ছিল। চাঁপাতলাতেও কিছু কিছু ছিল ও আছে। তাহার মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারকনাথ প্রামাণিকের গোলাগুলি উল্লেখযোগ্য। আজ কলিকাতার যাবতীয় বড় বড় কাঠের গোলা মাড়োয়ারীগণের করায়ত্ত। কেবল ৺মহেশচন্দ্র কোলের পুত্রগণ ও অপর দুই চারি জন তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের মান রক্ষা করিতেছেন। আজ কলিকাতার যাবতীয় রজক পশ্চিমদেশীয়। বাঙ্গালী কোথায় গেল? আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী নাপিতেরও সংখ্যা দিন-দিন হ্রাস পাইতেছে, পশ্চিমারা তাহাদের স্থান দখল করিতেছে। সে সময় কলিকাতায় যতগুলি বাজার ছিল, সে সকলে সর্ব্বত্র বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী বিরাজ করিত। আজ যদি কেহ বাঙ্গালীটোলায়—এমন কি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যান ত দেখিবেন, পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। বিশেষতঃ আলুর মহাজনী ব্যাবসা মাড়োয়ারী ও পশ্চিমাগণের একচেটিয়া। নৈনীতাল, দার্জ্জিলিং, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু জন্মে, তাহা দাদন দিয়া এই শেষোক্ত অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা করতলগত করিয়াছেন। তখন কলিকাতায় মুদী ও ময়রার দোকান সমস্ত বাঙ্গালীদিগের হাতে ছিল। আজ দেখা যায়, যত বৃহদায়তন মুদীখানা—যেখানে ঘি, চিনি, ময়দা খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয় হয়, সমস্তই অ-বাঙ্গালীর দ্বারা অধিকৃত। আর দাল-কলাইয়ের ত' কথাই নাই; আহিরীটোলায় পাইকারী ও বাঙ্গালীটোলায় খুচরা কারবার সমস্তই অ-বাঙ্গালীর।

কলিকাতায় যত পাচক ও ভৃত্য আছে, তাহার শতকরা ৯৫ জন হয় পশ্চিমা না হয় উৎকলবাসী—ইহারা মফঃস্বল সহরে গিয়াও ঢুকিয়াছে। যত পাল্কির বেহারা সমস্তই হয় উড়িয়া না হয় পশ্চিমা। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে ও ষ্টীমার-ঘাটায় যাবতীয় কুলি পশ্চিমা। গঙ্গার ঘাটে, এমন কি নৈহাটী, শ্যামনগর প্রভৃতির ঘাটেও যত মাঝিমাল্লা সমস্তই

অ-বাঙ্গালী। বাংলায় এই প্রকার নানা ব্যবসায়ে ও রোজগারে প্রায় বাইশ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। ফলকথা, আমার আত্মচরিতে হিসাব দিয়াছি যে, যাবতীয় অ-বাঙ্গালী বাংলা দেশ হইতে নিজ প্রদেশে প্রতি মাসে গড়ে ১০ কোটি এবং বৎসরে ১২০ কোটি টাকা প্রেরণ করে। ইহা শুনিলে অনেকে হয়ত স্তম্ভিত হইবেন, কিন্তু সত্য গোপন করিলে মন কি প্রবোধ মানিবে?

কলিকাতার সমস্ত অলি-গলি ও বড় রাস্তার উপর পান, বিড়ি প্রভৃতির দোকান—যাহা সংখ্যায় কয়েক সহস্র হইবে, তাহার দুই একটি ছাড়া সবই অ-বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। এই পানের দোকান—যেগুলি প্রশস্ত রাস্তার ধারে, সেইগুলিতে বরফ, লেমনেড ও সরবৎ গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহার এক একটি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিয়া অবাক হইয়াছি, দোকানীরা প্রত্যহ এক সরবৎই বিক্রয় করে এক শত, দেড় শত টাকার। এখন মাছের ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত পশ্চিমা, উড়িয়া, মাড়োয়ারীরা নামিয়াছে। মাছ অবশ্য জেলেরা ধরিয়া আনে; কিন্তু ইহারা ধনী (capitalist) হিসাবে সেই সব মাছ পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার ষ্টেশনে বরফ ভর্ত্তি করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেছে।

ভবানীপুর অঞ্চলে পাঞ্জাবীগণের বড় বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মোটর-পরিচালন ও মোটর মেরামতি করতলগত করিয়াছে। তা ছাড়া ইলেকৃট্রিক ফিটিংও পাঞ্জাবীগণের একচেটিয়া। এই কলিকাতায় পাঁচ-সাত হাজার পাঞ্জাবী এই প্রকার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের হোটেলখানা ও ধোপা-নাপিত, মুদিখানা—সমস্তই পাঞ্জাবীর। এমন কি, শুনিতেছি ডাক্তারও পাঞ্জাবী। ইহারা বাঙ্গালীর কোন তোয়াক্কাই রাখে না। জল, ড্রেন, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগে যাবতীয় মিস্ত্রী উড়িয়া—একটিও বাঙ্গালী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর কেরাণীগিরি অন্ততঃ একচেটিয়া ছিল ; ইহাদিগের মুখের গ্রাস মাদ্রাজীরা আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। একজন মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট অম্লানবদনে পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেরাণী—বিশেষতঃ টাইপরাইটারী হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সঙ্গে পাইলে বাঁচিয়া যায়। কারণ, ইহাদের মাসিক খোরাক সাড়ে চার টাকার উপর হইবে না, একটু 'রসম্'—মানে তেঁতুল-জল, লবণ ও পাতলা ঘোল হইলেই যথেষ্ট ; হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে তাহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। এখন কলিকাতায় অন্ততঃ পাঁচ-সাত হাজার মাদ্রাজীর উপনিবেশ আছে। ইহাদিগের স্বতন্ত্র দোকানপাট, মায় স্কুল পর্য্যন্ত আছে। কলিকাতায় হাতীবাগান অঞ্চলের তেলের কলগুলিও বহুলাংশে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

ইহা ত হইল খুচরা ব্যাপারের কথা। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল এবং অনেক বড বড় মহাজনী ব্যাবসাও বাঙ্গালীর হাতে ছিল। তখনও বড় বড হৌসের অনেকগুলি মুৎসুদ্দিগিরি পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর আয়ত্ত ছিল। কিন্তু আজ সমস্ত বড়বাজার অঞ্চল—এমন কি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত। অধিক কি, এ-সমস্ত জমির মালিকানা স্বত্বও বাঙ্গালীর হাত হইতে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আর এই অঞ্চলে বৎসরে যে কোটি কোটি টাকার আমদানী রপ্তানী হইতেছে, তাহার শতাংশের এক ভাগও বাঙ্গালীর আছে কিনা সন্দেহ।

এই ত গেল কলিকাতার কথা। সমস্ত বাংলা ও আসাম জুড়িয়া যত ধান, পাট, সরিষা, ভুষিমাল—এমন কি, সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ব্যবসায়,—তাহা য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারীর একচেটিয়া। তাহা ছাড়া যত আমদানী মাল, যথা—বিদেশী ও বোম্বাইয়ের কাপড়, কেরোসিন তেল, লবণ, লোহা ইত্যাদি সমস্তই অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া চলে। কলিকাতার যাবতীয় ব্যাঙ্কে প্রত্যহ লাখ লাখ টাকার হুণ্ডী, চেক, ড্রাফট ইত্যাদির

আদান-প্রদান হয়, তাহাও মূলতঃ বাঙ্গালীর হাত দিয়া নহে। বেল পাকিলে কাকের কি? হায়, হতভাগ্য বাঙ্গালী! ইহার শতকরা কয়টা অংশ তোমার, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি কেবল এই সব ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনে M. A., B. L., B. T. হইয়া কেরাণীগিরি পাইলেই বর্তিয়া যাও।

এবার সারা বাংলাদেশে ফসলের কালে তিনমাস যাবৎ অনাবৃষ্টি বশতঃ প্রায় শতকরা ৫০।৬০ ভাগ ধান হয় নাই। ইহার ফলে ধানের দর গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কাজেই রেঙ্গুন হইতে লাখ লাখ মণ ব্রহ্মদেশের চাউল আমদানী হইতেছে। ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজে এই চাউল আসে এবং মাড়োয়ারীরা ইহা রপ্তানী করে ও সমস্ত বাংলা দেশে চালান দেয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে এই চাউলের ব্যবসায়ে কয়েক কোটি টাকা অ-বাঙ্গালীরা রোজগার করিবে—"কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ।" হিসাব মত,—যাহা সকল দেশে হইয়া থাকে—বাঙ্গালী যদি এই চাউল আমদানী ও রপ্তানী করিত তাহা হইলে অন্ততঃ দেশের কতক টাকা দেশে থাকিত। কিন্তু ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ বলিয়া এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এক বৎসরেই তাহাকে কয়েক কোটী টাকা হারাইতে হইবে।

কেন বলি

১৯০৯ সালে 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে প্রথম দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীকে মনের দুঃখে কিঞ্চিৎ রূঢ় সত্যকথা শুনাইয়াছিলাম, সেদিন হইতে প্রায় সিকি শতাব্দী অতীত হইয়াছে, আমার দুঃখ আজিও ঘুচিল না—বাঙ্গালী আজিও সচেতন হইল না। বার বার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিহ্বায় জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দ্দশার একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্দ্ধক্যের জড়তায় বিলীন হইতে বসিল—তথাপি বাঙ্গালী কিন্তু জাগিল না! আমার মুখে একঘেয়ে নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙ্গালী-নিন্দুক বলিয়া আমার অখ্যাতি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয়, তবু আমি দুর্ম্মুখের মত কথা বলিতে ছাড়ি নাই। সে কি বাঙ্গালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙ্গালী, 'সুজলা সুফলা' বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙ্গালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর করিয়া দাঁড়াক, ইহাই আমি নিরন্তর কামনা করি। আমার এই আন্তরিক কামনাই আমাকে কটুভাষী করিয়াছে। ১৯০৯ সালে যাহা বলিয়াছিলাম, ১৯৩৩ সালে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি—"হয়ত আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সেই সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় দারুণ দুরবস্থাজনিত দুঃখই আমাকে ঐরূপ বলাইয়াছে।"

আমি যাহা বলি, তাহা মোটেই নূতন নয়, অত্যন্ত পুরাতন, অত্যন্ত সাধারণ কথা; বার বার শুনিতে শুনিতে যদি চৈতন্য হয়, সেই জন্যই বলি। আমি নিরাশ হই নাই, হইলে মূক হইয়া থাকিতাম। আমি

জানি এই হতভাগ্য জাতিই একদিন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে, আপনাকে জানিবে। চির-অমঙ্গলভাষী আমি, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। মৃত্যু উঁকি দিতেছে, তাহার শুভাগমনের পূর্ব্বে কি আমার আশা পূর্ণ হইবে না ?

একটা কথা, আমি জানি বিদেশী ও স্বদেশী ডিগ্রীধারী বাঙ্গালীরা আমার প্রতি অপ্রসন্ন,—আমি ডিগ্রীবিরোধী বলিয়া। এই সকল প্রবন্ধেও গ্রাজুয়েটদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছি। আমি ইহা সত্যসত্যই বিশ্বাস করি, বাঙ্গালীর পক্ষে ডিগ্রীর কোনই সার্থকতা নাই। চাকুরীতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ডিগ্রী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞান-চর্চ্চা অগস্ত্যযাত্রা করে, সহজবুদ্ধিতে সে ডিগ্রীর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। এই ডিগ্রীর মোহ বাঙ্গালীর ক্ষতি করিয়াছে এবং সে মোহ আজিও কাটে নাই।

সে দিন আমাদের ময়দান-ক্লাবে* একজন শ্রদ্ধেয় বিচক্ষণ সভ্য বলিলেন, "একটা ব্যাপার আপনারা কেউ লক্ষ্য করেছেন কি-না জানি না কিন্তু আমি দেখেছি—বাঙ্গালী ছেলে, যুবা, প্রৌঢ়, বুড়োরা যখন একত্র হয় এবং কোনও বৃদ্ধ কোন প্রৌঢ়কে কোনও হুকুম করেন, প্রৌঢ়ব্যক্তি সে কাজ নিজে না ক'রে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কোনও যুবককে পাল্টে সে হুকুম দেন এবং যুবকটিও তার চাইতে কম বয়সের কোনও ছোকরাকে দিয়ে সেই হুকুম তামিল করিয়ে নেবার সুযোগ ছাড়ে না।"—আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, আমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা আছে। মনে পড়িল, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে অবস্থানকালে আমিই একবার এই কারণে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলাম। একটি জরুরী চিঠি ছিল,

---

*কলিকাতা ময়দানে লর্ড রবার্টস্-এর মূর্ত্তির নীচে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণের পর আমরা কয়েকজন সমবেত হইয়া নানা বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করি। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া আমাদের এই ক্লাব চলিতেছে।

সেই দিনই তাহা ডাকে না দিলেই নয়। গ্রামের স্কুলের একজন গ্রাজুয়েট-শিক্ষককে ষ্টীমার-ঘাটের ডাক-বাক্সে চিঠিটি ছাড়িয়া দিতে বলিলাম, কিন্তু পরদিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম, চিঠি ডাকে যায় নাই। শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং ষ্টীমার-ঘাট পর্য্যন্ত যাওয়ার কষ্ট স্বীকার না করিয়া একটি ছাত্রকে চিঠিটি দিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। ফলে যাহা হইবার হইয়াছে।

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্য অনেক কথাও আমার মনে পড়িতে লাগিল। কাজে ফাঁকি দিবার, যতক্ষণ সম্ভব কর্ত্তব্যকে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি যেন বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। একটা ঘটনাব কথা মনে আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি গ্রীষ্মকালে একমাস করিয়া নিজগ্রামে অতিবাহিত করিতাম। তখন আমার কাজ ছিল, খুলনা জেলায় যেখানে যেখানে স্কুল-কলেজ আছে, দুই একদিন করিয়া সেই সব জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানো। সব স্কুলেরই তখন অবকাশ। ছেলেদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহারা দ্বিপ্রহরে আষাঢ়াস্ত বেলা কাটায় কি করিয়া। বিশেষ যে সদুত্তর পাইতাম তাহা নয়! নিদ্রাদেবীই সাধারণতঃ ইহাদের অনেকের অনেক দুশ্চিন্তাই হরণ করিয়া থাকেন। এই মোহিনীর বিরুদ্ধে কি করিয়া অভিযান করা যায় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলাম। আমাদের গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয় আছে, সুতরাং দুই চারজন গ্রাজুয়েটের অভাব ছিল না, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটও ছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর বেলা একটা নাগাদ, এই সকল গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, স্কুলের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া আমার আহ্বানে আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইত। আমি বিদ্যার তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে কাজের ভার দিতাম। ইংরাজী সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চ্চা করিবার ভার এক একজনের উপর পড়িত; এক একজন গ্রাজুয়েটের অধীনে একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের অধীনে ১ম শ্রেণীর

ছাত্র, ১ম শ্রেণীর ছাত্রের অধীনে ২য় শ্রেণীর ছাত্র, এইভাবে কাজ চলিত। কার্য্যবিভাগ করিয়া দিয়া আমি অন্তরালে নিজের ঘরে চলিয়া যাইতাম। নিভৃতে অবসরযাপন নিতান্ত প্রিয় হইলেও ভাগ্যে তাহা ঘটিত না। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর অত্যন্ত সন্তর্পণে বৈঠকখানা ঘরের দরজার ছিদ্রপথ দিয়া এই সকল শিক্ষক-ছাত্রদের পড়া-পড়া-খেলা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিতে আসিতে হইত। নানা মনোহর দৃশ্যে আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইত; প্রথমবারে, দুই একজনের মৃদু নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইত, লক্ষ্য হইত, অন্য দুই একজন অহিফেনসেবীর মত ঝিমাইতেছে। আরো আধঘণ্টা পরে —নাসিকাধ্বনি প্রবল, যাহারা ঝিমাইতেছিল তাহারাও নীরব নহে। সেনাধ্যক্ষ, উপসেনাধ্যক্ষ এবং পদাতিক প্রায় সকলেই এক পথের পথিক হইয়াছে, কদাচিৎ এক আধজনকে বই হাতে শ্মশান জাগিতে দেখা যাইত।

কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান সুরু করিলাম। এই সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহরের অবসরযাপন গ্রামের ছেলে-বুড়া, প্রৌঢ়-যুবারা কি ভাবে করিয়া থাকে তাহার খোঁজ লইতে লাগিলাম। দুই ইতিহাস কোথায়ও শুনিতে হইল না, মাত্রা এবং প্রণালীর যা পার্থক্য;—নিদ্রাদেবীর সেবা ইহারা সকলেই করিয়া থাকেন। জীবনের মহামূল্য সময়ের এক তৃতীয়াংশ, অধিকাংশ পল্লীবাসী বাঙ্গালীই নিরুপদ্রব নিদ্রার সাধনায় কাটাইয়া দেয়। সর্ব্বত্রই এই এক ইতিহাস, শুধু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা নয়, বালকেরাও এই সর্ব্বনেশে অভ্যাসের দাস। নিদ্রাভঙ্গের পর ফোলা ফোলা চোখ মুছিতে মুছিতে সমবয়স্কদের আড্ডার খোঁজ করা, সেখানে রাজা-উজীরমারী গল্প অথবা তাস-পাশা-দাবার শরণাপন্ন হওয়া—ইহাই হইল পল্লীবাসী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা এবং অন্যান্য কঠিন সমস্যা যাহার খুশী সমাধান করুক, বাঙ্গালী হইয়া জন্মিবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের দিনের বেলাতেও না ঘুমাইলে চলিবে কেন?

পাড়াগাঁয়ের এইরূপ একটি ছেলেকে লইয়া পরীক্ষাকার্য্যে আমি আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি। ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে—অবস্থা-বৈগুণ্য হেতু গ্রামে সে একপ্রকার অর্দ্ধাশনেই দিন কাটাইত। একজন আমার নিকট তাহাকে আনিয়া দিল। কলিকাতায় লইয়া আসিয়া তাহাকে একটি কারখানায় জুড়িয়া দিলাম। আশা হইল যে, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের আহারের পর দুই তিন মাইল হাঁটিয়া বাড়ী-কারখানা করিতে করিতে এবং চার পাঁচ ঘণ্টা কারখানার ফাইফরমাস খাটিতে খাটিতে দিবানিদ্রার নেশা সে পরিহার করিবে। সপ্তাহের কাজের ছয় দিন (week days) বাধ্য হইয়াই সে তাহা করিতেছে বটে কিন্তু যেই রবিবার আসিল, সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই নাকে মুখে ভাত-ডাল গুঁজিয়া আমাদের কলেজের* চিলেকোঠায় সে অন্তর্দ্ধান করে, সেখানে সারি সারি ছাত্রদের শয্যা সজ্জিত থাকে, তাহারই একটাতে পড়িয়া ছয়দিনের মৌতাত সুদে আসলে উশুল করিয়া লয়।

এই মজ্জাগত আলস্যই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে—আলনাস্কারের মত কাজের ফাঁকেই সে দিবা-স্বপ্নে মগ্ন হইয়া কাজ পণ্ড করিতেছে; কুড়েমির এই জড়ত্ব তাহার দেহ ও মন উভয়ই নষ্ট করিল। ইহা হইতে সে কবে মুক্ত হইবে জানি না, তবে আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, এই আলস্য পরিহার না করিলে বাঙ্গালী জাতির মুক্তি নাই, যতদিন এই সর্ব্বনেশে নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিবে ততদিন তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। অনেকে বলিবেন, বাংলা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। কিঞ্চিৎ দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানে প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের আহারের পর আধ ঘণ্টা কালের একটু মৌতাতে যে স্বাস্থ্যহানি হয় না বরঞ্চ যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম

* ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়ান্স।

করেন তাঁহাদের পক্ষে তাহা কাজের অনুকূলই হয়, ইহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু মাত্র আধ ঘণ্টার বেশী হইলেই তাহা ক্ষতিকর এবং গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য ঋতুতে আধ মিনিটের বিশ্রামও অনাবশ্যক। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও দিবা-নিদ্রা যে আয়ুক্ষয়কারী পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া নিশ্চয়ই লিখিত। বাংলা দেশের পল্লীগুলি যে প্রাণশক্তি হারাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই দিবা-নিদ্রা। পল্লীগ্রামে যদি এই সামরিক আইন জারি করা যায় যে, কেহ অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবের মত একটা বিপ্লবই বাধিয়া যাইবে।

ফল কথা, এই নিদারুণ আলস্যই বাঙ্গালী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সর্ব্বনাশের মূল কারণ। কাজ না করিবার অজুহাত তো অনেক শুনিয়া থাকি কিন্তু কাজ করিবার স্পৃহা দেখিতে পাই কই? অনেক যুবক আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ করেন, মহাশয়, ব্যাবসা করিব, মূলধন পাইব কোথায়? আমি সেই সকল প্রশ্নকারীর এক একজনকে মাঝে মাঝে সঙ্গে লইয়া ময়দানে বেড়াইতে যাই, পথে রাজাবাজারের মোড় হইতে বরাবর চৌরঙ্গী লেড্‌লর বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে যতগুলি পানবিড়ির দোকান আছে তাহা গণনা করিতে বলি। তাহাকে জানাইতে বাধ্য হই, এই কলিকাতা সহরেই অন্যূন কয়েক হাজার পান-চুরুট-বিড়ি ও মিঠাপানির দোকান আছে কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর দোকান নাই—ভুলক্রমে এক আধটা বড় জোর থাকিতে পারে। যে সকল লোক এই সকল দোকান চালায় তাহারা অবশ্য বেহারা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এই কার্য্যের জন্য উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েটের আবশ্যক নাই। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষিত আর কয়জন? পাঁচ কোটীর মধ্যে বড় জোর ৩০ লাখ। বাকী সকলেই কি খাইয়া-পরিয়া সুখে আছে? তাহাদের

মধ্য হইতেই বা পানের দোকান করিবার লোক পাওয়া যায় না কেন? এই ব্যবসায়ে মূলধন বেশী লাগে না। যেটুকু জায়গায় ইহাদের দোকান তাহার ভাড়া মাসে সাধারণতঃ দেড় টাকা, দুই টাকার বেশী নয়, অবশ্য সদর রাস্তার মোড়ে ভাড়া বেশী। ইহারা যে কেবল পান-চুরুট-বিড়ি সোডা-লেমনেডই বেচে তাহা নয়, গ্রীষ্মকালে সরবৎ বেচিয়াও বেশ দুপয়সা অতিরিক্ত আয় করে। লক্ষ্য করিয়াছি, ঠেলাগাড়ী করিয়া ভর্ত্তি সোডা লেমনেডের বোতল দিয়া খালি বোতল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কোম্পানীই করে, তাহার জন্যও বিশেষ মূলধনের আবশ্যক হয় না। সুতরাং মূলধনের অজুহাতটাই বড় অজুহাত নয়। আসলে শ্রমবিমুখতা ও আলস্যই অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালীর পরাজয়েব প্রধান কারণ। আমার আত্মচরিতে 'সময়ের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার' শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, একজন মানুষ সাধারণতঃ যতটুকু কাজ করে নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপে কাজ করিলে অন্যূন তাহার দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। আমার প্রাত্যহিক জীবন এই নিয়মেরই অধীন। এ বিষয়ে বলিতে গেলে সত্যই আমাব ধৈর্য্য থাকে না এবং বলিতেও আমি কখনও নিবৃত্ত হইব না।

কুড়েমির পরেই গদীয়ান ভাব বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গদীয়ান-ভাব শুধু যে সহরগুলিতেই লক্ষ্য করিয়াছি তাহা নয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং বাংলা দেশের অন্যান্য নানাস্থানে, সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে লক্ষাধিক মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—সর্ব্বত্রই এই গদীয়ান-ভাবের আধিক্য দেখিয়াছি। তাহার ফলে, বাঙ্গালী গদীয়ানদের হাত হইতে বাংলার প্রায় সমস্ত ব্যাবসাই অ-বাঙ্গালীদের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল বড় বড় গঞ্জে পূর্ব্বে সাহা, তিলিরা কাঁচামাল অর্থাৎ পাট, সরিষা, কলাই ইত্যাদির ব্যাবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল এখন মাড়োয়ারীরা সে সকল স্থানে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া

এই সকল 'গদীয়ান' বণিকদের ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে। এখানে 'গদীয়ান' কথাটা একটু প্রণিধানযোগ্য। জাতিভেদ-প্রথাবশতঃ বহু শত বৎসর ধরিয়া গন্ধবণিক, তিলি, তামিল, সাহা, কপালী প্রভৃতি জাতিরা বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালিত করিত। পয়সার গরমে তাহারা এই সকল ব্যবসায়িক শিক্ষার ধার বড় একটা ধারিত না। ব্যাবসা একচেটিয়া হওয়াতে ব্যাবসা সংক্রান্ত পরিশ্রমও তাহারা বড় একটা করিত না। বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের হাতে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া তাহারা আমীরি চালে গদীয়ান হইয়া বসিত। এদিকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণ জাতিও এই সকল 'হীন' কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে লজ্জা পাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত উপাধিধারী যুবক এই সকল সহজ ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া 'হা অন্ন', 'হা অন্ন' করিয়া দ্বারে দ্বারে চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিতেছে, উপবাসে দিন কাটাইয়া দিতেছে। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াও অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইতেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্রে এইরূপ দুই একটি নিদারুণ ঘটনার কথা দেখিতে পাই।

যতদিন রেলওয়ে ষ্টীমারের বহুল বিস্তৃতিতে বাংলা দেশের পথঘাট তেমন সুগম হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ বাংলা দেশ একপ্রকার স্বতন্ত্রই (isolated) ছিল ততদিন এই সকল গদীয়ান মহাজনদের রাজত্ব অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল, তাহারা গদীয়ানের চালেই দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিতে পারে না। যেই যাতায়াতের সুবিধা হইল, আট দশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের লোক কলিকাতা আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে দরিদ্র কৃষকদের দাদন দিয়া একটির পর একটি ব্যাবসা অধিকার করিতে লাগিল, তখনও গদীয়ানদের চক্ষু ফুটিল না; তাহারা তখনও লম্বোদর হইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া হুকুম চালাইতে লাগিল। মালপত্র অল্পবেতনভোগী ভৃত্যের মারফতে বেচাকেনা হইতে

লাগিল—সে পয়সার লোভে যথেচ্ছাচার সুরু করিল। ফলে ফাঁকা গদীয়ানত্ব থাকিল কিন্তু ব্যাবসা মরিল।

কিন্তু মাড়োয়ারী গদীয়ানরা কখনও এরূপ করে না, পরের উপর কেনাবেচার গুরুভার ন্যস্ত করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত নয়। এ বিষয়ে তাহারা এতই চৌকস যে সামান্য খুঁটিনাটির ব্যাপারেও লক্ষ্য স্থির রাখিতে তাহাদের কখনও ভুল হয় না। ঠিক চরকির মত তাহারা ঘোরে, এখানে ওখানে সর্ব্বত্র নিজে উপস্থিত থাকে।

আমার কথার প্রমাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার ফরিদপুরের অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে বলি। পাটের ব্যবসায়ে অবাঙ্গালীদের হাতে বাঙ্গালীদের পরাজয় কি প্রকারে সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে ১৮,৮৬০ জন বাঙ্গালী পাটের মহাজন ছিল; ১৯৩১ সালের সেন্সাসে এই সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া ৩,৮৯৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইভাবে চলিলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই কয়েকজনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

যখনই এ সকল গদীয়ান মহাজনদের সন্তানেরা কলিকাতার প্রেসিডেন্সী প্রভৃতি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ছাপ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তখনই তাহাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়াচ পাইয়া এই সকল শ্রীমানেরা রাতারাতি এমনই লায়েক হইয়া উঠিতে লাগিল যে, বাপ-পিতামহের গদীতে বসিয়া ব্যবসায়-কর্ম্ম করাটাকে তাহারা অত্যন্ত হীন কাজ বলিয়া গণ্য করিল। পুরাতন অসৎ আমলাদের উপর ব্যাবসা-পরিচালনের ভার পড়িল—গদীয়ান-পুত্রেরা কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়া বাবুগিরি করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের বুলি হইল, টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও। টাকাও আসিতে লাগিল, সুতরাং জাহান্নমের পথে রীতিমত অগ্রসর হইতে তাহাদের দুই এক বৎসরের অধিক সময় লাগিল না।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। কয়েক বৎসর হইল, ভাগ্যকুলের তিলি সম্প্রদায়ের একজন জমিদার মহাজন আমাকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক পুত্র বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তাহাকে বিলাত পাঠানো উচিত কিনা সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, দোহাই, আর যাই করুন, ছেলের এই খেয়াল পরিতৃপ্ত হইতে দিবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আপনাদের ব্যাবসা ভাল চলিতেছে, ইহার কি আরও শ্রীবৃদ্ধি করা চলে না? বিদেশীয়দের দৃষ্টান্ত দেখুন, কলিকাতার এণ্ড্রু ইউল, রেলী ব্রাদার্স, গিলাণ্ডার্স প্রভৃতি যে সকল বড় বড় ফার্ম্ম, তাহারা তো উত্তরোত্তর তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার করিয়াই চলিয়াছে; আপনার ছেলেদের এই সদিচ্ছাটা হয় না কেন? ব্যারিষ্টারী করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের জাগে কেন?

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে অনেক গদীয়ান মহাজনের সন্তানেরা বিলাত-ফেরত হইয়া আসিয়া আর হাটখোলা অঞ্চলের সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বসবাস করিতে পারিতেছে না; চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়া সংসার-খরচ দুনো না করিলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতেছে না। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এইভাবে বাংলার সমস্ত অন্তর্বাণিজ্য এই সকল হাটখোলার মহাজনদের হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে এবং বাংলার চরমতম দুর্দ্দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে।

আমার কথা শেষ হয় নাই, আমার জীবিতকালে আমার কথা শেষ হইবে কিনা জানি না। এতদিকে এত আঘাত খাইয়াও বাঙ্গালীর চৈতন্য কি হইবে না?

ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা

যদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রকৃত স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিলেও বিদ্যার্জ্জনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে করুন, কোন একটি ছাত্রকে মাইনর বা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়াইয়া কোন বড় দোকানদার অথবা একজন ব্যাবসাদারের নিকট শিক্ষানবিশ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলেই যে সেই সময় হইতে তাহার বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, ইহা মনে করা ভুল। আমার আত্মচরিতে "সময়ের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। মনে করুন, আপনার ছেলে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে কোন একটি বড় দোকানে প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ বেলা ১০টা হইতে ৫টা বা ৬টা পর্য্যন্ত তাহাকে হাজির থাকিতে হয়। আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যুষে প্রায় ৫টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করি, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অন্যূন আধ ঘণ্টা কাল সবেগে বেড়াইয়া থাকি; পরে সামান্য কিছু প্রাতরাশের পর ৬টা-৬॥ টার সময় হইতে অধ্যয়নে নিরত হই, এবং সওয়া আট-টার মধ্যেই যাহা কিছু গুরুতর বিষয়ের অধ্যয়ন, তাহা শেষ করি। ধরুন, ছেলের বয়স ১৪ বৎসর; সুতরাং তাহার অন্যূন ৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। সে যদি ৯টায় শয়ন করে এবং ৫টার সময় শয্যাত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। সে-ছেলে প্রত্যহ অন্ততঃ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পড়িতে পারে। যদি এই হিসাবে আত্মচেষ্টায় পড়াশুনা করে, এবং কোন বিষয় দুর্জ্ঞেয় হইলে অপরের নিকট হইতে সাহায্য লয়, তাহা হইলে সে বৎসরের পর বৎসর এই প্রকারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে আপনার ছেলে একজনের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

পর নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইল, এবং আপনি তাহাকে একখানি ছোট দোকান করিয়া দিলেন। সে দরকার হইলে ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোকানে রহিল। প্রায় দেখা যায় যে, দ্বিপ্রহর হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত খরিদ্দারের সমাগম খুব কম। যদি বাড়ীতে সেরূপ পড়ার সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে সে এই তিন ঘণ্টাকাল বেশ পড়াশুনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে। আসল কথা এই যে, ব্যবসায়ে ঢুকিলে যে লেখাপড়ার পথ রুদ্ধ হয়, ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা।

আমি অনেক স্থলে কার্নেগীর কথা বলিয়া থাকি। বাল্যকালে তাঁহাকে কঠোর দারিদ্র্যের ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি সমস্ত দিনের গুরুতর পরিশ্রমের পর রাত্রিতে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সেকস্‌পীয়ারের একখানি নাটকের অভিনয় দেখেন এবং ইহা তাঁহার এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তিনি এই সময় হইতে মহাকবির নাটকাবলী পড়িবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার মত সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। এমন সময় কোন সহৃদয় প্রতিবেশী তাঁহার পাঠাগারের পুস্তক সর্ব্বসাধারণকে পড়িতে দিতে ইচ্ছুক হন। কার্নেগী এই পুস্তকালয় হইতে সেকস্‌পীয়ারের নাটকাবলী সংগ্রহ করিয়া কেবল যে কণ্ঠস্থ করিলেন, তাহা নহে, মজ্জাগত করিলেন। তাঁহার আত্মচরিতে দেখা যায় যে, তিনি প্রায়ই এই মহাকবির পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিণামে তিনি সাহিত্যিক হিসাবেও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি কেবল মার্কিণ দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান লৌহকারখানার মালিক ও ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এইবার বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন-এর আত্মচরিত হইতে কিছু বলিব। ইহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। চর্ব্বির বাতি তৈয়ারী করিয়া কোন রকমে দিন গুজরান করিতেন। বেঞ্জামিনও বাল্যকালে তাঁহাকে এই

কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন; কিন্তু এই অবসর সময়ে আত্মচেষ্টায় পড়াশুনা করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। পুস্তক কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না; দুই একজন পুস্তক-বিক্রেতার সহিত ভাব করিয়া সন্ধ্যার পর তাহাদের নিকট হইতে এক একখানি পুস্তক, পরদিন দোকান খুলিবার পূর্ব্বেই প্রত্যর্পিত হইবে এই সর্ত্তে ধার করিয়া আনিতেন। কাজেই তাঁহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হইত। ইনি প্রথমে কম্পোজিটারের কাজ করিতেন, পরিণামে নিজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ হইতে যদি কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই তক্‌মা উপার্জ্জন করিয়াও যথেষ্ট সময় থাকে। সে সময়টা যে কোন এক ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে পারা যায়। উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রায় ৪।৫ মাস, কলেজে ৬ মাস, এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে প্রায় ৭ মাস ছুটি থাকে। আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের ১৫ই মার্চ্চের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায় এবং আবার ১৫ই জুলাই-এর পূর্ব্বে কলেজে ক্লাস খোলা হয় না। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যথা, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড, ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা মুসোলিনী, জার্ম্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিট্‌লার ও সোভিয়েট রাশিয়ার ষ্টালিন প্রভৃতি সকলে অতি হীন অবস্থা হইতে কুলি-মজুরের কাজ করিয়াও আত্মচেষ্টায় অধ্যয়ন করিয়া এই সকল উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছেন। কস্মিন কালেও ইহাদের কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। অন্যস্থলে আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দেশেও এইরূপ যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতের অর্থনীতি, বিনিময় (Exchange), মুদ্রানীতি (Currency) ইত্যাদি

ক্ষেত্রে যাহারা মানুষ বলিয়া গণ্য তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিরলা, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, নারায়ণদাস কল্যাণজী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সব প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই যে আজন্ম নিরেট মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভুল ধারণা। যাহার শিখিবার ইচ্ছা আছে, তাহার পথ সদাই প্রশস্ত কিন্তু আমাদের দেশে পাস করার মোহ এত অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে যে, ডিগ্রীলাভ করাই যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহা হস্তগত হইলে বোধ হয় শতকরা ৯৫ জনও আর পুস্তকের ধার ধারেন না।

বাঙ্গালী যুবকগণ কেন ব্যাবসা-ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। প্রথমতঃ মা-বাপের উৎপীড়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপধারী হওয়া চাই ; তখন তাহার জীবনের ২০।২২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, নূতন কিছু শিখিবার আর উৎসাহ বা আগ্রহ নাই এবং পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে সে বিভোর। আমি অনেকগুলি কল-কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ! যদি কোনও গ্রাজুয়েটকে কোন বিভাগে লওয়া যায় এবং তাহাকে বলা হয় যে, শিক্ষানবিশীকালে কিছুদিন অল্প ভাতা লইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে কার্য্য শিক্ষা কর এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিলে তোমাকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠিতে হইবে, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ৫।৭ দিন তিনি এই প্রকার ঘুরিয়া ফিরিয়া বলেন যে, এ কাজ তো আমার শেখা হইয়া গিয়াছে, এইবার নূতন কোনও কাজ দিন, অথবা যে-বিভাগে আমি ঘোরাঘুরি করিয়াছি, সেই বিভাগে মোটা বেতনে একটি চাকুরী করিয়া দিন। বলা বাহুল্য যে, এই বিভাগে সম্যকভাবে কাজ শিখিতে হইলে তাহার অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর শিক্ষানবিশী করা আবশ্যক। শুধু আমেরিকা ইংলণ্ড কেন, এদেশেও অনেকে একটি মশলার দোকানে ঝাড়ুদার হইয়া বা সামান্য কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরে সেই ব্যবসায়ে অংশীদার হইয়াছেন বা

অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই ব্যাবসা স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় India Council-এ মেম্বার ছিলেন; একদিন তিনি তাঁহার একজন সহযোগীকে (colleague) কোনও বাঙ্গালী যুবককে Banking শিখিবার জন্য apprentice লইতে অনুরোধ করেন। India Council-এ অর্থনীতিজ্ঞ, বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট, দুই একজন মেম্বার সর্ব্বদাই থাকেন। এই যুবকটির সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ভূপেনবাবুকে বলিলেন, "করিয়াছেন কি? যুবকটি জঁাকাল রকম উপাধিধারী এবং তাহার বয়সও ২১।২২ বৎসর। এ-বয়সে আমাদের দেশে শিক্ষানবীশ (Apprentice) লওয়ার প্রথা নাই। আমাদের এখানে স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে সার্টিফিকেট (School Final Certificate) লইয়া ১৩।১৪ বা বড় জোর ১৬ বৎসব বয়সে প্রবেশার্থী কোন Bank-এ ঢুকিয়া দরকার মত ঘর ঝাঁট দেয়, পিওন হইয়া চিঠিপত্র বিলি করে এবং অবসর মত এক একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর নিকট বসিয়া কাজ শিখিয়া থাকে। এই প্রকারে সে পরিশেষে উপযুক্ত হইলে ব্যাঙ্কের এক বিভাগে অল্প বেতনে ঢুকিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে, এবং ১৪।১৫ বছর পরে সেই বিভাগের কর্ত্তা হইয়া থাকে।" আমাদের দেশেও এই কারণে যাঁহারা বংশানুক্রমে ব্যাবসা করিয়া আসিতেছেন. যথা সাহা, তিলি, গন্ধবণিক, কপালী ইত্যাদি—তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি এই প্রকার ৮।১০।১২ বছর বয়স হইতেই আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, আর মাড়োয়ারী বা ভাটিয়াদের ত কথাই নাই।

কলেজ-শিক্ষিত যুবক কেন এত অপদার্থ হয়—তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। ইহাদের প্রথম হইতে লম্বা-চওড়া নজর দেখা যায়। অনেক সময় পৈতৃক যথাসর্ব্বস্ব লইয়া, কখনও বা শ্বশুরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা সংগ্রহ করে। ইহাদের ব্যাবসা করা মানে, সহরের সদর জায়গায় আগে একটি আপিস্ খোলা—সেখানে আবার চেয়ার টেবিল সাজান

চাই—বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি ত বটেই, আবার সময় সময় মোটর গাড়ীও থাকে। কিন্তু তিনি যে গোড়ায় গলদ করেন, তাহা তাঁহার মাথায় প্রবেশ করে না।

শুধু যুবকদিগকে দোষ দিলে কি হইবে? তাহাদের অভিভাবকগণও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বাহ্য আড়ম্বরকে ইহারা ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। শ্রীমান্‌দের কোনও অভিজ্ঞতা নাই অধিকন্তু পূর্ব্বে বর্ণিত শিক্ষানবিশীর অভাবে কোথায় কোন্ জিনিষ কি দরে কিনিতে হয় এবং কাহার নিকট সেই জিনিষ বেচিতে হয়, তাহারও কোন খোঁজ-খবর রাখে না, সুতরাং, ব্যাবসা-ক্ষেত্রে ইহারা কতকগুলি লোকের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়া দাঁড়ায়।

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা বোনার ল' স্কুলের শিক্ষা অন্তেই ব্যাবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, কিন্তু অবসর মত অধ্যয়নাদি করিয়া কিরূপে ভবিষ্যজীবনে রাজনীতি-বিশারদ হন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহারও পূর্ব্বে রক্ষণশীল দলের অপর নেতা W. H. Smith ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন

আজকাল Back to the village অর্থাৎ পল্লীতে ফিরিয়া যাও, এই ধুয়া প্রায় সর্ব্বত্রই উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কি প্রকার বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বাল্যকাল হইতে আমাদের বালক ও যুবকেরা যে ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সহরের আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল জীবনযাপনে তাহারা বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে। পল্লীগ্রামে সাদাসিধা ভাবে থাকিয়া কি প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি।

৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে, আমরা যাহাকে ভদ্রশ্রেণী বলি, তাহার ত প্রায় সকলেই পল্লীতেই সুখে বাস করিতেন। প্রত্যেকেরই প্রায় ধেনোজমি ছিল। তাহাতে সম্বৎসরের খোরাক হইত এবং অতিরিক্ত কিছু বিক্রয় করিয়া নুন, তেল, কাপড় প্রভৃতি অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের সঙ্কুলান হইত। ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি জিনিষ ধানের বিনিময়ে বা এওজে মিলিত। কামার, কুমার প্রভৃতি যাহাদের জমি ছিল না তাহারা মুদ্রার পরিবর্ত্তে গোলা হইতে ধান মাপিয়া লইত। পাটনীর পারানি লাগিত না; পূজা পার্ব্বণের সময় চাষীর নিকট হইতে ধান, গুড় ইত্যাদি লইত এবং সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট হইতে কাপড় ও কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে মিলিত। গৃহস্থেরা কলুর নিকট সরিষা দিয়া তেল ভাঙ্গাইয়া লইত এবং কলুকে তেল ও খইলের নির্দ্ধারিত অংশ দিত। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বনিয়াদী ঘর তাঁহারা চাকরাণ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন যাহার ফলে পূজা পার্ব্বণের

সময় মুচি বা ঋষিরা আসিয়া বাড়ীর উঠান ও চারিদিক কোদাল দিয়া সাফ করিয়া দিত। ধোপা বারমাস কাপড় কাচিত এবং বারুই পান যোগাইত। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের নিষ্কর জমি দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া পৌরোহিত্য করিতেন অর্থাৎ নগদ পয়সার বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। বলা বাহুল্য যে, তখন প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরে পল বা বিচালির গাদা থাকিত। গোচারণের মাঠও তখন ঘেরাও হয় নাই সুতরাং ২।১টা বা ততোধিক গাভী রাখিতে কষ্ট হইত না। প্রচুর দুগ্ধ মিলিত। নদী, পুকুর, খাল, বিল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ পাওয়া যাইত এবং অনেকেই উহা ধরিয়া খাইত। এখনও অনেক পাড়াগাঁয়ে বয়স্কা জেলে বউরা ডালিতে মাছ লইয়া পল্লীর ভিতর ফেরি করিয়া বিক্রয় করে এবং পয়সার বিনিময়ে ধান ও চাউল লয়; কেননা জেলেরা চিরকালই ভূসম্পত্তিহীন। ইহা ছাড়া বিকালে ঝি-বউগণ পাড়া পড়শীর মেয়েদের সহিত মিলিত হইয়া চক্রাকারে বসিয়া চরকার গুণগুণ শব্দের সহিত গান করিতে করিতে সূতা কাটিত—

চরকা আমার স্বামীপুত
চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী॥

তখন সামান্য ২।৪ পয়সা দিলেই তাঁতিরা খদ্দর বুনিয়া দিত। ইহাই তখন পরিধেয় বস্ত্র ছিল। সুতরাং তখন মোটাভাত মোটাকাপড়ের কোনও দুঃখ ছিল না। তখন আরও একটা প্রথা বিদ্যমান ছিল; উহা ধানের "বাড়" দেওয়া অর্থাৎ চাষীরা অভাবের সময় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গোলা হইতে ধান মাপিয়া লইয়া যাইত এবং ফসল হইলে সুদ সমেত দেড়া শোধ দিত। এখনও এই শেষোক্ত প্রথা বিদ্যমান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশেও এই প্রকার বিনিময়ের প্রচলন ছিল। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ নর্ম্যান্ এঞ্জেল (Norman Angell) তাঁহার "মুদ্রার কাহিনী" নামক পুস্তকে বলিতেছেন :—

"This great Empire was still carrying on most of its business on a basis of barter like that which prevailed in Babylon in the days of the Arabian merchants. And so it did to the dawn of the 20th century."

প্রাচীন চীনদেশে যেরূপ বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকাতেও সেইরূপ ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিনিময় প্রথার বহুল ব্যবহার চলিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আব্রাহাম লিনকল্‌নের বাল্যকালে মুদ্রার ব্যবহার এত বিরল ছিল যে, সারাজীবনে মুদ্রা দেখে নাই এরূপ বহু লোকের সাক্ষাৎ মিলিত।

নর্ম্যান্ এঞ্জেল (Norman Angell) অপর এক গ্রন্থে বলিতেছেন :—

"Forty years ago, Japan did not want work, so simple was the form of civilization that had been evolved in the past centuries. The people got along very well on a sweet potato, varied on holidays with rice, but once, having been drawn into the maelstrom of the feverish Western industrial civilization, they departed further and further from the simple old practices—and now, they want work. They must work, or they starve. It was not always so."

"If you go into a certain mountain region of Vermont you may come upon the empty house and buildings of a large farm which has been simply abandoned by its owners. It could be acquired to-day at the cost of the small taxes due upon it. There are many such cases in

New England and the Maritime Provinces of Canada. Yet once that abandoned soil supported in relative affluence a large family consisting of the parents, thirteen children, and two "poor relations." It supported them in comfort, though the tools they used to wrest their sustenance from nature were crude and primitive to the point of barbarism compared with the tools available for our use. Where we use steam and electricity, harvesters, tractors, separators they used human muscle, the yoked oxen, the flail, and the scythe. Yet they were all well-fed, well-housed, well-warmed. Want, in the physical sense, was unknown. The farm was practically self sufficing..............................

...........Why were the twentieth century generation, with their superior tools, greater power over the forces of nature, and immensely greater productiveness, less secure of livelihood—whatever other advantages they might enjoy—than their Vermont farmers with their all but barbaric equipment ?

"What had happened was that producer and consumer were no longer one. The producer was no longer his own market, knowing exactly what that market required and would require. Co-ordinations of needs to be supplied and means of supplying them, of jobs needing to be done and workers to do them, which in Vermont had been completely under control, had, by the elaboration of the division of labour, got beyond control. When, in Vermont, wheat or maize was planted and harvested, the family knew, since it was mainly for their own consumption, that their labour would not be wasted, that they could count upon its "sale" (to themselves) at a remunerative "price." But in the Dakotas, when ten years'

savings were invested in planting some two or three thousand acres of wheat, with costly machinery to be paid for from the money proceeds, something happening in Paris or Moscow or Buenos Aires might render the value of the crop less than the sum spent in harvesting and planting it.........The equilibrium necessary to ensure the remunerative value of his crops was utterly beyond the twentieth century farmer's control.

"সুপ্রাচীনকাল হইতে জাপানে যে সরল বাহুল্যবর্জ্জিত সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহার কল্যাণে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও সেখানকার অধিবাসীরা আধুনিক যন্ত্রযুগের পরিভাষায় কাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার জন্য লালায়িত ছিল না। কয়েকটি মিষ্ট আলু ও পর্ব্বদিনে তাহার সহিত চারিটি ভাত—ইহাই ছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত আহার্য্য-তালিকা। কিন্তু কালক্রমে যান্ত্রিক সভ্যতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সেই সনাতন সরল অভ্যাস তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে 'কাজ চাই' 'কাজ চাই' বলিয়া রোল উঠিতেছে—কাজ না পাইলেই উপবাস ও অনশনের বিড়ম্বনা। কিন্তু এ অসহায় অবস্থা চিরকাল ছিল না।"

"উত্তর আমেরিকার ভারমণ্টের (Vermont) পার্ব্বত্য অঞ্চলে গেলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু বিস্তীর্ণ গোলাবাড়ী জনমানবহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মাত্র মালিকের প্রাপ্য বকেয়া খাজনার (tax) পরিমাণ মূল্য দিলেই হয়ত সেগুলি ক্রয় করিতে পারা যায়। নিউ ইংলণ্ড (New England) এবং ক্যানাডার যাবতীয় সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অথচ এমন দিন ছিল যখন ঐ সকল পরিত্যক্ত খামারে এক একটি সুবৃহৎ পরিবারের সুখে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। এক এক পরিবারে হয়ত কর্ত্তা, গৃহিণী, বারো তেরোটি সন্তান সন্ততি,—চাই কি, দুই একটি দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্বেরও

আশ্রয় মিলিত। জমির ফসলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত, তবে আধুনিক যুগের কৃষিজীবীর সহিত তাহাদের পার্থক্য এই যে, যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে আপন আপন অশন বসন আহরণ করিত বিংশ শতাব্দীর তুলনায় সেগুলি ছিল নিতান্ত আদিম ও বর্ব্বরযুগসুলভ। কৃষিকার্য্যে আমরা সাহায্য লই বাষ্প ও বিদ্যুতের, ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে, জমি চষিতে, শস্য ঝাড়িতে সকল বিষয়ে আমরা যন্ত্রসর্ব্বস্ব; পক্ষান্তরে তাহাদের সম্বল ছিল সবল বাহু, যোয়ালে জোড়া বলদ, শস্য ঝাড়িবার সেই সনাতন কাষ্ঠখণ্ড এবং শস্য কাটিবার পুরাতন কাস্তে। অথচ তাহাদের অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য ছিল, বাসগৃহে আরাম ছিল, শীতের প্রকোপে অগ্নিসেবার অভাব ছিল না। অশন-বসন প্রভৃতি শরীরগত কোন সুখেই তাহারা বঞ্চিত ছিল না। এই সকল খামার জনাকীর্ণ বাজার-ঘাট হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকিলেও কোন কষ্টের কারণ ছিল না, কারণ জীবনধারণের যাহা কিছু উপকরণ সকলই ইহাতে উৎপাদিত হইত।

* * * * *

"উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যাহার সহায়, পঞ্চভূত যাহার অখণ্ড প্রতাপ মানিয়া চলে, যাহার যাদুমন্ত্রে বসুন্ধরা বহু শস্যপ্রসবিনী—বিংশ শতাব্দীর সেই শক্তিমান পুরুষ যে অন্ন-সমস্যার সমাধানে বিপর্য্যস্ত, ভারমণ্টের বর্ব্বরপ্রায় ক্ষেত্র-স্বামীর নিকট তাহা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—এ পার্থক্যের মূলে কি রহস্য নিহিত আছে দেখিতে হইবে।

"উৎপন্ন দ্রব্য যখন উৎপাদকেরই ব্যবহারে ব্যয়িত হইত তখন সমস্যা ছিল সরল। ক্ষেত্রে যে ফসল হইত তাহা ক্ষেত্রস্বামী ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটাইত, উৎপাদককে অপর কাহারও চাহিদার কথা ভাবিয়া চলিবার দরকার হইত না। কিন্তু কালক্রমে এই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল। যখন বাজারের চাহিদা মিটাইবার প্রশ্ন উঠিল অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হইল। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ

বাড়াইতে বেতনভুক্ মজুর নিযুক্ত হইল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর চাই, সুতরাং কর্ম্মবিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। সংসারের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ, সে প্রয়োজন মিটাইতে পরিমিত পরিশ্রম, পরিমিত সঞ্চয় ও ব্যয় দরকার। কিন্তু বাজারের প্রয়োজন কোন নির্দ্দেশ মানিয়া চলে না। তাহার উঠা ও নামা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। দশ বৎসরের সঞ্চিত পুঁজি খাটাইয়া দুই বা তিন হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইল, বহু অর্থ ব্যয়ে উন্নত ধরণের কলকব্জা বসানো হইল এই ভরসায় যে, ফসলের বিনিময়ে ঐ অর্থ দ্বিগুণ হইয়া ফিরিবে, কিন্তু হঠাৎ সুদূর প্যারী, মস্কো বা বুয়েনস্ আয়ারে এমন কিছু ঘটিয়া বসিল যাহাতে সকল হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হইয়া গেল; ফসলের বাজার দর এরূপ মন্দা হইল যে, উৎপাদনের মূল্যও উঠিল না, লাভ হওয়া ত দূরের কথা। এইরূপ অনিশ্চিত এবং অসহায় অবস্থার সহিত বিংশ শতাব্দীর কৃষিজীবীকে সংগ্রাম করিতে হয়। সে প্রভূত পরিশ্রম করিতে পারে, বহু অর্থ ঢালিয়া বহু লাভের আশা ও দাবী করিতে পারে, কিন্তু ফলাফল তাহার আয়ত্তের বাহিরে।"

ইহার সঙ্গে এখনকার ভারতের তুলনা করা যায়। পাঞ্জাব প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট জল সেচনের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যথেষ্ট পরিমাণে গম জন্মে এবং এই গম দরে বিক্রয় হইত বলিয়া চাষীরা বিদেশী চাকচিক্যময় জিনিষ কিনিত এবং সাদাসিধা জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া সেখনাই বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু গত ৪।৫ বছর যাবৎ ফসলের মূল্য কমিয়া গিয়া তাহারা অকূল পাথারে পড়িয়াছে। এদিকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে যন্ত্রের সাহায্যে অনেক সস্তাদরে গম উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং তাহা ভারতীয় বন্দরসমূহে এত সুলভ মূল্যে আমদানী হইতে লাগিল যে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফল

এই হইল যে, বাংলা অধিকতর মূল্যে গম অর্থাৎ ময়দা কিনিতে বাধ্য হয়।

নীলদর্পণের প্রারম্ভেই বাংলার এই পূর্ব্বকার অবস্থার আভাষ পাই :—

"গোলক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষের বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি করে গিয়েছেন তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কত্তে হয় নি। ধান জন্মায়, তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ষাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুব, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?"

ইহা হইতে মনে হয় যে ঐ সময়ে বাংলা দেশ স্বাবলম্বী ছিল, অর্থাৎ দেশবাসী দেশে বসিয়াই আপন আপন প্রয়োজন মিটাইতে পারিত।

আমাদের প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ পিতামহদিগের আমলে চালচলন যেরূপ সাদাসিধা ছিল তাহাতে নগদ টাকারও প্রয়োজন বড় একটা ছিল না। তখনকার দিনে বিদেশ যাওয়া চলিত ছিল না। কেবলমাত্র গয়া কাশী বা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিবার সময় (যাহা হয়ত জীবনে একবার মাত্র ঘটিত) কিছু নগদ টাকার দরকার হইত। গরীব বিধবারাও আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতেন অথবা কোন বিশ্বস্ত মহাজনের নিকট জমা রাখিতেন। কিন্তু এই ৭০।৮০ বৎসরের মধ্যেই আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রেল, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ পল্লীর উৎপন্ন যাবতীয় ফসল এবং সহর হইতে আমদানী বিদেশী দ্রব্যসম্ভার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 'যাতায়াত করিতেছে। তাহাতে গাঁয়ের ফসল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, এমন কি টাকার লোভে

কৃষকেরা তাহাদের বীজ ধান্য পর্য্যন্ত অনেক সময় বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং ঐ টাকা দিয়া বিদেশী বিলাসের দ্রব্যাদি কিনিয়া ঘর ভর্তি করে।

আজকাল পল্লীগ্রামেও যুবকদিগের মধ্যে সহরের আবহাওয়া কিছু কিছু ঢুকিতেছে। কথায় কথায় চা চুরুট এবং বিস্কুট রুটি ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যের ছড়াছড়ি এখন গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। স্মরণ আছে যে, আমাদের বাল্যকালে অর্থাৎ ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রাতে ফেণাভাত খাইতাম। অবশ্য এখনও অনেক জায়গায় উহার প্রচলন আছে। খৈ, মুড়ি, মুড়কী, চিঁড়া, নারিকেলের তৈয়ারী চন্দ্রপুলি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং নানা প্রকারের পিঠা প্রভৃতি তখন আমাদের জল খাবারের উপকরণ ছিল। এখন চা ও দোকানের ভেজাল ঘৃতে তৈয়ারী মিষ্টান্ন সেই সকল বিশুদ্ধ খাদ্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত ঘৃত আজকাল বাজারে চলিতেছে উহাতে অবাধে মরা গরু-মহিষের চর্ব্বি, ভেজিটেবল্ (Vegetable) ঘি, মহুয়ার তেল প্রভৃতি মিশান হইয়া থাকে। কাজেই উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ হানিকর তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা ছাড়া সহরের ছেলেরা কোন প্রকার পরিশ্রম করিতেই নারাজ। এক মাইল পথ হাঁটিতে হইলে অনেক সময় তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ৪।৫ মিনিট অন্তর মোটর বাস পাওয়া যাইতেছে, কাজেই তাহারা কেন হাঁটিয়া সময়ের অপব্যবহার করিবে? জল খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ছাত্রেরা সিনেমা দেখে। আর কলেজের ছেলেদের ত কথাই নাই, তাহারা কলিকাতা বা অন্য কোন সহরে বসিয়া সপ্তাহে ৩।৪ বার সিনেমা দেখিয়া ও অন্যান্য বিলাস বাসনে ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণের প্রেরিত অর্থের সদ্ব্যবহার করে। ইহাতে কি প্রকার অর্থের অপব্যয় হইতেছে ও দেশের রুচি বিকৃতি ঘটিতেছে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পর পর কয়েক বৎসর পাটের দর চড়িয়া যাওয়ায় পাটের চাষ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত পাটের দর বাড়িতেই থাকে এবং ২৫৲।৩০৲ টাকা মণ পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। যতদিন পাটের দর ছিল; প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪০ কোটী টাকা পাটের মূল্য বাবদ চাষী, ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি লোকদের মধ্যে বিতরিত হইত। কিন্তু চাষীদের হাতে টাকা বেশী হওয়ায় মামলা মোকদ্দমাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে কেবল যে উকীল মোক্তারদেরই পরব পড়িয়াছিল তাহা নহে, গভর্ণমেণ্টেরও কোর্ট ফি, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি বাবদ বহু লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে সুরু করিয়া ১৮৯০—৯৫ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং পরে ব্রহ্মদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রায় সমস্ত উচ্চপদ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন এবং পশারওয়ালা উকীল বা নামজাদা ডাক্তার হিসাবে তাঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। এই সমস্ত কারণে দেশে ধনাগম সুরু হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চালচলনও বাড়িয়া গেল। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কেবল ইউরোপেই নয়—ভারতবর্ষেও নানা প্রকার নূতন নূতন রুচি ও ব্যসনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। মোটর গাড়ী, কলের গান, রেডিও, সিনেমা, টকি প্রভৃতিতে মফঃস্বল সহর পর্য্যন্ত এখন ছাইয়া গিয়াছে। এই সব ব্যসন দ্রব্যের প্রচলন কি পরিমাণ বাড়িতেছে তাহা Customs (শুল্ক বিভাগের) রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যায়। ইহার বাবদ কয়েক কোটী টাকা আমরা বিদেশে পাঠাই।

পূর্ব্বকালের চালচলনই যে কেবল সাদাসিধা ছিল তাহা নহে অধিকন্তু শিক্ষা পদ্ধতিও বেশ সহজ ও সরল ছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত মুখস্থ করিতে হইত। শুভঙ্করীর হিসাব ও সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়া লোকে পাটোয়ারীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। গুরুর

মাহিয়ানা মাসিক পাঁচসিকা, এতদ্ভিন্ন তেল ও তামাক ছাত্রেরা দিত। পড়ুয়ারা যখন তালপাতা হইতে কলার পাতা, বা কলাপাতা হইতে হরিদ্রাকাগজ ধরিত তখন গুরুমহাশয় ১টি করিয়া সিধা পাইতেন। একসঙ্গে ২০।২৫ জন ছাত্র পড়িত। এখন স্কুল ও কলেজে ছাত্র পড়াইয়া এবং বিদেশে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইয়া অনেক পিতা মাতা সর্ব্বস্বান্ত হন। তাহা ছাড়া তখন মেয়ের বিবাহে সর্ব্বনাশা পণপ্রথা ছিল না। তখন গ্রামের বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন বড় একটা হইত না। গ্রামের লোকের যাহা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কথকতা, রামায়ণ গান, সঙ্কীর্ত্তন এবং যাত্রা প্রভৃতিতে লোকে তৃপ্তি পাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও ইহাতে হইত। এখন সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতিতে কলিকাতায় প্রত্যহ কত সহস্র টাকা নষ্ট হয় তাহার লেখাজোখা নাই।

আরও ২।১টা উদাহরণ দিতেছি: আমার বাল্যকালে দেখিতাম যে, আমার মাতাঠাকুরাণী বিকালে দোতালার বারান্দার উপর বসিয়া সামান্য আগুনের উপর খুলি রাখিয়া কয়েক টুকরা গন্ধক গলাইতেন। তাহাতে গোছ করা পাঁকাটীর টুকরার দুই মুখ ডুবাইতেন, তুলিয়া লইলেই উহা জমিয়া যাইত। এই প্রকারে প্রস্তুত দেশী দিয়াশলাই আপামর সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহারে লাগিত। এখন ইহার পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে দিয়াশলাই কাঠি (matches) ব্যবহৃত হয়, এমন কি ভিক্ষুক পর্য্যন্তও এবং লাঙ্গল দিবার সময় চাষীরাও এই বিলাতী দিয়াশলাই ব্যবহার করে। শুল্ক বিভাগের তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে আমরা এই প্রকারে কত লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি। এখন ঘরে ঘরে ষ্টোভ দেখা দিতেছে। তাহার সহিত আনুষঙ্গিক স্পিরিট ও কেরোসিন তৈলের অজস্র খরচ হইতেছে। বৎসরে ইহার দরুণও যে ব্যয় হয় তাহার সমষ্টি কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। তখনকার দিনে একটা মালসায় তুঁষ ও টুক্‌রা ঘুঁটে মিশাইয়া আগুন রাখার পদ্ধতি ছিল। এখনও অজ পাড়াগাঁয়ে ইহা

কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। আগুন জ্বালাইবার প্রয়োজন হইলে মালসার মধ্যে দেশী দিয়াশলাইএর কাঠি প্রবিষ্ট করাইলেই গন্ধক জ্বলিয়া উঠিত এবং রাত্রে বা অপর সময়ে শিশুদের দুধ গরম করা ইহার দ্বারাই হইত। এই ষ্টোভ ব্যবহারের জন্য প্রায়ই সংবাদপত্রে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগুন লাগিয়া মহিলাদের জীবন নাশের ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া যায়।

অনেকেই হয়ত উচ্চকণ্ঠে হাসিবেন ও আমার প্রতি অভিযোগ করিবেন যে, আমরা কি ৭০।৮০ বৎসর বা একশত বৎসর পিছাইয়া যাইব? ইহার উত্তরে আমার এই বলিবার আছে যে, এই হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। আমরা বাল্যকালে হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতে পড়িয়াছি—"অসভ্য জাপান অসভ্য তাতার" কিন্তু ৫০ বৎসরের মধ্যেই জাপান এতদূর উন্নতি করিয়াছে যে, তাহাকে অসভ্য বলা ত দূরের কথা আজ জাপান পৃথিবীর সুসভ্য জাতিদের মধ্যে অন্যতম। এখনকার সংস্করণে—"অসভ্য জাপান"এর স্থলে "সুসভ্য জাপান" লেখা হইয়া থাকে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই আমাদের পূর্ব্বকালে যাহাকে Luxury (বিলাস দ্রব্য) বলিয়া উল্লিখিত ছিল এখন তাহা Necessity অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সকল সুসভ্য ও স্বাধীন দেশই ঐ সকল দ্রব্যসম্ভার নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বলে নিজ দেশেই তৈয়ারী করিয়া লয়। জাপানী মালে আজকাল কেবল ভারতবর্ষ নয় এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্তও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা হাজারে হাজারে উচ্চ শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইয়া এবং উন্নত ধরণের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও সামান্য একটি আল্‌পিন হইতে মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষের জন্যই বিদেশীর মুখাপেক্ষী।

এখন কলিকাতার দেখাদেখি সমস্ত মফঃস্বল সহরেও বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু এদিকে মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স দিতে না পারিয়া অনেকের ঘটি বাটী আসবাব লইয়া টানাটানি পড়ে।

তবু বাবুদের বিদ্যুতের আলোর উপর ট্যাক্স দিতে আপত্তি নাই। বাল্যকালে কবি খেদোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন।

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

বোম্বে ও কলিকাতায় এই একটি প্রভেদ যে, বোম্বাই সহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম, আলো ও টেলিফোন প্রভৃতি প্রায়ই বোম্বেওয়ালাদের টাকায় চালিত সুতরাং সেই টাকা ঘুরিয়া ফিরিয়া উহাদেরই পকেটে পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু হতভাগ্য বাংলা দেশে ইহার বিপরীত। সমস্ত কোম্পানী লণ্ডন সহরে incorporated বা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমস্ত উপস্বত্বই বিদেশে চলিয়া যায়।

যদি আমরা বিদ্যাবুদ্ধিবলে নিজ দেশে এই সমস্ত 'সভ্যতা' পরিচায়ক দ্রব্য সকল তৈয়ারী করিতে পারিতাম তবে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমাদের 'সভ্যতা' গ্রহণ মানে কেবল বিদেশে টাকা পাঠান এবং দেশকে হৃতসর্ব্বস্ব করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় তক্‌মাধারী এম এ, বি-এল্ হইয়াও আমরা ২৫৲, ৩০৲, ৪০৲ টাকার কেরাণীগিরির জন্য মাড়োয়ারী, সুরাটী, গুজরাটী বণিক্‌গণের উমেদারী করি। ইউরোপীয় সওদাগরী আপিসের ত কথাই নাই। একটা সামান্য বেতনের পদের জন্য এক হাজার আবেদন পড়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পল্লীতে ফিরিয়া যাইবার যে ধূয়া উঠিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত দুরূহ। সম্প্রতি (১৯৩৫) বিলাতে একখানা ছোট বই বাহির হইয়াছে। উহার নাম "Back to the Land" (জমিতে ফিরিয়া যাও)। ইহাতে গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার সমস্যা ও উহার সমাধান বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তৃদ্বয় কৃষি ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণ'-রত অক্‌স্‌ফোর্ডের (Oxford) একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট সুতরাং তাঁহাদের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিতে একেবারে অপটু তাঁহাদের দ্বারা এই কাজ কদাপি চলিতে পারে না। ঐ পুস্তক হইতে কয়েকটি স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"The Scottish crofter is still living in the eighteenth century, the Durham miner in the twentieth While the crofter mind is bent wholly upon the production of his means of life, the miner thinks of his labour as something which will give him a weekly cash income for his wife to turn into food and raiment at the Co-op., round the corner. Buses, cinemas, football-matches, racing, clubs, pubs, evening papers, libraries, paved roads and street-lighting mean nothing to the crofter. To the miner they represent a standard of living which he has come to regard as his due and what chance is there that he will be content to forego all that industrialism has given him because industrialism needs fewer of his class to-day ?" (Page 8)

"To stop the drift to the towns rather than to bring men back to the land." (Page 20)

"Capitalist farming owing to depression went out of order because they were unable to meet their weekly wages bills and their high standard of living. Many of them went out of farming and there began a migration of hardworking thrifty family-farmers. They brought with them a lower standard of living and higher standard of work than the men they followed." (Page 73) "Agriculture such as pays is essentially a one-man business" (Page 74)

The small holder and his family enjoy no protection under the statutory regulation of hours of labour. There is no statutory half holiday for them, no overtime pay, no

special rates for Sunday work. When the time moved by the small holder and his family is priced at the current rates of the Agricultural Wages Board, it is often found that their actual labour income is far below that, which they would have earned had they been working for wages." (Page 69)

"It must be remembered that the cultivation of an allotmennt for self-supply is a business very different from that of the production for the market. (Page 83)

"It would be, however, wrong not to point out in the plainest term that nothing but disappointment and disaster could result as land settlement came to be regarded as offering a possible solution to the problem of industrial unemployment." (Page 85)

"The stuff grown on his allotment does not compete with that of the professional grower for it is consumed by himself and his family." (Page 88)

গ্রামের চাষীর সহিত সহরের শ্রমিকের তুলনাছলে গ্রন্থকারদ্বয় বলিতেছেন :—

"স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে পাহাড় অঞ্চলের গ্রাম্য চাষী এখনও যেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পড়িয়া আছে, অপর পক্ষে ডারহাম সহরের খনিজীবী শ্রমিক বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছে। চাষী তাহার জীবনধারণের পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৎসমুদয় নিজেই উৎপন্ন করিয়া লয়, কিন্তু সহরের শ্রমিক সপ্তাহান্তে যে পারিশ্রমিক অর্জ্জন করিয়া আনে তাহার বিনিময়ে তাহার গৃহিণী বাজার হইতে আহার্য্য, পরিধেয় প্রভৃতি কিনিয়া আনে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, বাস ও ট্রাম, ফুটবল খেলা, ঘোড়দৌড়, পানশালা, সান্ধ্যসংবাদপত্র, লাইব্রেরী, পাকা সড়ক ও তাহার পার্শ্বে সন্নিবেশিত আলোকমালা—চাষীর

সরল জীবনে এ সকলের স্থান নাই, কিন্তু অপর পক্ষে সহরবাসী শ্রমিক এই সকল আরাম ও আনন্দের উপকরণে এতদূর অভ্যস্ত যে এগুলি তাহার চাই ই। আজ যদি তাহাকে পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনে গ্রামে নির্ব্বাসিত করা যায় তাহা হইলে ইহাদের মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে সে আপত্তি করিলে তাহাকে অপরাধী করা যায় না।

* * * *

"এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে সহর হইতে পল্লীতে শ্রমিক আমদানী করিয়া নহে, পল্লীস্থ শ্রমিক যাহাতে আর সহরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া না ছুটে, তাহাই করিতে হইবে।

* * * *

"দেশে এক শ্রেণীর কৃষিজীবী ছিল, যাহারা সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের মালিক ; বেতনভুক্ মজুরের সাহায্যে তাহারা কৃষিকার্য্য করাইয়া লইত, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। একদিকে স্ব স্ব ব্যয়সাধ্য জীবনযাত্রার প্রণালী, অপর দিকে বেতনভুক্ শ্রমিকদিগের বেতনের চাহিদা—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ইহাদের অনেককে কৃষিব্যাবসা ত্যাগ করিতে হইল। অধিকন্তু স্থানান্তর হইতে নূতন একশ্রেণীর চাষী আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা যেমন মিতব্যয়ী তেমনই কর্ম্মকুশল। মজুরদের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া ইহারা সপরিবারে ক্ষেত্রে কাজ করে। ইহাদের কৃষিক্ষেত্র আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির আনুকূল্যেই ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, বেতনভুক্ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না।

* * * *

"কৃষিকার্য্য যখন লাভজনক ব্যাবসা হিসাবে সার্থক হয়, তখন উহা ব্যক্তিবিশেষের, অর্থাৎ ধনী ভূস্বামীরই সমৃদ্ধি বুঝায়।

* * * *

"শ্রমিকের দুঃখকষ্ট মোচনের উদ্দেশ্যে আজকাল যে সকল আইন-কানুনের প্রণয়ন হইতেছে, উল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতদারগণকে তাহা স্পর্শ করে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ কত ঘণ্টা করিয়া তাহাকে খাটিতে হইবে, কত ঘণ্টা কিম্বা কতদিন খাটিলেই বা তাহার অর্দ্ধদিনের ছুটি পাওনা হইবে, কত ঘণ্টা অতিরিক্ত খাটিলে তাহার কত উপরি পাওনা হইবে—এ সকল হিসাব তাহার পক্ষে অবাস্তব। শ্রমিক-সমস্যা লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামাইতে ব্যস্ত তাঁহাদের কষ্টি-পাথরে এই সকল ক্ষুদ্র জোতদার ও তাহাদের পরিবারবর্গের মোট শ্রমের মুদ্রামূল্য কষিলে দেখা যাইবে যে, দিনমজুর হিসাবে খাটিলে তাহারা অর্থের দিক্ দিয়া অধিকতর লাভবান হইতে পারিত; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সে তাহার নিজেরই ক্ষেত্রে মনের আনন্দে কাজ করিয়া যায়—দৈনিক আট ঘণ্টার ধার ধারে না বা ঘণ্টার হিসাব রাখা প্রয়োজন মনে করে না। সে কাহারও বেতনভোগী ভৃত্য নহে, সে বাস করে নিজস্ব গৃহে, ভাড়াটিয়া কুটীরে নহে। এক সপ্তাহের নোটিশে চাকরী নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা তাহার নাই। সামান্য মজুরের ন্যায় তাহার জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর ও সরল হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে একজন ক্ষেত্রস্বামী এবং ভবিষ্যতে প্রভূত উন্নতি ও সৌভাগ্যের আশা রাখে।"

ক্ষুদ্র জোতদারগণের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকেও কিরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয় তাহা জনৈক স্ত্রীলোকের বিবৃতি হইতে বুঝা যাইবে :—"সকাল, দ্বিপ্রহর এমন কি রাত্রিতে পর্য্যন্ত কেবল কাজ আর কাজ; কাজের চাপে যেন বিরক্তি ধরিয়া যায়। কিন্তু গত্যন্তর নাই, যেমন করিয়া হউক চালাইয়া লইতে হইবে। একে ত লোকের অভাব, তাহার উপর বালকগণের অনেকে আবার আজকাল নিকটবর্ত্তী সহরে যাইতেছে সুতরাং মেয়েদের খাটুনি দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের কাজ ত আছেই, অধিকন্তু বালকদের কাজও তাহাদিগকে করিতে হইতেছে।"

"ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পরিবারবর্গের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য্য এবং বাজারে কৃষিজাতদ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য্য —এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে।"

* * * *

"দলে দলে বেকার শ্রমিকগণকে পল্লীগ্রামে লইয়া গিয়া চাষ-আবাদে লাগাইলেই সকল সমস্যার নিরসন হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করেন তাঁহাদিগকে পরিশেষে নিরাশ হইতে হইবে সন্দেহ নাই।"

* * * *

"ক্ষুদ্র জোতদারের ক্ষেত্রে যে ফসল জন্মে তাহা কেবল তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়, পেশাদার চাষীর ফসলের সহিত উহার তুলনা বা প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই উঠে না।"

"যে সকল বেকার শ্রমিককে পল্লীগ্রামে আনিয়া চাষ আবাদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইতেছে তাহারা সহরের চিরাচরিত বিলাস ব্যসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরাম ত পাইবেই না, অধিকন্তু অন্তরে অন্তরে নৈরাশ্য ও অসন্তোষের বহ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে।"

* * * *

"ইংলণ্ডের পল্লী প্রদেশে আর এক শ্রেণীর জোতজমি আছে, ইহাদিগকে cottage holding বলিতে পারা যায়। বাসগৃহের সংলগ্ন এক একর পরিমাণ চাষের জমি, তাহাতে শাকসব্জী ও তরিতরকারী উৎপন্ন হয়, ইহার সঙ্গে কয়েকটি করিয়া হাঁস, মুরগী ও শূকর। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জমির চাষে পরিবারের সকলের শ্রমশক্তি প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, কিংবা উহার ফসলে সংসারে সকল প্রয়োজনও মিটে না। সাধারণতঃ যাহারা কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, শেষজীবনে লঘু পরিশ্রম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর সামান্য কিছু রোজগার

করিলে জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়—তাহারাই এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন কৃষিক্ষেত্রের পক্ষপাতী এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই পক্ষে উহা সমধিক উপযোগী। একটি সমগ্র পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

ইংলণ্ডের সহরে শ্রমজীবীর সহিত আমাদের সহর-প্রবাসী গ্রাজুয়েট্ ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট্দের তুলনা করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোক কলকারখানায় মেহনত করিতে অভ্যস্ত, অপর পক্ষে আমাদের যুবকগণ শ্রমসাধ্য কার্য্যে একেবারে অনভ্যস্ত। সম্প্রতি আমি কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। তদন্ত করিয়া জানিলাম যে, প্রতি গ্রামে অনেক উপাধিধারী যুবক বেকার বসিয়া আছেন। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি একই উত্তর, "মহাশয় কি করি, চাকরী অমিল।" সুতরাং সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে যাইয়া যে বিশেষ সুরাহা করিবেন তাহার কোনও আশা দেখি না, বরং যাঁহারা পাড়াগাঁয়ে বসিয়া হতাশ্বাসে আয়ুঃক্ষয় করিতেছেন তাঁহারা এবিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা আশৈশব পল্লীগ্রামের সরল, বাহুল্য-বর্জ্জিত ও শ্রমশীল জীবনে অভ্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র বৃষ্টিতে থাকা যাঁহাদের কোনকালে অভ্যাস নাই, তাঁহারা যে কৃষকদের ন্যায় মেহনত করিতে পারিবেন তাহা সম্ভব নহে। কথায় বলে, "খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি; ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে হা-ভাত।" অর্থাৎ নিজে রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মজুরের সঙ্গে সমান খাটিতে পারিলে তবে কিছু হয়।

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের যুবকগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা সহরে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রামে আসিয়া চাষ বাস করা কত কঠিন! বিলাতে যে সকল শ্রমজীবী সহরের নানাবিধ কলকারখানায় খাটিতে অভ্যস্ত, গ্রন্থকারদ্বয় তাহাদিগকে

অশক্ত বলিয়াছেন এবং তাহার কারণ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রমজীবীরাই যখন পল্লীতে আসিয়া চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অপারগ, তখন আমাদের যুবকগণ যে তাহাতে সক্ষম হইবেন তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ক্ষেতের চাষী তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে দিন নাই, দুপুর নাই, রবিবার নাই, ছুটি নাই—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অন্ন-সমস্যার সমাধানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। যাঁহারা মান্দ্রাজ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষীদের ক্ষেত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে, সময়ে অসময়ে পরিবারস্থ সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একই জমিতে বছরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন করে, প্রয়োজন হইলে কুয়া কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের মেয়েরা কদাচিৎ ক্ষেত্রে বাহির হয়। সুতরাং তাহাদের পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত 'Back to the Land' পুস্তকে গ্রন্থকারদ্বয় এ-বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। "জার্ম্মানীর ভুরটেম্‌বার্গে কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৮ জন ভূস্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়াছিল উহাতে প্রকাশ পায়, এই সকল কৃষকদের ক্ষেত্রে যে জনমজুর খাটিত তাহাদের সহিত তুলনায় স্বয়ং ভূস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গের উপার্জ্জন অপেক্ষাকৃত কম। এই স্বল্প উপার্জ্জনের জন্য ক্ষেত্রস্বামী ও তাহার পত্নীকে দৈনিক গড়ে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়—এমন কি রবিবার বা ছুটির দিনেও নিষ্কৃতি নাই। গত ১৯২৫ সালে সমগ্র জার্ম্মানীর কৃষিজীবীদিগের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক স্ত্রীলোক ছিল, ফ্রান্সেও তদ্রূপ। কিন্তু ইংলণ্ডে শতকরা মাত্র ১০ জন স্ত্রীলোক। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রয়োজন হইলে ১৪ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকবালিকাগণের লেখাপড়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষেতের কাজে নিয়োজিত করা

যাইতে পারে। যে দেশে প্রাপ্ত-বয়স্কদিগেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে সেই দেনমার্কেও দশ হইতে পনেরো বৎসরের শিশুদিগকে সপ্তাহে মাত্র তিনদিন বিদ্যালয়ে যাইতে হয়—অবশিষ্ট সময়ে তাহারা ক্ষেতের কার্য্যে সহায়তা করে। সহর ও কলকারখানা হইতে যত লোক আসিয়া ভূমির উপর নির্ভর করিতে থাকিবে ততই শিশু ও স্ত্রীলোকগণের উপর চাপ পড়িবে, কিন্তু এতদ্দেশেও (ইংলণ্ডে) এইরূপ অবস্থার উদ্ভব কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

যখন জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষকদিগের অর্দ্ধেক শ্রমিক স্ত্রীলোক তখন বাংলা দেশে কৃষকগণ কেন অসুবিধা ভোগ করে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ভদ্রসন্তানগণও যে কৃষিকার্য্যের পক্ষে কতদূর অযোগ্য তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

———

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা*

আমি খুবই অসুস্থ; আমার চিকিৎসকেরা আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করবার উপদেশ দিয়েছেন, এমন কি, বিজ্ঞান কলেজে (যেখানে আমি থাকি) দারোয়ানের উপর কড়া আদেশ আছে যে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য যাঁরা আসবেন তাঁদের যেন আমার কাছে যেতে দেওয়া না হয়। কিন্তু আপনারা আমাকে এখানে আনবার জন্যে যে লোকের ওপর ভার দিয়েছিলেন তিনি সহজ লোক নন, আপনারা বোধ হয় ভাল রকমই জানেন যে, তিনি একজন নাছোড়বান্দা, কোন বাধাই মানেন না; কি জানি কেমন কোরে তিনি দরোয়ানকে বশ করেছিলেন (হয়ত ঘুষ দিয়ে)। জানুয়ারী মাসে একদিন হঠাৎ যখন তিনি আমার ঘরে ঢুকলেন, আমি তাঁকে বলেছিলুম, "কি কোরে তুমি এখানে আসতে পারলে—তোমার সাহেবী পোষাক দেখে দারোয়ান তোমায় ছেড়ে দিয়েছে বুঝি!" সেই থেকে তিন মাস ধরে তিনি আমার কাছে যাতায়াত করেছেন এবং তার ফলে আমার চিকিৎসকদের, বন্ধু-বান্ধবদের ও প্রিয়তম ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আজ এখানে এসে উপস্থিত হোতে হোয়েছে। যা'হোক এখানে আসার দরুণ আমি মোটেই দুঃখিত নই বরং আনন্দিত। এখানে আরও অনেকবার এসেছি; প্রত্যেকবারেই আপনারা আমাকে আপনাদের আদর যত্নের দ্বারা অভিভূত কোরে ফেলেছিলেন কিন্তু এবারে আপনারা আমাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা

---

* ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ।—৭ই এপ্রিল, ১৯৩৫।

করেছেন তাতে আমি একেবারে মুগ্ধ হোয়ে গেছি। বাস্তবিকই, আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আগেই বলেছি যে, আমি এখানে অনেকবার এসেছি এবং প্রত্যেক-বারেই এই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য শিক্ষার্থী হিসাবেই এসেছি। এ বিষয়ে রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং প্রত্যেকবারেই আমি তাঁরই কৃষি-ক্ষেত্রে আতিথ্য গ্রহণ করেছি। আমার আত্মজীবনীতে (Life and Experiences of a Bengali Chemist) ফরিদপুর জেলার অর্থ-নৈতিক অবস্থার আলোচনা করেছি। আজও আমি এখানে শিক্ষার্থী হিসাবেই এসেছি এবং আশা করি আপনাদের সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ পাবো ও কিছু জ্ঞানলাভ কোরে কলকাতায় ফিরে যাব। আমার যদিও ৭৪ বছর বয়স হোল, এখনও আমি নিজেকে ছাত্র বোলেই মনে করি। স্কুল কলেজে আর কতটা শেখা যায় ? আমি স্কুলে যা শিখেছি, নিজের চেষ্টায় তার চেয়ে শতগুণ শিখেছি; আজকাল আমাকে অনেক দূর দেশে ভ্রমণ করতে হয় কিন্তু সব সময়েই আমার ট্রাঙ্ক দরকারী বইয়ে ঠাসা থাকে। যদি কোন ছাত্র নিয়মিত-ভাবে রোজ দু'ঘণ্টা কোরে পড়ে তা'হলে সে অনেক বিষয় শিখতে পারে। থাক্ এসব অবান্তর কথা। কিন্তু আমি যে আপনাদের বেশী কিছু নূতন কথা বোলতে পারবো তা মনে হয় না। আজ ৪০ বছর ধরে যা আলোচনা করেছি, যা বোলে এসেছি—সেই সব পুরানো কথাই আপনাদের শোনাব, কথাগুলো খুবই পুরানো, নীরস আর কঠোর, আপনাদের ভাল লাগবে না। কিন্তু এসব কথা ছাড়া আর কিছু বলবার মত বিদ্যে বা শক্তি আমার নেই।

আমার আত্মজীবনীতে ফরিদপুরের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা সম্পর্কে আমি দেখিয়েছি, তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সাল থেকে

১৯২৮-২৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল ৫৭৲ টাকা থেকে ৫৮৲ টাকা। ১৯১৪-১৫ সালে জ্যাক ও ম্যালী সাহেবের হিসাব অনুসারে ফরিদপুর জেলার লোকের মাথাপিছু আয় ছিল ৬২৲ টাকা। বর্ত্তমান মন্দার বাজারে ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় কত কমে গেছে তা আপনারা সহজেই অনুমান কোরতে পারেন। আপনারা জানেন যে, পাটের দামই বাংলা দেশের ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রিত করে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান হিসাব কোরে দেখিয়েছেন যে, বাংলা দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের দাম এক পঞ্চমাংশে নেবে গেছে, অর্থাৎ ১৫৲ টাকা থেকে ৩৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে; এবং ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকাও এ'কথা স্বীকার ক'রেছেন। যদিও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন—চাল, ডাল, নুন, তেল, কাপড় ইত্যাদির দাম কমেছে কিন্তু পাটের দাম যে অনুপাতে কমেছে এই সব জিনিষের দাম সেই অনুপাতে কমেনি। মোটামুটি বোলতে পারা যায় যে এখন এই জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১৫৲।২০৲ টাকার বেশী নয়।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" কথাটা অনেকদিন থেকেই চলে আস্‌ছে। কথাটা নেহাৎ খেলো নয়, খুবই সত্যি কথা। আজ পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ সম্পদশালী হোয়েছে তাদের মূলে রয়েছে ব্যাবসা। আজ যে আমেরিকা জগতের মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ বোলে গণ্য হোয়েছে তার মূলে রয়েছে তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য। বেশী কথায় কাজ কি, আমাদের দেশে বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হবার গোড়ায় রয়েছে পণ্যের আদান প্রদান। পণ্যের আদান প্রদান হোতে হোতেই পরে সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি পোড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ওদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল; এবং ক্রমশঃ দৃঢ় হোয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে একটা নীতি শিখতে পারা যায় যে, কোন দেশে বাণিজ্য বিস্তার কোরলে পরে

সেখানে রাজ্য বিস্তারও করা যেতে পারে। জগতে অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করতে হলে ঘরের আর বাইরের বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার কোরে ফেলতে হবে। ঘরের পয়সা ঘরে রাখতে হবে আবার বাইরেরও পয়সা কুড়িয়ে আনতে হবে, দেশের ভিতরকার ব্যাবসাগুলোকে সতেজ তো রাখতে হবেই অধিকন্তু বাইরে ব্যাবসা করবার মত উপযুক্ত সামর্থ্য ও শিক্ষা সঞ্চয় কোরতে হবে।

বাংলার ব্যাবসার ইতিহাস উল্টে দেখতে পাই, আগে বাংলা দেশে বাঙ্গালীর দুই রকম বাণিজ্যেই হাত-যশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রী বড়বাজারে; অন্তর্বাণিজ্যই বলুন, আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙ্গালীর হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে। আমাদের সাহা ও তিলি সম্প্রদায় যাঁরা ব্যাবসাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন তাঁরা এখন ব্যাবসাকে 'সেলাম আলেকুম' দিয়ে সরে পড়েছেন বা পড়ছেন। একশ' বছর আগে, এমন কি ষাট সত্তর বছর আগেও বাঙ্গালীরাই বড় বড় হৌসের মুৎসুদ্দির কাজ কোরত কিন্তু এখন সেখান থেকেও বাঙ্গালী হোটে গেছে; অ-বাঙ্গালী মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি তাঁদের স্থান অধিকার করেছে। আজ বাঙ্গালী ব্যাবসায়ে যে কত হীনবল হোয়ে পড়েছে আর তার ব্যাবসার সমস্ত দিক অ-বাঙ্গালীরা কি রকম কোরে গ্রাস কোরে বোসেছে তা আর বিশেষ কোরে বলবার প্রয়োজন নাই। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, খোজা, ইংরাজ, ফরাশী, জাপানী, আমেরিকান ইত্যাদি নানান্ জাত এসে আমাদের দেশের বুকে বিরাট বিরাট দোকান ফেঁদে বসেছে; প্রতি বছর কত কোটি কোটি টাকা তারা তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার হিসাব আমরা দিতে পারি, কারণ আমরাই তাদের কেরাণী হোয়ে তাদের ব্যাবসা বাণিজ্যের লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করি। আমরা কেবল তাদের লাভের খতিয়ান রেখে চলেছি। আমাদের হিসাবনবীশ মাথা তার হিসাব রাখতে গুলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু লাভের কড়ির এক কড়াও

আমাদের পকেটে আসছে না; হয় হুণ্ডী হোয়ে মাড়োয়ারে, গুজরাটে, পার্শীয়ায় চলে যাচ্ছে, নয় সোনা একেবারে সাগর পারে পাড়ি দিচ্ছে। আমরা কেবল ফ্যাল্‌ফেলিয়ে দেখছি, আমরা কেবল চন্দনবাহী গাধার মত চন্দন কাঠের ভারটুকুই অনুভব করছি, গন্ধটা উপরে উপরেই চলে যাচ্ছে; যে তার পিছনে লাঠি নিয়ে তাকে চালাচ্ছে সেই সারাপথ গন্ধটা আঘ্রাণ কোরতে কোরতে চলেছে।

২৬ বৎসর আগে 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক প্রবন্ধে আমি প্রথম বলেছিলাম, চাকরী কোরে বাঙ্গালী ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। এই ২৬ বছরের মধ্যে সে ধ্বংসের দিকে আরো দ্রুত গতিতে ছুটছে। চাকরী কোরে কোন জাত বড় হয়নি, হোতে পারেনি, হোতে পারবেও না। কেবল চাকরী কোরে জাত বাঁচেনি, বাঁচাতে পারে না, বাঁচতে পারবেও না। চাকরী আর ব্যাবসা বাণিজ্যের প্রভেদ দেখাবার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের হাইকোর্টে ৭ জন জজ্‌ আছেন, তার মধ্যে ৪ জন হিন্দু আর ৩ জন মুসলমান। এই সাতজনে বছরে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বেতন পান। কিন্তু কলকাতা সহরে, ইউ-রোপীয়ান বণিকদের ত কথাই নাই, এমন অনেক মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, খোজা আছেন যাঁরা প্রত্যেকে এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা রোজগার করেন। আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চাকরী নিয়ে মারা-মারি কাটাকাটি পোড়ে গেছে। কিন্তু আমি বলি ৪ জন হিন্দু জজের জায়গায় দু'জন হিন্দু আর ৫ জন মুসলমান জজ্‌ হোলেও দেশের সম্পদ বাড়বে না। আরো একটা কথা, একজন মোটা মাইনের চাকুরে তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ছাড়া বড় জোর দু' একটা দাসদাসী প্রতি-পালন কোরতে পারেন আর সেই টাকায় তাঁর পরিবারবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পারেন আর কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমাতে পারেন। হয় ত মোটর গাড়ী কোরতে পারেন কিন্তু একজন ব্যাবসাদার যে বছরে ৫০।৬০ হাজার

টাকা রোজগার করে তার গদিতে কত লোকজন প্রতিপালিত হচ্ছে। কত নৌকার মাঝিমাল্লা আর গাড়োয়ান তার মাল এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে চালিয়ে, যেমন হাটখোলায় ও বেলেঘাটায় দেখতে পাওয়া যায়, দু'পয়সা রোজগার করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, চাকরী কোরে নিজেদের পরিবারবর্গেরই ভরণপোষণ করা যায়—এতে দেশের ধনসম্পদও বাড়ান যায় না বা আর পাঁচজনকে প্রতিপালনও করা যায় না ; দেশের অর্থ-সম্পদ চাকরী দ্বারা বাড়ে না, ব্যাবসা দ্বারা বাড়ে। আর একটা কথা, ব্যাবসাদারেরা পরগাছা (Parasite) নয়, চাকরীজীবীরা পরগাছা অর্থাৎ পরকে শোষণ ক'রে তাঁরা বর্দ্ধিত হ'ন ; এবং উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

আজ ব্যাবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর এই রকম হীনবল হোয়ে প'ড়বার কারণ, প্রথমতঃ তার ব্যাবসাবুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালী যে শিক্ষা পাচ্ছে তাতে সে 'বাবু' হবার পথেই চলেছে, বণিক হবার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ,—খাটতে কাতর, শুধু তাই নয়, কায়িক পরিশ্রমকে অনেক সময় হীন চক্ষে দেখে। টাকার পুঁজি না থাকলেও শরীরের শক্তিকে মূলধন কোরে, গতর খাটিয়ে যে রোজগার করা যায় সেটা বাঙ্গালী বোধ হয় ভাবে না, আর ভাবলেও কোরতে চক্ষু-লজ্জা বোধ করে। সামান্য কুলির কাজে রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে মোট ব'য়ে বাইরের লোক কত পয়সা তাদের দেশে চালান করছে। হাওড়া বা শিয়ালদহ—অত বেশীদূর যেতে হবে না, আপনাদের কাছেই এই গোয়ালন্দের ষ্টীমার ঘাটে, কত কুলী রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা বাঙ্গালী ? শতকরা একটা মেলে কিনা সন্দেহ! গোয়ালন্দের নিকটস্থ হিন্দু-মুসলমান চাষীরা ইজ্জত ভয়ে একাজ করে না। কুলী ছাড়া কলের মজুর, ইলেকট্রিক আর গ্যাস কোম্পানীর মজুর ও কারিগর, কর্পোরেশনের জল ও আলো সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে, আপিসের বেয়ারা,

বাড়ীর রাঁধুনী, চাকর, দারোয়ান, বাগানের মালী ইত্যাদির কাজে ক'
বাঙ্গালী খুঁজে পাওয়া যায় ? সবই প্রায় হিন্দুস্থানী, বেহারী, উড়িয়ারা
আর নেপালী প্রভৃতি দখল কোরে বসেছে। এদের আয় গড়ে রোজ আ
আনার কম নয়। এতে কত পয়সা বাংলার বাইরে চলে যাচ্ছে! আ
আমার আত্মচরিতে দেখিয়েছি যে কেবলমাত্র সারনে (অর্থাৎ চম্পারণে
সদরে) পোষ্টআফিসে বছরে ১ কোটি টাকা বাংলা দেশ থেকে মণিঅর্ডা
হোয়ে চলে যায়। পোষ্টআফিসে মণিঅর্ডারের জায়গায় ভিড়ের ব
দেখলে তার কতকটা ধারণা কোরতে পারা যায়। এটা যে কে
আমার অনুসন্ধানের ফল তা নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযু
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেলার ইকনমিক্ কন্ফারেন্সে যে প্র
পাঠ করেছেন তাতেও তিনি ঠিক এই হিসাব দেখিয়েছেন। এই এ
কোটি টাকা কেবল মণিঅর্ডারে উঠে যায়, তাছাড়া ওদের গেঁজেতে অ
দেশোয়ালীর মারফৎ যে কত যায় তার হিসাব নাই। কল্কাত
কাপড়ের কল, পাটের কল, খিদিরপুর ডক্ প্রভৃতিতে অন্যূন ৬ লক্ষ লো
কাজ করে, তার মধ্যে শতকরা কয়জন বাঙ্গালী ? ভেবে দেখুন, এরা য
খাওয়া পরা ছাড়া মাসে ১০৲ টাকা উপায় করে তাহলে মাসে ৬০ লক্ষ
বছরে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাংলার বাইরে চলে যায়। অর্থনীতির দি
দিয়ে এটার যে কি বিষময় ফল তা আপনাদের একটু চিন্তা কোরে দেখে
বলি। গোয়ালন্দ থেকেও এই রকমে বছরে কত টাকা বাইরে চলে যায়।

এইতো গেল কায়িক পরিশ্রমের কথা; অর্থাৎ কুলি মজুর কর্তৃ
শোষণ। এ ছাড়া ব্যাবসা ক'রতেও বাঙ্গালী লজ্জা বোধ করে। বামু
কায়েতের ছেলে জুতোর ব্যাবসা কোরব কি কোরে, কোরলে লোকে কি
বলবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হোয়ে দেশের কত টাকা বাইরে পাঠিয়ে
দিচ্ছে। বেকার বোসে থাকার চেয়ে জুতোর দোকান কোরে দু'পয়স
উপায় কোরতে ইতস্ততঃ কেন ? তাতে যদি জাতই যায় পেটটা ভোরে

ত? সুখের কথা, আজকাল এই গোঁড়ামী অনেক পরিমাণে ক'মে গেছে; এখন বাঙ্গালীর জুতার দোকান দু'একটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চীনেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আবার হটে যাচ্ছে, কেন না তারা স্ত্রী-পুরুষে খেটে ব্যাবসা চালায়।

আজকাল একটা কথা সব যায়গায় শুনতে পাই, সেটা হচ্ছে 'Bengal for Bengalees'—বাংলা দেশ বাঙ্গালীর। কিন্তু যাঁরা এইকথা বলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি যে তাঁদের চাকর, রাঁধুনী, দরোয়ান, মালী প্রভৃতি কোথা থেকে আসে? বেহার, উড়িষ্যা আর পশ্চিম অথবা নেপাল ছাড়া গতি নাই।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ে থাকবার আর একটা কারণ, এবং প্রধান কারণ—শিক্ষার দোষ। ছেলেবেলা থেকেই বাঙ্গালীর মাথায় ঢুকে গেছে—

'লেখা পড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।'

লেখাপড়া শিখলেই চাই বড় বড় ডিগ্রী আর চাই চাকরী। চাকরী কোরে জুড়ি বা মোটর চোড়তে পারে ক'টা লোক? চাকরীর মধ্যে বেশীর ভাগই ত চুনো কেরাণী, মোটা মাইনের বা ক'টা? চাকরীর পয়সায় গাড়ী চড়বার ক্ষমতা জজ্‌ বা মন্ত্রীদের হোতে পারে। ঐ রকম চার পাঁচ হাজারী পদ মোটে ১০।১৫টি, কিন্তু কলকাতার এক এক জন ব্যাবসাদার অমন কত পাঁচ হাজার টাকা দিনে উপায় করে। বাঙ্গালী লেখাপড়া শিখে গোবর গণেশ হোয়ে পড়েছে, বিদ্যেকে কাজে লাগানো বোলতে ঐ I have the honour to be, Sir, Your most obedient servant পর্য্যন্ত—ব্যাস্। আমাদের কলেজের ছেলেরা এলুমিনিয়মের রাসায়নিক গুণাগুণ অনর্গল মুখস্থ আউড়ে যেতে পারে কিন্তু ওটা যে ব্যাবসার খুব লাভজনক উপাদান সেটা হয়ত জানেই না; বা জানলেও

তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গুজরাটীরা ওসব রাসায়নিক গুণাগুণের ধার ধারে না, তারা এর বাসন বানিয়ে ভরি দরে বিক্রী কোরে যাচ্ছে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; মোটামুটি প্রায় শতকরা ৮০ জনের জীবন-মরণ কৃষির উপর নির্ভর করে—কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই—কারণ তাঁরা 'ননীর পুতুল' রোদে গলে যাবেন; তার চেয়ে এদোর ওদোর ঘুরে একটা ২০৲।২৫৲ টাকার কেরাণীগিরি পেলে তাঁরা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। এই বৎসর বাংলা দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঁচিশ হাজার ছাত্র অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন পাশ কোরে কৃষিকাজ শিখতে যাবে? একজনও নয়। সকলেই উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী হবার জন্যে ছুটবে, সবাই নামের পিছনে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্যেই ব্যস্ত। এর জন্যে ছেলেদের অপেক্ষা তাদের অভিভাবকরাই বেশী দায়ী। তাঁরা প্রত্যেকে ভাবেন তাঁদের ছেলেরা হয় জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ না হয় অন্ততঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা উকীল অথবা ডাক্তার হ'বে। বাঙ্গালী জাতটা কি কেবল পরীক্ষায় পাস করা আর চাকরী করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে? ইংল্যাণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে দেখেছি, খুব প্রতিভাবান ছেলেদিগকেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়—আমাদের দেশের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাসের জন্যে ছুটোছুটি ক'রছে। বার বার ফেল কোরলেও আবার ঘুরে ফিরে পাস করবার চেষ্টা করে। এই ফেল করাটা যেন একটা ভয়ানক আক্ষেপের কথা; অনেক ছেলে ফেল কোরে আত্মহত্যা কোরেছে, কাগজে প্রায়ই দেখা যায়। আর অন্যান্য দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেল করে, জগতে কর্ম্মাধীন জীবনে তারাই সব চেয়ে বেশী সফলতা লাভ করে। যারা কখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়নি এমন কি এণ্ট্রান্স স্কুলেও ঢোকেনি তারাই জগতে অদ্বিতীয় হয়েছে। আমাদের দেশেও এরকম উদাহরণ আছে; যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বটকৃষ্ণ পাল, তারক-

নাথ প্রামাণিক ইত্যাদি। এই সহরে একটা কলেজ আছে ও দুটো হাই স্কুল আছে ; এই তিনটে বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই হাজার ছেলের মধ্যে ক'জন ছেলে এখানকার কৃষিক্ষেত্রে কি কি উন্নত প্রণালীতে কাজ হোচ্ছে তা দেখবার বা শেখবার জন্যে কিংবা কৃষিকাজ কোরলে কি রকম রোজগার হোতে পারে তা' আলোচনা করবার জন্যে সেখানে যান ? যাঁরা কৃষিবিদ্যা শিখতে চান তাঁরা মনে করেন বিলাতে না গেলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করা যায় না—সেইজন্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের স্কলারসিপের জন্যে দরখাস্ত করেন ও তার তদ্বিরের জন্যে ছুটাছুটি করেন অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন কৃষি শিখতে হোলে আগে রাধিকামোহন স্কলারসিপ্ বা এই রকম অন্য একটা স্কলারসিপ্ যোগাড় করা বিশেষ দরকার। এ সম্বন্ধে আমি গত ১৯২৯ সালে এই ফরিদপুরে যা বলেছিলুম আজ আবার তাই বলছি—

"আমি গত ৬০ বছরের বাংলার কৃষিবিভাগের ইতিহাস আজ নখদর্পণে দেখছি। স্যার এস্‌লি ইডেন যখন বাংলায় ছোটলাট ছিলেন, তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড খরচ ক'রে ২টি কৃষি-বৃত্তির প্রবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তি দ্বারা বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হোত। এদের জন্য সরকারের কম টাকা খরচ হয় নাই। বৎসরে এক একজনের পিছনে খরচ হোত ২৫০ পাউণ্ড; তখনকার দিনে এক শত পাউণ্ডের মূল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান। প্রথমবার যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু, মুসলমান ভদ্রলোকটি বেহারের সৈয়দ সহক্বৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকের নাম অম্বিকাচরণ সেন। তাঁরা শিক্ষালাভ কোরে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁদের অর্জ্জিত কৃষি-বিদ্যা কাজে লাগাবার সুযোগ হোল না। তাঁরা হোলেন তখন ষ্টাটুটরি সিবিলিয়ান—জেলার

ম্যাজিষ্ট্রেট। গভর্ণমেন্ট যেন তাঁদিকে পাঠিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছিলেন—কাজ দিতে বাধ্য—তারপর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মিঃ অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জি ও ভূপালচন্দ্র বোস। এঁরা আমার সমসাময়িক। ফিরে এসে এঁদের অধিকাংশকেই করতে হোল ডেপুটীগিরি। ব্যোমকেশবাবু হোলেন ব্যারিষ্টার; আর গিরীশবাবু স্কুল মাষ্টারীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে লাগলেন। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন যে কৃষি-শিক্ষার জন্য দেশের এতগুলো টাকা গেল 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'। বিলাতে শিক্ষালাভ করে সে শিক্ষার দ্বারা এদেশের কৃষির কোন উন্নতি করা চলে না। বিলাতে প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিংবা ২০০ একর জমি নিয়ে চাষবাস কোরে থাকেন। তাঁরা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করে চাষ করেন। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি; অধিকাংশেরই ১ বা ২ একর জমির বেশী হবে না; এবং তাঁরা নিরক্ষর। এজন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় না। দেশ, কাল, পাত্র না বিবেচনা করে, কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করলে তা' ফলবতী হয় না, এদেশের মধ্যেই যে-সব জায়গায় যে-সব চাষ-আবাদ উন্নত প্রণালীতে হচ্ছে, সে সকল জায়গা থেকে, তা' শিখে এসে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র কোরে সেই ভাবে ফসল উৎপাদন কোরে আমাদের চাষীদের দেখাতে পারলেই দেশের কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হবে। এজন্য বিলাত যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। এখন এ দেশেই রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে। উন্নতির জন্য এখানেই লোক পাওয়া যায়, দেবেনবাবুর মত লোকই যথেষ্ট।"

আমি বরাবরই বলে থাকি দেশের ছাত্রদের এবং যুবকদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—তাঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে

দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কর্ব্বেন, তা হোলে সহজে তা কোরতে পারেন। চীনদেশের ছাত্রেরা তাঁদের স্কুল কলেজের ছুটীর সময় দলে দলে গ্রামে বেরোন, তাঁদের সঙ্গে বড় বড় পতাকায় লেখা থাকে, "An ignorant man is more to be pitied than a blind man" অর্থাৎ অন্ধ অপেক্ষা মূর্খই অধিকতর করুণার পাত্র। তাঁদের সেই জন্যে প্রতিজ্ঞা, যেটুকু শিখেছেন তা দেশের লোকের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তাঁরাই আমাদের দেশের বহুকালের প্রচলিত বাক্য—

'বিদ্যা মহাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥'

একেবারে মজ্জাগত কোরে ফেলেছেন। তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণকে অস্থায়ীভাবে স্কুলে পরিণত কোরে ফেলে সেইখানে সর্ব্বসাধারণকে বিদ্যাদান কোরে থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ চীনদেশে সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজমান, গভর্ণমেণ্টও টল্‌মল্ কোরছে কিন্তু ছেলেদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র ও তৎপর। নিরক্ষরতা দূর হোলে, শিক্ষাবিস্তার হোলে, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সহানুভূতি বাড়ে এবং দেশের মধ্যে শান্তি বিরাজ করে। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অকারণ একটা মনোমালিন্য জেগে উঠেছে কিন্তু জনসাধারণ যদি দেখে যে লেখাপড়া শিখে 'বাবুরা' তাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করছেন, তাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করছেন, তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেছেন, সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্বার্থভাবে তাদের উন্নতি করবার চেষ্টা করছেন তাহলে পরস্পরের মধ্যে একটা বিশ্বাস স্থাপিত হবে, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা হবে, পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে; ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘুচে যাবে, দেশের অশান্তি চিরতরে বিনষ্ট হবে। স্কুল কলেজে বছরে ৬ মাস ছুটি ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ৭ মাস ছুটি, এই মহামূল্যবান সময়

তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে, ঘুমিয়ে, পরচর্চ্চা কোরে বৃথা সংহার না কোরে যদি ছাত্রযুবকদল দেশের উন্নতির চেষ্টা করে তাহলে কি অল্পদিনের মধ্যে দেশের শ্রী ফেরে না? তাহলে কি আমাদের বাংলা দেশ জগতের বরেণ্য হোতে পারে না? তাহলে কি দেশের হাহাকার দূরীভূত হোয়ে দেশের আকাশ বাতাস শান্তির সঙ্গীতে মুখরিত হবে না? তাহলে কি বাংলা দেশ দাসত্বশৃঙ্খল মোচন কোরে স্বাধীনতার আনন্দে যোগদান কোরবে না? আপনারাই বলুন, তাহলে কি বাংলা দেশ জগতের সামনে একটা দেশ বোলে পরিচয় দিতে পারবে না?

আমি গভর্ণমেণ্টের সকল কাজ সকল সময় অনুমোদন করি না—অনেক সময় গভর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করি; সেই জন্যে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান (Manchester Guardian) লিখেছিলেন, "He is one of the bitterest critics of the British Government" অর্থাৎ আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কঠোর সমালোচক-দের মধ্যে অন্যতম। আমি সকল কাজের ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে আরাম কেদারায় বসে থাকবার পক্ষপাতী নই। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক বিষয়ে নিজেরাই দেশের উন্নতি কোরতে পারি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'Heaven helps those who help them-selves' অর্থাৎ যাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হ'ন; কথাটা বড় সত্যি—বড় কাজের কথা। নিজেদের চেষ্টায় যে অনেক সহজে কাজ হোতে পারে তার অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায়; এখানে তার একটা আপনাদের বলি। আপনাদের জেলায় বাটীকামারী-চাওচা-বড়ইহাট খাল সংস্কারের কথা আপনারা জানেন কি? শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও তাঁর সহকর্ম্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় কত বড় একটা মহৎ কাজ সম্পন্ন হোয়েছে, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি; এতে দশের ও দেশের যে কি অসাধারণ কল্যাণ হোয়েছে তা বলা যায় না।

এই কষ্টসাধ্য কাজের পিছনে ছিল কেবল 'স্বাবলম্বনের চিরসুন্দর জয়গান আর আত্মত্যাগের অভিনব দীক্ষা।'*

আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার খুলনা জেলায় বাড়ী, সুন্দরবনের কাছে; ১৯১২ সালে হার্ট সাহেব খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই সময় তিনি সেখানে একটা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং আমাকে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম, আমরা বাঙ্গালী, ম্যাজিষ্ট্রেটকে সুন্দরবনের বাঘের মত ভয় করি, কাছে ঘেঁসি না। কিন্তু আপনাদের জেলার বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার পোর্টার যেভাবে আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন, যেভাবে আপনাদের স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা করছেন, যেভাবে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করছেন তাতে আর তাঁকে বাঘের মত ভয় করা চলে না; তাঁকে অতি নিকট আত্মীয়ের মতই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। তিনি আপনাদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন এবং যার দ্বারা আপনারা কচুরীপানা কোন কোন স্থান থেকে নির্ম্মূল করতে পেরেছেন, তা অতি বিরল। আমি আশা করি, আমি প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের মধ্যে যে জাগরণের সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা' আপনারা অটুট রাখবেন—আর তাঁর অনুপস্থিতিতে আবার আপনারা যেন নিঃসঙ্গ হোয়ে পড়বেন না।

আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, আমরা শক্তিহীন বা বুদ্ধিহীনও নই অথচ কি জানি কেন আমরা কিছুই করতে পারি না। নিরক্ষর কৃষকদের সঙ্গে গ্রামেই আমাদের কাজ করতে হবে, গ্রামের সকল সমস্যার সমাধান করবার জন্যে আমাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত হোয়ে থাকতে হবে, সেখান থেকেই আমাদের অন্নের সংস্থান করতে হবে। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে উদ্দেশ্য ঠিক কোরে লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিঃস্বার্থভাবে

* পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাজ করতে হবে। মনে রাখবেন Nation lives in the cottages. 'জাতির জীবন পর্ণ কুটীরে' এ কথাটা আমাদের দেশে যতটা খাটে তেমন আর কোন দেশেই নয়। যে সব জেলায় কেবলমাত্র একটা ফসল হয় সেখানকার চাষীরা বছরে প্রায় নয়মাস আলস্যে সময় কাটায়, যে সব জেলায় দুটো ফসল হয় সেখানকার চাষীরা বছরে প্রায় ৬।৭ মাস বিনা কাজে সময় নষ্ট করে। সময়ের এই যে নিদারুণ অপব্যবহার এর প্রতিকার আপনারা কোরতে পারেন—কৃষকদের মধ্যে নানারকম কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন কোরে তাদের অবস্থার উন্নতি বিধান কোরতে পারেন। নতুন নতুন ফসলের প্রবর্ত্তন করলেও তারা লাভবান হোতে পারে। ফরিদপুরকে সুজলা, সুফলা বলা যেতে পারে; রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের কার্য্যকলাপ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। তাঁর চেষ্টায় এ জেলায় অনেক উন্নত শ্রেণীর ফসলের প্রবর্ত্তন হোয়েছে; সেগুলো যদি আরও প্রসার লাভ করে তবেই কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে। বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রচণ্ড রোদে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমস্ত দিন ক্ষেতে খাটে এবং কুয়া থেকে জল তুলে ফসল বাঁচায় কিন্তু ফরিদপুরে সে রকম পরিশ্রমের দরকার নাই; এখানে জমিতে সোনা ফলে। এমন সুজলা সুফলা দেশের চাষীদের অবস্থা কেন এত শোচনীয় হবে? প্রচার কাজের সাহায্যে তাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে; প্রচার কাজের জন্যে কর্ম্মীর প্রয়োজন; আপনারা যদি এই ব্রত গ্রহণ করেন যে প্রত্যেকে অন্ততঃ দশ জন নিরক্ষর কৃষকের নিরক্ষরতা দূর করবেন তা হোলে দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হোয়ে যাবে।

সবচেয়ে বেশী অভিযোগ আমার অনুপস্থিত জমিদারদের (Absentee landlords) বিরুদ্ধে। তাঁরা নিজেদের দেশ ছেড়ে প্রবাসে থেকে দেশের যেমন শত্রুতা করছেন এমন শত্রুতা আর কেউ করছে না। জমিদার যতই অত্যাচারী, অমিতব্যয়ী হোন না কেন যদি তাঁরা দেশে থাকেন তবে দেশের

কতকগুলা লোক প্রতিপালিত হয়। পথ, ঘাট, জলাশয় ইত্যাদির সংস্কার হয়। তাঁরা প্রজার রক্ত শুষে চৌরঙ্গীতে থাকবেন, রোলস্‌রইস্‌ মোটরে চোড়বেন, আর গ্রামে কেবল তাগিদ পাঠাবেন টাকা পাঠাও। এই ফরিদপুর জেলাতেই অনেক বড় বড় জমিদারি আছে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জমিদারি, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমিদারি, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারি ইত্যাদি। কিন্তু এসব জমিদারির জমিদার সকলেই কলকাতাবাসী; নায়েব গোমস্তার দ্বারাই জমিদারি চালান। জমিদাররা প্রজার দুঃখ দৈন্য জানতেও পারেন না—এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হোতে পারে?

আমার আর কিছু বলবার নেই; আর যা বলেছি তা খুবই পুরানো ও নীরস। আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্যচ্যুতি হোয়েছে। হয়ত আপনারা অনুতাপ কোরছেন যে আমাকে আজ এখানে এনে আপনারা ঠকেছেন। যাই হোক্‌, আজকাল আমাদের যা' প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বোলে আমার বক্তব্য শেষ কোরব। যখন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাগজে প্রকাশিত হোল ও যখন সেই ব্যবস্থাতে দেখলুম যে প্রচার কাজের জন্যে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হবে—তখনই আমি মনে কোরেছিলুম যে রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্রই এই কাজের উপযুক্ত লোক; শেষে দেখলুম গভর্ণমেণ্ট তাঁকেই নিযুক্ত কোরেছেন। এই জন্য গভর্ণমেণ্টকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি; আমি অনেক জেলায় ঘুরেছি, সরকারী কর্ম্মচারী দেখেছি; কিন্তু কৃষকদের মধ্যে এমন অবাধে মেলামেশা কোরতে পারে, সকল কাজে তাদের বিশ্বাস আনতে পারে, সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা টেনে আনতে পারে—এঁর মত এমন কর্ম্মচারী দেখিনি। কিন্তু আমি শুনেছি যে যদিও তাঁকে এত বড় একটা কাজ দেওয়া হোয়েছে কিন্তু "ধনস্থানে তাঁর শনি" আগে যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে। যাই হোক্‌ তিনি এই কাজের জন্যে তাঁর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহের সহিত অদ্ভুত পরিশ্রম কোরছেন; তাঁর প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি

সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন এমন কি আমার অসুস্থ শরীরেও আমার কাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে একটা লেখা নিয়েছেন, সেই লেখাটা এখানে আপনাদের শোনাচ্ছি; তা হোলেই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে পারবেন। আমি আশা করি আপনারা এই সমস্যার সমাধান কল্পে আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কোরবেন। আপনারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে পাটের দাম ক'মে যাওয়ায় সকলেরই হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ কোরছে।

"পাট বাংলার কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং ইহা বাংলার কৃষকদের একচেটিয়া ফসল; পাটই বাংলার প্রধান কৃষিসম্পদ। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ পাটই বাংলার কৃষকদের ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হয়েছে।

সকলেই—কি নিরক্ষর, কি শিক্ষিত ব্যক্তি—জানেন যে, কোন জিনিষের চাহিদার দ্বারাই সেই জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হোয়ে থাকে এবং ইহাও জানেন যে চাহিদার অতিরিক্ত কোন জিনিষ উৎপন্ন হোলে বা বাজারে এলে সেই জিনিষের দাম কমে যায়। পাটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে কাঁচা পাটের চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচা পাট উৎপন্ন হচ্ছে ও বাজারে আসছে, সেই জন্যই পাটের মূল্য এত কমে গেছে।

আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী; আমরা এতই অকর্ম্মণ্য যে জেনে শুনেও কোনও কাজ নিজেরা কোরতে পারি না; আমরা সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর কোরে থাকি; আমরা গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়ে আরাম চেয়ারে বোসে বড় বড় সমস্যার সমাধান কোরবার চেষ্টা কোরে থাকি।

আজ যদি বাংলার শিক্ষিত সমাজের বিশেষতঃ জমিদারবর্গের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকত, আজ যদি তাঁরা এত অসাড় ও নিস্পন্দ না হোয়ে

পোড়তেন, আজ যদি তাঁরা সকল কাজের ভার পরের ওপর চাপিয়ে চুপ করে বসে না থাকতেন, আজ যদি তাঁরা মুখে "দেশ সেবক" না হোয়ে কাজে দেশ সেবক হোতেন তাহোলে পাটের দাম এত কমে যেত না এবং দেশের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হোত না। তাঁরা যদি প্রত্যেক গ্রামের কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ কোরে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে প্রচার কার্য্যের দ্বারা পাটের মূল্যের অবনতির কারণ প্রত্যেক কৃষককে বুঝিয়ে দিতেন তা হোলে বাংলার ঘরে ঘরে আজ এত অভাব হোত না।

বাংলার কৃষক দরিদ্র হোতে পারে, বাংলার কৃষক অশিক্ষিত হোতে পারে কিন্তু বাংলার কৃষক অবুঝ নয়; বাংলার কৃষক মূর্খ নয়; সে তার হিতাহিত বুঝতে পারে। যদি তাকে এতদিন তার আপনার লোকের মত কোরে পাটের দামের অবনতির কারণ ও তার উন্নতির উপায় বুঝিয়ে দেওয়া হোত, তা হোলে পাটের চাষের জন্য বাংলার এমন দুর্দ্দশা হোত না।

সকলেই জানেন যে, আমি গভর্ণমেণ্টের সকল কাজ সকল সময় অনুমোদন করি না—কিন্তু আমি বাংলার মঙ্গলের জন্য গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আমি রসায়নবিদ্ হোলেও ব্যাবসাদার। আমি বুঝি সরবরাহ ও চাহিদার সম্বন্ধ, আমি জানি আজকাল যত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় পৃথিবীর চাহিদার অনুপাতে তা খুবই বেশী; এত বেশী পরিমাণ পাটের কোনই প্রয়োজন নাই। হিসাব কোরে দেখা গেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে পাটের কলে, মহাজনদের গুদামে কম পক্ষে এক বছরের কাজের উপযোগী বাড়তি কাঁচা পাট মজুত আছে—এই বাড়তি মজুত পাট নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাটের দাম বাড়বার কোনই আশা নাই। আমি মনে করি, দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল কোরতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন তা হোলে আগামী বছরে পাটের দাম বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সেই জন্য আমি দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককে এই কাজে ব্রতী হবার জন্য আহ্বান কোরছি।

দেশের কৃষকদের আমি বলতে চাই যে, তাঁরা যেন মনে রাখেন—তাঁরাই বাংলার মেরুদণ্ড; তাঁরাই বাংলার ৫ কোটি লোকের আহার যোগাচ্ছেন ও লজ্জা নিবারণ কোরছেন; তাঁদের উপরই বাংলার উন্নতি ও অবনতি নির্ভর কোরছে; তাঁদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা যেন সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে সমবেত চেষ্টা দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করেন—এ বিষয়ে স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক হোলে দেশের ও দশের শত্রুতা করা হবে। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে সাক্ষী কোরে "পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ মন্ত্র" নিতে হবে। পাট চাষ কমালে কৃষকেরা মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। নানাবিধ রবিশস্য এবং চিনাবাদাম, তামাক, তিসি, আলু প্রভৃতির চাষ বাড়িয়ে তাঁরা অধিক টাকা উপার্জ্জন কোরতে পারেন—তা ছাড়া পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে যে জমি উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে আখের চাষ কোরে লাভবান হবেন।

আমি খুবই অসুস্থ, আমার সময়েরও খুব অভাব; তথাপি আমি আশা করি ২।১ জেলায় নিজে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা কোরবার সুযোগ পাবো।

আমার একমাত্র প্রার্থনা, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সফল হোক, পাটের দাম বাড়ুক। বাংলার কৃষকদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠুক। যাঁরা এ কাজে ব্রতী হোয়েছেন তাঁদের আমি আশীর্ব্বাদ কোরছি। ভগবান আপনাদের সহায় হোন।

বসবার আগে আবার আপনাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভগবানের কাছে, খোদার কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হোক।

পল্লীসংস্কারে সঙ্ঘ-শক্তি

আত্মবিস্মৃত বলিয়া বাঙ্গালী জাতির দুর্নাম আছে। এক্ষেত্রে জার্ম্মান রাজনীতিবিদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"What infinite aptitude slumbers in the bosom of a nation"—একটা জাতির বুকে অনন্ত শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিদ্রিত আছে। সেই সুপ্ত শক্তিকে যে জাতি যতখানি জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে তাহার জয়ও ঠিক ততখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে শক্তিসামর্থ্যের যে কত অপচয় হইতেছে তাহার লেখা-জোখা নাই। এদেশে যেখানে এক ফসলের অর্থাৎ শুধু ধান বা পাটের চাষ, সেখানে চাষীরা বৎসরে নয় মাস বসিয়া থাকে; আর যেখানে ধান ব্যতিরেকে পাট, সরিষা বা কলাই জন্মে, সেখানে বড় জোর আরো দুইমাসের মত কাজ হয় অর্থাৎ বাকী সাত মাস চাষীরা হাত পা কোলে করিয়া কাটায়। সাপ, ব্যাং প্রভৃতি শীতকালে সুষুপ্ত (hibernating) জীবের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়। দেশের নিদ্রিত কর্ম্মশক্তিকে যদি জাগ্রত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে ঐ নয় মাস ও সাত মাসে অসাধ্য সাধন করা চলে। লোকের সমবেত চেষ্টার মধ্যে এক উন্মাদনা আছে; তাহা জাগিয়া উঠিলে "কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?" কিন্তু আমাদের না আছে আত্মপ্রত্যয় না আছে সঙ্ঘ-শক্তির উপর আস্থা। বাংলার অধিকাংশ পল্লী ভেদ ও বিচ্ছেদের বিষে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

আজকাল পল্লীসংস্কার ও "Back to the Village" বলিয়া এক রব উঠিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা এ বার্ত্তা জোরগলায় প্রচার করিতেছেন,

তাঁহারা হইতেছেন সহুরে বাবু, আরাম-কেদারায় বসিয়া ইঁহারা কবিসুলভ রঙীন দৃষ্টি দিয়া দুনিয়াকে দেখেন এবং কল্পনা-প্রসূত বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া মনের উত্তেজনা লাঘব করেন। কিন্তু তাহাতে সত্যকার সমস্যার কতদুর নিরসন হয় তাহা বিচারের বিষয়। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশপ যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এ সম্পর্কে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই,—"Who is to bell the cat ?"—কে বা কাহারা অগ্রণী হইয়া এই পল্লীসংস্কারের কার্য্য করিবে,—দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য, হৃত সম্পদ আবার ফিরাইয়া আনিবে ?

ভূমিকায় মাত্র এই কয়টা কথা বলিয়া হাতে কলমে কি প্রকারে প্রকৃত পল্লীসংস্কার হইতে পারে, তাহার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিজের অসামান্য আত্মত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা ফরিদপুরের শ্রীমান চন্দ্রনাথ বসু জনসাধারণের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া 'আনন্দবাজার' পত্রিকার মারফত প্রচার করি। প্রায় ১০।১৫ হাজার বিঘা জমি জল-নিমগ্ন (water-logged) হইয়া পড়িয়াছিল, চন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সমবেত চেষ্টায় সেখানে এখন স্নিগ্ধ শস্য-শোভা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যে, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ঝুড়ি কোদাল লইয়া মাটী কাটিতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের আচরণে মনে হইল যে ইঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক। মুসলমানের স্বার্থই বেশী, কেননা পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান-প্রধান, ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইলে, পতিত জমির উদ্ধার হইলে, প্রকৃত লোকশিক্ষা হইলে যে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাই সমধিক উপকৃত হইবেন—এই সরল সত্য কথাটী আমরা ভুলিয়া যাই; অধিকন্তু কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোক কুমন্ত্রণা দ্বারা হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব বাধাইতে দ্বিধাবোধ করে না।

এরূপ সমবেত সাধারণ কার্য্যে আর একটা লাভের কথা আছে। কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে কেবল হিন্দু ও মুসলমানের কেন, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নবর্ণের পার্থক্যও চলিয়া যায়। গত মহাযুদ্ধে যখন খাদের নিম্নে থাকিয়া যুদ্ধ (Trench warfare) সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল—খাদের নিম্নে জীবন মরণ লড়াই, মাথা তুলিলেই শত্রুপক্ষের অব্যর্থ গুলিতে মরণের আশঙ্কা—তখন কে মুখে রুটী তুলিয়া দিতেছে তাহা নজর করিবার সময় নাই, কুলীন কি অকুলীন, সগোত্র কি ভিন্নগোত্র, বিচারের অবসর নাই; তখন "Death is ths leveller of all distinction"—মৃত্যু সকল পার্থক্য ঘুচাইয়া দেয়। দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ যখন বিপন্ন তখনও ঠিক এইরূপ যুদ্ধের অবস্থা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নমঃশূদ্র, ও মুসলমান ভেদ ভুলিয়া ঝুড়ি কোদাল কাঁধে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজে লিপ্ত। ফরিদপুরের কম্মিগণ খালের খাদে (trench) দাঁড়াইয়া এইরূপ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ভূমিকার কলেবর না বাড়াইয়া কর্ম্মীদের নিজস্ব বিবরণ নিম্নে তুলিয়া দিতেছি। পল্লীসংস্কারকল্পে বাংলা দেশের ভাগে সরকার ষোল লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মামুলী প্রথায় বড় বড় কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া কাজে নামিতে হইলে এই সামান্য টাকায় আর কি হইতে পারে? সরকারী কর্ম্মচারীদের রাহাখরচ ও ভাতার কল্যাণে, উহা কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে, কিন্তু চন্দ্রনাথ ও তাঁহার সতীর্থদিগের আদর্শে স্বাবলম্বী হইয়া চলিলে সামান্য টাকাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। বিগত ৪ঠা আগষ্ট ডাক্তার নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ফরিদপুর বাটিকামারী অঞ্চলের অধিবাসিগণের উদ্যোগে আমার সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন হয়। তথায় খাল-সংস্কার সমিতির সম্পাদক গোপালগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে রিপোর্ট পাঠ করেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বাটিকামারী-চাওচা বড়ইহাট খাল পুনঃ সংস্কারের পরিকল্পনা মহম্মত-পুর পরগণার লোকের নিকট একটি পুরাতন সমস্যা। এক সময়ে চাওচা বিলের মধ্য দিয়া একটি বহতা খাল ছিল—সে বহুকালের কথা। আমাদের অনেকেই খালের সে রূপ দেখে নাই। কালক্রমে ঐ খাল বুঁজিয়া যাওয়ায় এতদঞ্চলের জল-নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাতায়াতের দুর্ভোগ, ব্যাবসা ও বাণিজ্যের অবরোধ, সহসা জল বৃদ্ধি হেতু কৃষির দুর্গতি, পয়ঃপ্রণালীর অভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বহু অসুবিধায় ভুগিয়া ভুগিয়া এতদ্দেশের সর্ব্বস্তরের লোক বহু দিন হইতে অন্তরে অন্তরে খাল সংস্কারের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। উত্তরে কুমার নদ এবং দক্ষিণে গোহালা খালকে সংযুক্ত করিয়া একটি সোজা খাল কাটাইলে জলমগ্ন দেশের একটা গতি হইতে পারে এই আশায় জেলা বোর্ডে, সরকারী পূর্ত্তবিভাগে, ব্যবস্থাপক সভায় অনেক আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন চলিল, কিন্তু সকলই অরণ্যে রোদন হইল। অবশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী নবাব আলি চৌধুরী যখন মহকুমা পরিদর্শনে আসেন ঐ সময়ে বাংলার চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার Mr. Adams William-এর সম্মুখে ঐ প্রস্তাব করা হয়। শ্রীযুক্ত উইলিয়াম সাহেবও ঐ খালের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় সরকারের তরফ হইতে সরেজমীন তদন্ত ও জরীপের পর ৫০,০০০৲ টাকার একটি এষ্টিমেট (Estimate) প্রস্তুত হয়। ফরিদপুরের জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের চেষ্টায় বাংলা কাউন্সিলেও ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের সকল সাধু সঙ্কল্পের ন্যায় এটিও অর্থাভাবের অজুহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

"যে কার্য্য সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল, দরিদ্র দেশবাসী যে তাহা কল্পনায় আনিতেও সাহসী হইবে না ইহাতে বিস্ময়ের

আর কিছুই নাই। কিন্তু বারবার ব্যর্থকাম হইয়া যখন আমরা নিরাশার ঘন অন্ধকারে ডুবিতেছিলাম ঠিক সেই সময়ে গণদেবতার আসন টলিল। Heaven helps those who help themselves (যাহারা স্বাবলম্বী ঈশ্বর তাহাদের সহায়)—এই পুরাতন প্রবচনটি যে কেবল কথার কথা নহে, খাঁটি সত্য, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় ভাগ্য-বিধাতা এই অবস্থার সৃষ্টি করিলেন।

"পরমুখাপেক্ষা ও আবেদন ব্যর্থ হইবার পর আমাদের চৈতন্য হইল! বুঝিলাম যে নিজেদের পায়ে ভর দিয়া নিজেদেরই দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের অন্তরে যখন এইরূপ সঙ্কল্পের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে ঠিক সেই সময়ে কৃষক-বন্ধু কর্ম্মবীর চন্দ্রনাথ বসু যেন গণদেবের বাণী ও আশীর্ব্বাদ লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহারই নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা চাওচার মাঠে একত্রিত হইয়া সরেজমীন্ তদন্ত করেন। অপরাহ্নে বাটিকামারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়, তথায় সকলে একবাক্যে বাটিকামারী-চাওচা-বড়ইহাট খাল পুনঃ সংস্কারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার কার্য্য ও অর্থ সংগ্রহ চলিতে লাগিল। মস্‌জিদে ও মন্দিরে, গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে, গ্রাম্য স্কুল পাঠশালায় সমবেত হইয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে কোদালী স্পর্শ করিয়া শপথ লইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা অর্থের অপেক্ষা রাখিবেন না, নিজেরাই কোদালী হস্তে মাটি কাটিবেন। স্বয়ং জৈনপুরের পীর সাহেব মুসলমান ভ্রাতাদের এই কার্য্যে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য এক 'ফতোয়া' জারি করিলেন।

"বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫] তারিখে আমরা তিন চারজন বলুগ্রাম ক্যাম্পে চন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। ২৪শে ফেব্রুয়ারী খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে ঠিক হইল। চন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন, উহার

দুই দিন পূর্ব্বে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। ইতিমধ্যে তিনি কার্য্যারম্ভের জন্য নিম্নলিখিত ফর্দ্দ অনুযায়ী রসদ ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিতে বলিলেন।

চন্দ্রনাথের প্রাথমিক 'কার্ড'

(১) চাউল—পঞ্চাশ মণ, (২) ডাল—পনেরো মণ, (৩) তেঁতুল—দেড় মণ, (৪) কাঠ—একশত মণ, (৫) ঝুড়ি—১৫০০, (৬) নিশান—১৫০০, (৭) কোদালী—৫০, (৮) কলসী—১০০, (৯) রশি—৮০ হাত, (১০) নল—৮০ হাত, (১১) য়্যাসেস্‌মেণ্ট লিষ্ট, (১২) কর্ম্মী—২০ জন, (১৩) খাল সংস্কারে স্থানীয় মাতব্বরদিগের স্বাক্ষর সম্বলিত সম্মতি-পত্র। এতদ্ব্যতীত সূচনায় ন্যূনপক্ষে ১০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিবার পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ-শক্তি একবার জাগ্রত হইলে অর্থ আপনা হইতেই আসিবে, এই বিশ্বাসে আমরা প্রথমেই অর্থ সংস্থানের প্রস্তাবকে সমীচীন মনে করিলাম না। খালের কাজে জনসাধারণকে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একটি সময়োপযোগী গান রচনা করিয়া দিলেন। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

খালের গান

আকাশ কুসুম ফুটবে এবার, ছুটবে ধারা মরুর মাঝার
সফল হবে আশালতা, দেখবে সবাই চেয়ে—
(এবার) শুক্‌নো মাঠে যাবিরে তোরা, সাধের তরী বেয়ে।
দান কর ভাই পুণ্যে এখন যেমন শক্তি যার,
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার।
আয় না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার॥
পড়লে বিধির সরোষ দৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি
বিনাশ করে শস্য সকল, কৃষক নিরুপায়
(তার) নিরাশ প্রাণে আশার বারি ঢাল্‌তে কে না চায়?

শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার।
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার॥
খালের পরে ক্ষেত্র সকল দেখবি হবে শস্যে শ্যামল
আবার ক্ষেতে ফল্‌বে সোনা, ফুটবে চাষার হাসি,
(তারা) গাইবে সুখে ভাটিয়ালী, আস্‌বে সে সুর ভাসি
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার।
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার॥
ম্যালেরিয়ার বিষম গ্রাসে, মর্‌ছে কত বারোমাসে,
রইছে যারা জ্যান্তে মরা, অস্থি চর্ম্ম সার
এবার রাক্ষসী দূর হবে ভাই ভাবনা কিসে আর ?
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার।
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার॥
যাতায়াতের এ দুর্ভোগে, বিদেশবাসী দেশের লোকে ;
পথের কথা ভেবেই তারা, ধায় না দেশের পানে,
(তারা) মায়ের কোলে ফিরবে যদি পথের সুযোগ জানে।
শুষ্ক ধরার বুকে এবার বইবে জলের ধার।
আয়না ছুটে কোদাল ঘাড়ে খাল কাটি এবার॥

"গ্রামের পথে হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মীর দল ঐ গান গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিত বৃহৎ নিশান ও তৎসহ চন্দ্রনাথের সেই প্রাথমিক কার্ড। দেশের আপামর সাধারণ সাগ্রহে চাল ডাল ও প্রাথমিক কার্ডে লিখিত দ্রব্য সামগ্রী দিয়া আমাদের ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টি-ভিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মোট কথা চতুর্দ্দিকে উৎসাহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ১০ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে কর্ম্মীর দল চন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া 'স্বর্ণ কুটীরে' লইয়া আসেন। যুদ্ধাভিমুখী সৈনিক দলের পুরোভাগে

অবস্থিত সেনাপতির ন্যায় নিশান হস্তে বীর চন্দ্রনাথ যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখনকার সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। ঐ দিবস ও তৎপর দিবস ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বহু সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। ১২ই ফাল্গুন রাত্রিশেষে চন্দ্রনাথ সর্ব্বসমক্ষে শপথগ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মস্থলে অভিযান করিলেন। নিশান উড়াইয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, গান গাহিয়া, কর্ম্মীর দল ঝুড়ি কোদাল হস্তে ছুটিলেন চাওচার মাঠে। দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে আট ঘটিকার মধ্যেই অন্যূন ১৪.১৫ হাজার হিন্দু মুসলমান সমবেত হইল। তখন চন্দ্রনাথ বড় নিশানটি একস্থানে পুঁতিয়া অনুমান দেড় মাইল ব্যাপী একটি লাইন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ব্যাণ্ড বাদ্যের সঙ্গে কোদালী তালে তালে উঠিতে পড়িতে লাগিল।

"এইরূপে চন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতার গুণে তিন মাইল ব্যাপী খাল ও তাহার পার্শ্ব দিয়া একটি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ষা আসিয়া পড়ায় বাধ্য হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

রিপোর্টের উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় খাল সংস্কার কার্য্যে যাঁহারা অগ্রণী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। বাহুল্যবোধে উহার উল্লেখ করিলাম না।

ফরিদপুরের এক গণ্ডগ্রামের মাঠে খাল কাটা হইয়াছে শুধু এই সংবাদটি দিবার নিমিত্তই এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। সঙ্ঘ-শক্তির জাগরণ ও চন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি মিলিত হইলে যে কি অসাধ্য সাধন করা যায় তাহারই একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিলাম। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিস্ময়ের কথা এই যে, উক্ত অদ্ভুতকর্ম্মা বীর চন্দ্রনাথ তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার ধার ধারেন না। ইংরাজী শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাপরাশই তাঁহার নাই; থাকিলে হয়ত 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার' মত এ দুর্ম্মতি তাঁহার হইত না।

আমাদের হৃত-শ্রী পল্লীগ্রামের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অচিরে প্রতিকারের উপায় না করিতে পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইবার আশঙ্কা। দৃষ্টান্তস্বরূপ কচুরী পানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ ও তাঁহার সতীর্থগণের ন্যায় স্বাবলম্বী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিলে উহা অচিরে দূর হইতে পারে। জেলা বোর্ডের বা সরকারের নিকট পুনঃপুনঃ আবেদন করিয়া যাহা হয় নাই তাহা আত্ম-চেষ্টায় অনায়াসে হইতে পারে। প্রতি গ্রামে যেদিন একজন করিয়া চন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইবে সেদিন পল্লী তাহার হৃতসম্পদ ও শ্রী ফিরিয়া পাইবে। শুধু "Back to the Village" বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, হাতে-কলমে পল্লী-সেবায় নামিতে হইবে। সুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগ্রত করিয়া আগে গ্রাম বাসোপযোগী করিতে হইবে।

চা-এর প্রচার ও দেশের সর্ব্বনাশ

এক শতাব্দীর পূর্ব্বে লর্ড মেকলে আমাদের লক্ষ্য করিয়া এক অতি সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন—"এমন এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে যাহাদের কৃষ্ণ চর্ম্মের নিম্নে ভারতীয় শোণিত প্রবাহিত হইবে সত্য, কিন্তু রুচি, মতামত ও চিন্তার ধারায় তাহারা হইবে সম্পূর্ণ ইংরেজভাবাপন্ন।" মেকলের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়, নতুবা ১৮৩২ সালের সেই সঙ্কল্প আজ ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, এমন করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে কেন? আমরা যে শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রেই নিজস্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা নহে, কর্ম্মদোষে সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী ও পরানুচিকীর্ষা আমাদের শিরোভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শাসকজাতির আচার-ব্যবহার ও বেশ-ভূষার অনুকরণে আমরা যেরূপ পটুতার পরিচয় দিয়াছি তাহাতে অপর প্রদেশের লোক এখনও বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের নিকট শিক্ষানবিশী করিতে পারিবে। প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিসে (ব্যবসায়ে) বসিলেন, তখন তিনি বাসা লাইলেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে, যাহাকে কলিকাতার ওয়েষ্ট এণ্ড (West End)* বলা চলে। সাহেবী কেতায় বৈঠকখানা সজ্জিত হইল, আচার-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায় দেখিতে তিনি একজন পুরা সাহেব হইয়া পড়িলেন। বার লাইব্রেরী হইল এই সকল নূতন নূতন হালচালের আদিপীঠ, তথা হইতে উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত সমাজের বরাবর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পৌছায়। তথা-

---

* লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পল্লী বিশেষ।

কথিত ভদ্রসমাজে যাহা কিছু নূতন চালচলন আজ প্রচলিত হইবে, দুই দিন পরে জনসাধারণ্যে তাহাই অতি আগ্রহে গৃহীত হইবে।

বাংলা দেশ তামাকের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের আবাদ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী সিগারেটে বাজার ছাইয়া যাইতেছে এবং দেশী তামাক ছাড়িয়া লোকে ঐ সকলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। পথের ভিক্ষুক হইতে মাঠের চাষী পর্য্যন্ত কেহই আজ সনাতন হুঁকা হইতে তামাক সেবন করিতে চাহে না। ফলে দেশী তামাকের চাষ ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে।

ঠিক ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কু-অভ্যাস একে একে সমাজের উচ্চস্তর ও মধ্য স্তরকে প্লাবিত করিয়া সম্প্রতি সর্ব্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ জনসাধারণ্যে নামিতেছে। পূর্ব্বে চা-পান ব্যাপারটি এদেশে একরূপ অজ্ঞাত ছিল। কুক্ষণে সাম্রাজ্যবাদসুলভ শাসন ও শোষণ নীতির প্রধান পুরোহিত লর্ড কার্জ্জন ইউরোপীয়ান টী-এ্যাসোসিয়েশনকে (European Tea Association) এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন—"তোমরা ইউরোপ ও আমেরিকায় অর্থব্যয় করিয়া ভারতীয় চা-এর প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, কিন্তু তোমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ভাল করিয়া চাষ-আবাদ করিলে ঐ ক্ষেত্রেই অপর্য্যাপ্ত ফসল ফলিতে পারে—দূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

কেবল উপদেশ দানে টী-এ্যাসোসিয়েশনের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, অধিকন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি চা-এর রপ্তানীর উপর এক শুল্ক বসাইলেন, তাহা হইতে প্রায় ১৩—১৪ লক্ষ টাকা উঠিল। ইহার অধিকাংশই তিনি টী-এ্যাসোসিয়েশনের হস্তে দিলেন। অতঃপর ঐ অর্থে চা-এর স্বপক্ষে ভীষণ প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইল এবং উক্ত প্রচারকার্য্য যে এখনও পুরামাত্রায় চলিতেছে তাহা সংবাদপত্রের

স্তম্ভে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নমুনাস্বরূপ একটি বিজ্ঞাপন হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"প্রাণশক্তি ও উৎসাহের উৎস এবং ম্যালেরিয়ানাশক ভারতীয় চা।" "দরকার হলেই, ভারতীয় চা ব্যবহার ক'রে অচিরে শরীর-মন সতেজ ক'রে তোলা যায়, এ যে কত বড় সান্ত্বনা তা বলা যায় না। সারাদিনের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম বা মাথার কাজের পর এক পেয়ালা ভালো ভাবে তৈরী দেশী চা খেলেই শরীর সজীব ও মন প্রসন্ন হয়ে উঠবে। সত্যই চা জাগ্রত জীবনীশক্তির ভাণ্ডার। সকাল বেলা নিয়ম ক'রে অন্ততঃ দু' পেয়ালা ভালো দেশী চা রোজ পান করুন। জড়তা দূর হয়ে যাবে, সমস্ত দিন শরীর মজবুত থাকবে। আবার দিনের শেষে দু' পেয়ালা চা পান করবেন,—সারাদিনের খাটুনির পর মধুর বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উক্ত শুল্কলব্ধ অর্থে প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় চৌরাস্তায়, যেমন বৌবাজার ও ঠন্‌ঠনিয়ার মোড়ে, চা-এর দোকান খোলা হইল। সেখান হইতে পেয়ালা পেয়ালা চা এবং ছোট ছোট মোড়কে করিয়া এক পয়সা মূল্যের পাতা চা মুক্তহস্তে বিতরিত হইতে লাগিল। এইরূপে চার ফেলিয়া যখন লোকের মন চা-এর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল তখনই আসিল টোপ ফেলিবার পালা। টোপ গিলিতেও অধিক বিলম্ব হইল না, শিক্ষিত সমাজ ত গিলিলই, এমন কি কুলী, মজুর, গাড়োয়ান—কেহই বাদ পড়িল না। শুধু কলিকাতায় নহে, সারা ভারতবর্ষের বড় বড় রেল ষ্টেশন, মেলায়, হাটবাজারে চা-র ভাটি খুলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করা হইতে লাগিল। সম্প্রতি নদীবহুল পূর্ব্ববঙ্গে টি-এ্যাসোসিয়েশনের নৌবহর অবতীর্ণ হইয়াছে, বাংলার পল্লী-গগন ইহারা চা-এর জয়গানে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

শীত-প্রধান দেশে চা-পানের কিছু প্রয়োজন থাকিতে পারে সত্য,

কিন্তু আমাদের উষ্ণ দেশে উহার কোনই সার্থকতা নাই। সাহেবেরা যখন চা-পান করে, তখন তাহার সঙ্গে অনেক কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী পেটে পড়ে, কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের স্বল্প-বেতনভুক, শীর্ণ কেরাণী আহার্য্য ও পানীয়ের উভয়বিধ প্রয়োজন চা-পান দ্বারাই মিটাইয়া থাকেন। আপিসে আসিয়া ২।১ ঘণ্টা কাজে বসিতে না বসিতেই ইহারা চা-এর তৃষ্ণায় কাতর হন। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে চা-পান করিয়া ইহারা ক্ষণিকের জন্য কিঞ্চিৎ আরাম ও উত্তেজনা এবং স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন। আবার সেই একঘেয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—মধ্যে মধ্যে চা-এর পেয়ালায় চুমুক, ইহাই হইল কেরাণীর দৈনন্দিন জীবন। এই প্রকারে সারা দিনরাতে প্রায় পাঁচ-ছয় পেয়ালা চা। এই বদ অভ্যাসের স্বপক্ষে তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, উহাতে ক্ষুধা নষ্ট হয়, সুতরাং ব্যয়সাধ্য পুষ্টিকর আহার্য্যের আর প্রয়োজন থাকে না।

কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানের দিক দিয়াই নহে, পরন্তু অর্থনীতির দিক দিয়াও চা-পান যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহাও দেখাইব। বাংলা দেশে যত চা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৬ ভাগ আসে ইংরাজের বাগান হইতে। অবশিষ্ট মাত্র ৪ ভাগ জন্মে বাঙ্গালী ও আসামী মালিকের বাগানে। চা-পানের অভ্যাস যদি এখনকার ন্যায় দ্রুতগতিতে জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে থাকে, তাহা হইলে বৎসরে মাথা পিছু ন্যূনপক্ষে এক টাকা করিয়া ধরিলেও বাংলা দেশের পাঁচ কোটি লোকের চায়ের ভোগে বৎসরে পাঁচকোটি টাকা বিদেশীয়-গণের করতলগত হইবে। কুলী-মজুরের পারিশ্রমিক হিসাবে এই পাঁচ কোটি টাকার কিয়দংশ দেশের লোক পাইবে সত্য, কিন্তু হায়, এই শ্রমিকের দলও অবাঙ্গালী!

চায়ের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য টী-এ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রচারব্যপদেশে যে সকল হেয় উপায় অবলম্বন

করা হয়, উহা নীতিধর্ম্মের দিক দিয়া কোনক্রমেই সমর্থন করা চলে না। অজ্ঞ ও সরলমতি কৃষকরাই হইল এই মৃগয়ার প্রধান শিকার। তাহাদের মনে একটা কৃত্রিম ও অস্বাস্থ্যকর রুচি তথা অভাব বোধ জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াসে অশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং স্থানবিশেষে ছায়াচিত্রের সাহায্যও লওয়া হয়। অতিরঞ্জন, অভিভাষণ ও মিথ্যাভাষণ উক্ত প্রচার কার্য্যের মূলমন্ত্র। ইউরোপে চা-এর বাজারে মন্দা যাইতেছে, তাই সেখানকার মন্দা এতদ্দেশে উশুল করিবার জন্য টী-এ্যাসোসিয়েশন জন সাধারণের মুখে চা-এর বিষপাত্র তুলিয়া ধরিতে মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন। ৫।৬ কোটি ভুখারী—দারিদ্র্য ও উপবাস তাহাদের নিত্য সঙ্গী, পেট ভরিয়া আহার কাহাকে বলে জানে না, কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? অর্থলোলুপ স্বার্থান্বেষী ধনিক ও বণিক সমাজ স্বকার্য্যসাধনে কোন হীন উপায় বা চাতুরীর আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হয় না। মিথ্যা প্ররোচনায় মুগ্ধ করিয়া হতভাগ্যদিগকে উর্ণনাভের জালে জড়িত করিতে ইহাদের উৎসাহের অন্ত নাই। উচ্চকণ্ঠে চা-এর স্তুতিগান চলিতে থাকে—"ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক, কাশরোগের অমোঘ ঔষধ"—আরও কত কি!

দশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে পর্য্যটন কালে তথাকার একটি ঔষধের কারখানায় গিয়াছিলাম, দেখিলাম রাশি রাশি কোকেন প্রস্তুত হইতেছে। জাপানে এবং অন্যত্র এইরূপ কোকেনের অভিযান চলিতেছে, কিন্তু এই কোকেনের রাশি যায় কোথায়, কি কাজে লাগে? পৃথিবীতে যত কোকেন প্রস্তুত হয় তাহার অতি অকিঞ্চিৎকর অংশই রোগ নিরাময়ে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট যায় নেশার খোরাকে। এই সর্ব্বনাশা মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিবারণকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) উদ্যোগে যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু সঙ্ঘের সকল বিধি-নির্দ্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কোকেনের

বে-আইনী প্রস্তুত-করণ কারবারের গুপ্তলীলা অবাধে চলিতেছে। চা-এর প্রসঙ্গে কোকেনের উল্লেখ অবান্তর হইলেও উভয় ব্যাপারে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই মূলে একই কলঙ্কের কাহিনী—মুষ্টিমেয় নির্মম ধনিকের লালসা-বহ্নি, তাহাতে পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি দিতেছে মূর্খ ও মূক জনসাধারণ।

চা ও কফি স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর, সে বিষয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতামত সুস্পষ্ট। একে একে কয়েকজনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তন্মধ্যে ভিষক্-শিরোমণি নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, ডি, মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—"সনাতন কাল হইতে বাংলা দেশের ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গুড়-ছোলা, আদা-ছোলা, ছোলা-মুড়ি, ফেন-ভাত কিংবা দুগ্ধ—যাহার যেমন সঙ্গতি—প্রাতরাশ রূপে ব্যবহৃত হইত। কি পুষ্টিকারক শক্তির সামঞ্জস্যে, কি ভাইটামিন-সম্পদে এ সকল খাদ্যের তুলনা হয় না। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ মাখন-মিছরী কিংবা ছানা সংযোগ করিলে সোনায় সোহাগা হইয়া যাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইণ্ডিয়ান টী-এ্যাসোসিয়েশন আপনাদের কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের মধ্যে চা-পান প্রথা প্রচলন করিবার জন্য এক বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন। দরিদ্র দেশবাসীর ভাগ্যে দৈনন্দিন আহার্য্য যদি বা জুটিত, চা-এর বাহুল্য তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল, সুতরাং হয় চা, নয় আহার—দুইটার একটা তাহাকে বাছিয়া লইতে হয়। ইহাই হইল পানীয়ের পর্য্যায় হইতে খাদ্যের পর্য্যায়ে চা-এর ক্রমপরিণতি। দেশবাসিগণকে চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রথা হইতে স্খলিত করিবার জন্য যখন এইরূপ ষড়যন্ত্র ও প্রচার চলিতেছিল, তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য কেহই ছিল না। দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। চা-এর মধ্যে খাদ্য হিসাবে যদি কিছু গুণ থাকে তবে তাহা উহার দুগ্ধে; কিন্তু এই

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ণ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া টী-এ্যাসোসিয়েশন দেশের চিরন্তন খাদ্যনির্ব্বাচন রীতির বিরুদ্ধে অবাধে আপনাদের স্বার্থতুষ্ট অভিযান চালাইতেছেন এবং তাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নিরীহ দেশবাসী নিঃসংশয়ে এই বিষাক্ত পানীয় সেবন করিয়া স্বাস্থ্য জলাঞ্জলি দিতেছে।"

ডাঃ এস, ওয়াল্‌টার কার, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস (লণ্ডন) বলিতেছেন,—"চা ও কফি হৃদ্‌যন্ত্র এবং স্নায়ুমণ্ডলকে উত্তেজিত করে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত চা-ও যদি অতিমাত্রায় পান করা যায় তাহা হইলে বদহজম, স্নায়ুবিকার, হৃৎস্পন্দন, শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা প্রভৃতি নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করে। খাদ্যের পরিবর্ত্তে চা-এর ব্যবহার করা কিংবা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত গ্লানি নষ্ট করিবার জন্য চা ও কফি পান করা, অথবা মস্তিষ্ক যখন বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে তখন চা ও কফি পানে তাহাকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করা—এ সকল অতি সর্ব্বনেশে অভ্যাস।"

কিছুদিন পূর্ব্বে উইনিপেগে ব্রিটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের এক অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে কেম্ব্রিজের ডাঃ ডবলিউ এফ, ডিক্সন "মাদক দ্রব্যে আসক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। যতপ্রকার উত্তেজক দ্রব্য আছে, তাহাদের তুলনামূলক বিবরণ দিবার ছলে তিনি বলিয়াছিলেন—"স্নায়ু-বিকারের যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ক্যাফিন নামক মাদক দ্রব্যের নিয়মিত ব্যবহার অন্যতম। চা ও কফিতে এই ক্যাফিন রহিয়াছে। এক পেয়ালা চায়ে এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন থাকে, সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী ব্যক্তি দিনে পাঁচ হইতে আট গ্রেণ ক্যাফিন গ্রহণ করেন। ইহা নিতান্ত অবহেলা করিবার কথা নহে। চা-পানের ফলে পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাকেই 'টী ডিস্‌পেপসিয়া' বলে। বেশী চা-পান করিলে অম্ল, পেট কামড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ও হৃদ্‌যন্ত্রের নানারূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে।"

ডাঃ জন ফিসারের মত এই যে, প্রথমে উত্তেজনা আনয়ন করিলেও চা-পানের পরিণামে একটা অবসাদের ভাব আসিবেই ; তখন সেই অবসাদ দূর করিতে পুনরায় চা-পানের প্রয়োজন হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা ও অবসাদের ফলে চা-পায়ীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। অজীর্ণ, অনিদ্রা, রক্তাল্পতা, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মদ্যপানের অভ্যাস, এমন কি মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ডাঃ জে, বেটি টিউক বলেন যে, হুইস্কির বোতল কিংবা চায়ের পাত্র ইহাদের কোন্‌টি যে অধিকতর মারাত্মক, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

সহরে প্রতিপালিত মা লক্ষ্মীদের মধ্যে চা-এর নেশা বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে এবং যে সমস্ত পল্লীতে সহুরে মহিলারা বধূরূপে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা চা-পান প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। তাঁহাদের শিশুরা পর্য্যন্ত মাতৃক্রোড়ে চা-পান শিখিয়া এই নেশায় বিভোর হইতেছে। অনেক বাড়িতে দেখা যায়, ৫ হইতে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুগণ দুগ্ধের সঙ্গে চা মিশাইয়া না দিলে সেই দুগ্ধ পান করিতে বিরক্তি প্রকাশ করে। এমন কি, অল্প করিয়া চা মিশাইলে তাহা ঠেলিয়া ফেলে এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলে, বে এ দুধ যে 'সাদা' অর্থাৎ বেশী করিয়া চা ঢালিয়া ইহার রং লোহিতাভ করিয়া দেও। বলা বাহুল্য, শৈশব অবস্থা হইতে এই প্রকার চা-খোর হইলে পরিণামে তাহারা পূর্ণ মাত্রায় চা-পানে আসক্ত হয় ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে ভোগে।

———

বিড়লা ও গোকুল সিংহ

[বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক কেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাবসা ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইতেছে পূর্ব্বে তাহার অনেক নিদর্শন দিয়াছি, আরো দুইটি জীবন্ত উদাহরণ দিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি। সমাজের দুই পৃথক স্তরের লোক হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা মূলগত সামঞ্জস্য আছে, অর্থাৎ একজন কৃতী অর্থনীতি বিশারদ বড ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী ও অপরজন মাত্র দিনমজুরী-খাটা বিহারী, কিন্তু উভয়েই যোগ্যতা গুণে গুণী।]

(১)

শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা

আত্রাই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পব কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রকাশিত ১৯৩৩ সালের ভারতেব বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্টান সমূহের তালিকার (Large Scale Industrial Establishment in India—1933) একখণ্ড আমার হস্তগত হয়। বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ সাংবাদিক ও অর্থনীতিবিদের নিকট তালিকাটিব কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ইহা হইতে শিল্পজগতে বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এই তালিকা হইতে জানা যায় যে, শিল্প-প্রতিষ্টান ও উহাতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হিসাবে বাংলা দেশ ভারতের শিল্প জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে; কেননা ১৯৩৩ সালে বাংলার ১৮৯টী শিল্প-প্রতিষ্টানে মোট ৪,৩৪,২৮৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল, ও ঐ সময়ে বোম্বাই

প্রদেশের ১৮৬টী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ৩,১১,৩৫৪ জন লোক কাজ করিত। ইহাও সত্য কথা যে, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশ সমধিক অগ্রগামী। অন্যান্য দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা হইতে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়; কিন্তু বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া যদি বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালী জাতির আর্থিক অবস্থার পরিমাপ করা হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালনায় বাঙ্গালীর কোন হাত নাই, এমন কি কল-কারখানায় মজুরী করিয়াও তাহারা যে দুই পয়সা উপার্জন করিবে সে সুযোগও তাহাদের নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি। ২৯৩৩ সালে বাংলা দেশের ৯২টী পাট কলে ২,৪৬,১১৭ জন মজুর দৈনিক কাজ করিত, কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা ৬ জনের বেশী নহে।

১৯২১ সালের Census Report-এ লিখিত আছে—"The people of Bengal take very small share in the labour employed by the primer factory industry (jute mills) of the province, as they take very small share in its control". এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য এবং উহা যে কেবল পাটকল সম্পর্কেই প্রযোজ্য তাহা নহে, বাংলা দেশের দুই-একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই খাটে। বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর কর্তৃত্ব না থাকিলেও ইহার যা কিছু কর্তৃত্ব, ইংরাজদের বাদ দিলে, অ-বাঙ্গালীদের হাতে আছে। আমার মনে হয় যে, ইহার অন্যতম কারণ অ-বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়ী ও শ্রমোৎসাহী এবং ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য মোহগ্রস্ত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য অযথা সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজদের ন্যায় অ-বাঙ্গালীরা সামান্য কিছু লেখাপড়া

শিখিয়াই ব্যাবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিভাবে ইহারা নিজেদে
চেষ্টায় ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির জটিল তত্ত্বগুলি
আয়ত্ত করেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়্‌লা। এ
প্রবন্ধে আমি ইহার সম্বন্ধেই দুই-চারিটি কথা বলিব।

বিড়্‌লা পরিবার বহুবৎসর হইতেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট
প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইতে "শিউনারায়ণ বলদেও দাস" এই না
ইহাদের সোনা রূপার ও আফিমের কারবার ছিল। ঐ ব্যবসায়ে
উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কিছুদিন পরে কলিকাতায় "বলদেও
দাস যুগল কিশোর" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ঘনশ্যামদা
গৃহে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়া ১৯০৭ সালে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে
নিজেদের ব্যাবসায়ে লিপ্ত হন। যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর তখ
কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের একটি বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব
তিনি গ্রহণ করেন। দিবাভাগে তিনি ব্যবসায়ের কাজকর্ম দেখিতেন
এবং রাত্রিকালে ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন
অতঃপর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই নূতনতর প্রতিযোগিতা
যুগে ব্যাবসা-বাণিজ্যে পুরাতনপন্থী হইলে চলিবে না তখন তিনি তাঁহা
পৈতৃক ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানকে ১৯১৮ সালে "বিড়্‌লা ব্রাদার্স লিমিটেড
নামে একটি যৌথ কারবারে পরিণত করেন। যতই দিন যাইতে লাগি
ততই কারবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়
ঘনশ্যামদাস বাবু আমার অন্যতম প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানকে
তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে পান। দেবীপ্রসাদ প্রথমে আইন ব্যবসায়ে আত্ম
নিয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি উহা ত্যাগ করিয়া ১৯১৯ সালের
অক্টোবর মাসে বিড়্‌লা ব্রাদার্সে যোগদান করেন।

১৯১৮ সাল হইতেই বিড়্‌লা পরিবারের ব্যাবসা জগতের বিভিন্ন দেশে
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে পাট

হেসিয়ান, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি বিদেশে চালান দিতেন এবং বিদেশ হইতে বিক্রয়ার্থ স্বর্ণ রৌপ্য আমদানী করিতেন। ১৯১৯ সাল হইতে ঘনশ্যামদাস বাবু শিল্প-প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বিড়লা জুট মিল্‌স্ এবং দিল্লীতে বিড়লা কটন স্পিনীং এণ্ড উইভিং মিল স্থাপন করেন। ১৯২১ সালে গোয়া-লিয়রের মহারাজার অনুরোধে তিনি সেখানে একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতার সন্নিকটস্থ কেশোরাম কটন মিলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। মধ্য প্রদেশ ও পাঞ্জাবে তাঁহার তুলা পাঁজিবার কারখানা আছে এবং সম্প্রতি তিনি বিহার প্রদেশে চারিটি চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন।

ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রসার চেষ্টায় ঘনশ্যামদাস বাবুর কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার বিভিন্ন ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) East Indian Produce Co., Ltd., London, (২) Cotton Agents Ltd., Bombay, (৩) Jute & Gunny Brokers' Association Ltd., (৫) Shipping Co., Ltd., (৫) Jute Supply Agency Ltd., (৬) New Asiatic Life Assurance Co., Ltd., (৭) Bengal Stores Ltd. ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন বিড়লা পরিবারের অনেক জমিদারিও আছে।

ঘনশ্যামদাস বাবু কেবল ব্যাবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং কি করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেন। এই একাগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা ঘনশ্যামদাস বাবু অর্থনীতি

সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন তাহারই ফলে দেখিতে পাই যে, মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে, এমন কি কোনরূপ পাঠশালার শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও, তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯২১ সালে ভারতীয় শুল্ক অনুসন্ধান কমিশনের (Indian Fiscal Commission) সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ইনি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় কলকারখানার মালিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে শ্রমিক কমিশন নিযুক্ত হইলে ঘনশ্যামদাস বাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহারও সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে লণ্ডনে অবস্থানকালে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করার জন্য ভারত-সচিব ভারতীয় মুদ্রানীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিলে পর ইণ্ডিয়া আফিসের এক বৈঠকে ঘনশ্যামদাস বাবুর সহিত মুদ্রানীতির অন্যতম বিশেষজ্ঞ সার হেনরী ষ্ট্রাকোসের যে তর্ক হয় তাহাতে তিনি কারেন্সীর জটিল তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে, ঐ সময়ে একদিন দেবীপ্রসাদ আমার সহিত দেখা করিতে আমার লেবরেটারীতে আসেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"তুমি নাকি সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দাও আর ঘনশ্যামদাস বাবু তাহাই আবৃত্তি করেন?" উত্তরে তিনি বলেন—"বর্ত্তমানে ঘনশ্যামদাস বাবুর সহিত ষ্ট্রাকোস সাহেবের যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে কি বলিতে হইবে যে তাহা তিনি Telepathy দ্বারা শ্রীযুক্ত বিড়লাকে বলিয়া দিতেছেন?" তিনি আরও বলেন যে, এই সকল বিষয়ে ঘনশ্যামদাস বাবু তাঁহাকে অনেক কিছু শিখাইতে পারেন।

ঘনশ্যামদাস বাবু যে কেবল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিশন এবং কমিটীতেই তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাই নহে, তিনি বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভা এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেও যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯২০ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৯২৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে গভর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক শুল্ক নীতির (Imperial Preference) প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

বাণিজ্য জগতে ঘনশ্যামদাস বাবুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্ব্বজনবিদিত। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতাস্থ ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি নিখিল ভারত বণিক সমিতির (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়্লা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার।

জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে বিড়্লা পরিবারের দান অতুলনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয়—যদিও ঘনশ্যামদাস বাবু অল্প বয়স হইতে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তথাপি তিনি সর্ব্বদা নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার কলিকাতার বিরাট ব্যবসায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বিড়্লা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বিড়্লার (বয়স মাত্র ৩০ বৎসর) হস্তে সমর্পণ করিয়া অধিকাংশ সময় দিল্লীতে অনেকটা নির্লিপ্তভাবে দিন কাটান। তথাপি বাণিজ্য জগতে যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হয় বা জাতি যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য বা পরামর্শ চায় তখনই আমরা ঘনশ্যামদাস বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই এবং তিনি জাতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান।

যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী যুবক বুঝিতে পারে যে, বাণিজ্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কাতর প্রার্থনা শুনিয়া মা'জীর দ্বারা তাঁহার দয়া দেখাইলেন। আমি মা'জীর স্লিপ্ লইয়া খাদি হইতে টাকা লইয়া সেই টাকা এবং আমার নিজের জমা সামান্য টাকা দ্বারা ৪ জোড়া বলদ ক্রয় করি, এবং পুরাদমে কাজ আরম্ভ করি। ৪ মাসের মধ্যে খাদির ৩০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দিলাম।

"এদিকে ১৯২৬ সালের শেষ দিকে খাদিতে গাড়ীর কাজ ক্রমশঃ কমিয়া আসাতে আমি বড়বাবুর (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত) কাছে পানিহাটী বেঙ্গল কেমিক্যালে ভাড়া খাটিবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়া বলেন যে, "তোমার ১ খানা গাড়ী বলদ সমেত খাদিতে বিক্রয় করিয়া দাও, এবং গান্ধীজীর নামে ৩০৲ টাকা চাঁদা দাও।" আমি তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া ১৬০৲ টাকায় এক জোড়া বলদ ও গাড়ী খাদিতে দিই ও ৩০৲ টাকা চাঁদা দিই।

"অতঃপর আমার নিজের ৩ খানা গাড়ী লইয়া বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ আরম্ভ করি। এই সময় আমি অন্য লোকের অনেক গাড়ীও বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য ভাড়া খাটাইতে আরম্ভ করি এবং 'চৌধুরীয়ানা' পাইতে থাকি। এই ভাবে চার বৎসর কাজ করিয়া কিছু টাকা জমাই। নিজের জমানো টাকা এবং ৪০০৲ টাকা ধার লইয়া এক হাজার টাকা জমা দিয়া মাসিক ১৬০৲ টাকা কিস্তিতে ৩৩০০৲ টাকা দামের একখানা লরী খরিদ করি। লরী ক্রয় করায় আমার কাজ আরো বাড়িয়া যায়। লাভের টাকা হইতে পাঁচ বৎসরে ক্রমে ক্রমে আমি আরো তিনখানা লরী খরিদ করি। বর্ত্তমানে আমার নিজের ৪ খানা মোটর লরী এবং ১৫ খানা গোরুর গাড়ী আছে। তাহা ছাড়া আরো অন্য লোকের ১৫ খানা গোরুর গাড়ীর 'চৌধুরীয়ানা' করি। আবশ্যকমত আমি এখনো গাড়ী চালাই, লরীও ড্রাইভ করি। মোটর চালনা শিখিয়া লাইসেন্স লইয়াছি।

"এখন আমার মাসিক লরী ও গরুর গাড়ীতে যাহা খরচ হয় তাহার তালিকা দিতেছি।

৪ খানা লরীর ড্রাইভারের বেতন	৪০৲ হিঃ	১৬০৲
ঐ ৪ জন কুলীর বেতন	১৫৲ হিঃ	৬০৲
লরীর পেট্রোল ও অন্যান্য খরচ		১০০০৲
১৫ খানা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের বেতন	১৫৲ হিঃ	২২৫৲
১৫ জোড়া বলদের খরচ		২২৫৲
অতিরিক্ত কুলী ৮ জনের বেতন	১৫৲ হিঃ	।১২০৲
মুন্সী ৪ জনের বেতন		৬৫৲
যে সমস্ত অন্য লোকের গাড়ী খাটানো হয় তজ্জন্য		১০০০৲
		২৮৫৫৲

"মোটামুটি এইরূপ খরচ হয়। মাসে বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে ৩০০০৲ হইতে ৩৫০০৲ টাকা এবং অন্যান্য স্থানে লরী ও গাড়ী খাটাইয়া আরো ২।৩ শত টাকা পাই।"

পানিহাটীর ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী আমাকে আরো বলিয়াছেন যে, কেবল বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ করিয়া গোকুল সিং মাসে ৭।৮ শত টাকা লাভ করে। এতদ্ভিন্ন বাহিরের কাজ হইতে অনেক টাকা আয় হয়। গোকুল সিং বাজার দর অপেক্ষা কম দরে কাজ করে। সে যদিও এত টাকা রোজগার করে তবুও তাহার চালচলন সামান্য গাড়োয়ানের মত। এমন কি কোন দিন কোন গাড়োয়ান যদি অনুপস্থিত থাকে তবে সে স্বয়ং গাড়ী চালায়। ইহা ছাড়া তাহার অধীনস্থ গাড়োয়ান, কুলীর ও গরুর দৈনিক খোরাকের ব্যবস্থা সে করে। তাহাদের সহিত সে নিজে থাকে ও খায়। এত রোজগার করিয়াও তাহার মাথা কিছুমাত্র গরম হয় নাই। এমন কি সামান্য কেরাণী বাবুর নিকট হাত যোড় করিয়া থাকে। আমাদের কোন বাঙ্গালী বাবু যদি ইহার অর্দ্ধেক আয়ও করিতেন তবে

তাঁহার বাবুয়ানা ও চালচলনের খরচা মিটাইয়া মাথা ঠিক রাখিয়া ব্যাবসা চালান দুষ্কর হইয়া উঠিত।

বাংলা দেশে মফঃস্বলের নানা স্থানে অনেক গাড়োয়ান আছে, তাহারা প্রায়ই মুসলমান। সেই শ্রেণীর মুসলমানরা হিন্দু অপেক্ষা কর্ম্মঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু। তফাৎ এই যে, পশ্চিমা অর্থাৎ বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোক পাঁচজন লোক খাটাইয়া একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহারা তাহা পারে না।

এই কলিকাতায় পাটের কলে ৩।৪ লক্ষ মজুর খাটে। তাহাদের বিভিন্ন দলের একজন করিয়া সর্দ্দার বা "চৌধুরী" থাকে। তাহার হুকুম মত তাহারা চলে, যেমন সামরিক ব্যাপারে সেনাপতির হুকুম চক্ষু বুজিয়া মানিয়া যাওয়াই সৈনিকের কাজ।

কিন্তু বাঙ্গালীরা স্ব স্ব প্রধান। কাহারও হুকুম মানিয়া কাজ করিতে অপমান মনে করে। অথচ সামান্য বেতনে কেরাণী হইয়া কোন ইউরোপীয়ের অধীনে কাজ করা অপমান মনে করে না।

এই রকম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে বলিয়া পশ্চিমারা —আর মাড়োয়ারীর ত' কথাই নাই—বাঙ্গালীকে হঠাইয়া কোণ-ঠাসা করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পোস্তায় প্রত্যহ কত শত বলদের গাড়ী ও মোটর লরী মাল লইয়া আনাগোনা করে। যদি কোন বাঙ্গালী এক গাড়ী মাল লইয়া তথায় যায় তবে তাহাকে 'চৌধুরীয়ানা' বাবদ জরিমানা না দিলে গাড়ী লইয়া যাইতে পারে না।

বাঙ্গালীর অপটুতা ও শ্রমবিমুখতার ভূয়োভূয়ঃ উদাহরণ যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা প্রদান করিয়াছি। আর একটিমাত্র উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব।

আমাদের পানিহাটি শাখা-কারখানার প্রায় সম্মুখে মোল্লারহাট নামে

একটি হাট সপ্তাহে দুইবার করিয়া বসে। ইহার অধিকাংশ বিক্রেতাই পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান। বাঙ্গালী মাত্র দুই চারিজন; তাহারাও অতি সামান্য দোকানদার। এখানে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে পদ্মা অঞ্চলের বরফে সংরক্ষিত মাছ মোটর লরী বোঝাই করিয়া পশ্চিমা মুসলমানগণ আনিয়া বিক্রয় করে। ৫।৭ জন একযোগে মাছ লইয়া আসে; পরে যাহার যেমন মাছ তদনুসারে মোটরের ভাড়া দেয়। এই সামান্য কাজও পশ্চিমারা এক চেটিয়া করিয়াছে। আমাদের ইতর শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু বা মুসলমান এতই অপদার্থ যে, এই সমস্ত ব্যাবসা অ-বাঙ্গালীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

এই প্রকার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, আলুওয়ালাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ জন বাঙ্গালী আর সবই পশ্চিমা। কৈ, মাগুর প্রভৃতি জিয়ালা মাছের কারবার উড়িয়াদের একচেটিয়া। চাউল এবং ডালের ব্যবসায়ে মাড়োয়ারীদিগের একাধিকার। মানিকতলা ও শ্যামবাজারের অবস্থাও একই প্রকার। এইরূপে দিন দিন অতি ক্ষুদ্র হইতে সমস্ত বৃহৎ ব্যবসায় অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছে।

বাঙ্গালী ডুবিল কেন

যে সকল কৃতী বাঙ্গালী ব্যাবসাক্ষেত্রে অনন্যসুলভ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ কয়লাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হাতে কলমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা অমূল্য, সন্দেহ নাই। ব্যাবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাভব দেখিয়া আমার ন্যায় তিনিও ইহার কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হইয়াছেন। এই ভূয়োদর্শী প্রবীণ ভদ্রলোক এ বিষয়ে কিরূপ মতামত পোষণ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য মনে করিয়া প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি ইহাতে অনেকের চক্ষুরুন্মীলনের উপাদান মিলিবে। প্রবন্ধটি 'হিন্দু' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"একদিন স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। একখানি গোপনীয় জরুরী চিঠি তিনি নিজ হাতে লিখিয়া তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট শর্টহ্যাণ্ড-টাইপিষ্ট বাবুকে (যিনি তাঁহার ঘরের এক কোণে বসিতেন) ডাকিয়া বলিলেন, "বাবু, এই চিঠিখানি আমায় এই প্রেসকপি (Press Copy) হইতে ছাপিয়া দিউন।" বাবু প্রথমে বলিলেন,—"সাহেব, আমি জানি না।" তাহার পর সাহেব দেখাইয়া দিলেন,—"এইরূপে ব্রুশ দিয়া জল লাগান—তাহার পর ব্লটিং কাগজ দিয়া চাপুন, পরে ঐ খাতার অর্দ্ধশুষ্ক পাতার মাঝে চিঠিখানি দিয়া চাপুন, ছাপা উঠিবে।" বাবুটি উত্তর করিলেন—"সাহেব জলসহিত ব্রুশ টানিলে আমি কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি,—ভয় হইতেছে। আমি দপ্তরীকে ডাকিয়া আনিয়া চিঠিখানি ছাপাইয়া দিতেছি।" বাবুটি নিজের ভ্রান্ত আত্মসম্মানের জন্য এই কথাটি বলিয়াছিলেন এই ভয়ে যে, তাঁহার দ্বারা সাহেব দপ্তরীর কার্য্যও করাইয়া লয়েন এইটি আমি জানিয়া গেলাম বা যাইব।

সাহেব বলিলেন—"আমি কি এ-আপিসের বড় সাহেব নই? আমি কি এ কাজের জন্য তাহাকে ডাকিতে পারিতাম না? আপনি জানেন, দপ্তরীরা একটু একটু ইংরাজী জানে। এই চিঠিখানি অত্যন্ত গোপনীয়। এই চিঠিতে কি আছে তাহা সে ফাঁস করিয়া দিতে পারে, তাহাতে এই কারবারের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য আপনাকে প্রেসকপি করিতে বলিয়াছিলাম। যদি এই চিঠির সংবাদ বাহিরে ফাঁস হয় বা প্রকাশ পায় তাহা হইলে কোনও ইতস্ততঃ না করিয়া তজ্জন্য কেবল আপনাকেই দায়ী করিতে পারি, কেননা আপনি এবং আমিই এ পত্রের ভিতরের খবর জানি।"

তাহার পর সাহেব আমাকে বলিলেন, "ব্যানার্জ্জি, এক মিনিটের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।" পরে ঐ বাবুটিকে ডাকিয়া লইয়া প্রেস কপিইং মেসিনের নিকট লইয়া যাইয়া কিরূপে ছাপিতে হয় দেখাইয়া দিয়া চিঠিখানি নিজহাতে ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন ও উহার নকলবহি নিজের টেবিলের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "বাবু, আপনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি আপনাকে একটি সামান্য ভৃত্যের কাজ করিতে বলিয়াছিলাম এবং এই ঘরে একজন ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহা করিতে অপমান বোধ করিয়াছিলেন;—তাহাই নহে কি? দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন,—আড়াইশো তিনশো টাকা বেতনে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে হেড্ আপিসে আমাকে কি কি কাজ করিতে হইয়াছে; এখন আমি প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা মাহিয়ানা পাই এবং এই কারবারের আমি একজন অংশীদার। পূর্ব্বে বিলাতে সওদাগর আপিসে শিক্ষানবিশী (apprenticeship) করিতে হইলে পাঁচশত পাউণ্ড দক্ষিণা দিতে হইত—এক্ষণে যেমন এটর্ণীর আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক হইতে হইলে প্রিমিয়াম দুই হাজার টাকা হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। বাবু! আমাকে

আপিসে ঢুকিবার প্রথম সপ্তাহে কাটা পাটের গোছা দিয়া মার্কেল পাথরের মেঝ পরিষ্কার করিতে হইয়াছে। তাহার পর ডাকঘর হইতে চিঠি লইয়া আসিতে হইত ও ডাকঘরে চিঠি দিয়া আসিতে হইত। পরে চিঠি বিলি করিতে হইয়াছে ও দুইমাস জাহাজের সবরকম কাজ শিখিয়া আসিতে হইয়াছে। পরে আপিসে আসিয়া বড় সাহেবের ঘরের দরজার পিয়নগিরি করিতে হইয়াছে এক সপ্তাহকাল। পরে আপিসে দপ্তরীর কার্য্য শিক্ষা করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে ত ফরম্ ছাপা ছিল না। তখন হাতে রুল কাটিয়া ফরম্ করিতে হইত। চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টসিপ পরীক্ষাতে ফরম্ ছাপিবার জন্য সেকালে ১২০০ নম্বর ছিল। এইরূপে দপ্তরীর কার্য্য শেষ হইলে চিঠি কপি করিতে দেওয়া হয়—পরে সব রকম কেরাণীর কার্য্য শিখানো হয়। বুককিপিং, শর্টহ্যাণ্ড-লেখা এবং টাইপরাইটিং শিক্ষা হইলে আমাকে সাহেবের ঘরের ভিতরে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়—বাহিরের লোকের সহিত কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে তাহা শুনিতে ও শিখিতে বলা হয়। এইরূপে নিম্নতম ভৃত্যের কার্য্য হইতে বড় সাহেবের কার্য্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া তবে আমাকে চাকরীর জন্য পাঠান হইয়াছে। আমি ত টাকা দিয়া নিম্নতম ভৃত্যের কার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করি নাই।"

এই মানের ভ্রান্ত মনোবৃত্তি ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীর বিতাড়িত হইবার এক মূল কারণ। খুব কম লোকই পাওয়া যায় যাহারা কোনরূপ দোকান বা শিল্পকারবার করিতে রাজী। বিজ্ঞান বলে,—প্রকৃতি শূন্যতা থাকিতে দেয় না, সর্ব্বদা শূন্য পূরণ করে। সব ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। বাঙ্গালী যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে বিমুখ হইয়া থাকে তবে কি বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিবে? নিশ্চয়ই নহে,—অন্যে এই সুযোগে সে স্থান পূরণ করিবে। অ-বাঙ্গালীরা এইভাবে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য দখল করিয়াছে। বাঙ্গালী সুযোগ অবহেলা করিয়া

অ-বাঙ্গালীকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এখন শুধু চীৎকার করেন যে, তাঁহারা বিতাড়িত, অথচ নিজেরা নিজেদের জায়গায় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেন না। যদি কেহ সামান্য মুদি বা ষ্টেশনারী দোকান প্রভৃতি কারবার করেন তবে পারতপক্ষে নিজহাতে কাজ করেন না ;—প্রায়ই লোক রাখিয়া কাজ চালান। তাহার পর কোন খরিদদার অল্প দামের জিনিষ কিনিতে যাইয়া ২।৩ রকম জিনিষ দেখিতে চাহিলে দোকানদার বিরক্তি বোধ করেন, হয়ত ঠাট্টা করেন বা দুইকথা শুনাইয়াও দেন। যাঁহারা ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করেন, তাঁহারা ক্রেতার কথার জবাব দেন না। এই সব বাঙ্গালী কারবারীদের নিকট ক্রেতারা কোনরূপ সুবিধা পান না ; কোন অ-বাঙ্গালীর দোকানে বা আপিসে যান,—দেখিবেন তাঁহারা খরিদদারের কতরকম সন্তুষ্টিসাধন করেন এবং সুবিধা দেন। আর বাঙ্গালীর আপিস বা দোকানে যান, দেখিবেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, তাঁহারা ব্যবসায় করিয়া যেন ক্রেতাদের কতই অনুগ্রহ করিতেছেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারে খরিদদারের কৃতার্থবোধ করা উচিত। বইয়ের দোকানে যান— সহজে কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবেন না। ২।৩ বার জিজ্ঞাসা করিলে দোকানের লোকেরা যেন কতই অনিচ্ছার সহিত জবাব দিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর সব ব্যবসায়ই এইরূপ। আর ইংরেজ বা অন্য অ-বাঙ্গালীর দোকানে যান, দেখিবেন কিরূপ আদর পাইবেন।

শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বাঙ্গালী শিল্প শিখিতে আসেন তাঁহারা সহজে হাতে-হাতুড়িতে কাজ করিতে চান না। প্রায়ই স্কুলের লোক দ্বারা করাইয়া দেখাইতে হয়। শিক্ষকেরা হাতে হাতুড়িতে করিতে বলিলে তাঁহারা বিরক্তি বোধ করেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা অধিকাংশ স্থলে ডোমকে দিয়া মড়া চিরাইয়া শিক্ষা করে। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছুতার মিস্ত্রী কাঠ কাটিয়া জোড়া দেয়,—ছাত্রেরা দেখে ; কিন্তু পরীক্ষার সময় জোড়া মিলাইতে পারে না। আমাদের খনিজে নীচ সাহেব

বলিয়া একজন খনির ইনস্পেক্টার ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছেলেদের খনিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বড়ই মনোযোগ দিতেন। তিনি আমার খাদে একটি খনিবিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রকে ট্রামলাইন ও ক্রসিং জোড়া দিতে বলেন। সেই বালকটি ট্রামলাইন ও ক্রসিং লাইনের মিস্ত্রীকে আনাইয়া করাইতে যান। সাহেব বলিলেন যে, তিনি নিজে ট্রামলাইন ও ক্রসিং কুলীর সাহায্য না লইয়া স্বহস্তে জোড়া দিয়াছেন। বিলাতে মিস্ত্রীকে দিয়া জোড়া দিতে দেয় না। পরে একটি গাঁতিতে নিজহাতে কয়লা কাটিতে ছেলেটিকে বলেন,—সে গাঁতি ধরিয়া মারিতেই পারিল না। সাহেব বলিলেন, "তুমি যদি নিজে কয়লা কাটিতে না জান তাহা হইলে খনির লোকদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবে?" বিলাতে যত পরীক্ষোত্তীর্ণ ম্যানেজার আছেন সকলেই হাতে-হাতিয়ারে কয়লা-কাটা খনিক ছিলেন। এইরূপে হাতে-হাতিয়ারে খনিবিদ্যা শিক্ষা আমাদের ছেলেরা করে না। কেবল বই পড়িয়া লাইন-ম্যানেজারের পরীক্ষা দিতে যায়, সেই জন্যই বেশী ছেলে ফেল হয়। তাহারা নিজেরা জরীপ নক্সা করিতে পারে না। আমি ১০০টি আই-এস সি, ও বি-এস সি, ছেলেকে মাইন-ম্যানেজারী পরীক্ষা দিবার জন্য বিনা ব্যয়ে আহার ও থাকিবার স্থান দিয়া পাঠাইয়াছিলাম—এক বৎসর বাদে ১০ টাকা হিসাবে ভাতাও দিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইটি প্রথমশ্রেণীর ম্যানেজার ও দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যানেজার হইয়াছেন। আর অনেকেই চলিয়া আসিয়াছেন বা খাদে ত্রিশ টাকা বেতনের 'ওভারম্যান' চাকরী লইয়া কুলী রমণীদিগের সহিত ব্যভিচার আমোদে মত্ত আছেন।

কোনও শিক্ষিত যুবক কোন কারখানায় বা কয়লার খাদে শিক্ষানবীশ থাকিলে মিস্ত্রী বা কারিগরদের সাথে সমানভাবে মিশিতে অপমান বোধ করেন। সর্ব্বদা নিজেদের বড় ভাব বজায় রাখিয়া চলেন এবং নিজের মানের দায়ে ব্যস্ত। ফলে মিস্ত্রী বা কারিগরেরাও দূরে দূরে থাকে। সুতরাং ভালরূপ কাজ শিখিতে পারেন না। এই কারণে বাঙ্গালী

কারখানার মালিকেরা কিছুতেই বাঙ্গালী শিক্ষানবীশ রাখে না। রাজার ছেলে এড্মিরাল্টিতে জাহাজে খালাসির কার্য্য করিতে অপমান বোধ করেন না দেখিয়াও তাঁহারা শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষা করিলেন না। কারিগর বা মিস্ত্রীদিগকে কার্য্যস্থলে সহকর্ম্মা মনে করিতে পারেন না। বাহিরে আসিয়া সমাজে তুমি বাবু হও না কেন—কে তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে?

আমার এক পরিচিত বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে কার্য্য শিখিবার জন্য বাংলার সব কাপড়ের মিলের কর্ত্তৃপক্ষের সব রকম সর্ত্তে রাজী হইয়া কোনও মিলে বা কলে কাজ শিখিতে পায় নাই। পরে পশ্চিমের এক বড় কাপড়ের মিলে কাজ শিখিয়া বিলাত গিয়াছিলেন। কলকারখানার বাঙ্গালী কর্ত্তৃপক্ষের মনোবৃত্তি এইরূপ। আর স্যার ভোরাব টাটার ৫০০০৲ টাকা বেতনের ম্যানেজারের সহিত এইরূপ চুক্তি যে, তাঁহাকে একটি পার্শীছেলেকে কাপড় প্রস্তুত করা শিক্ষা দিতে হইবে।

* * * * *

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সহরগুলিতে ষ্টীমার ও রেলষ্টেসন অ-বাঙ্গালী কুলীতে ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা করিবে না—কারণ এত পরিশ্রম তাহাদের পোষায় না বা তাহা অপমান-জনক বোধ করে। অথচ ঘরে বসিয়া পরিবারসহ উপবাস করিতেছে।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাঙ্গালী গৃহস্থের ঠাকুর চাকর পর্য্যন্ত অ-বাঙ্গালী, কারণ বাঙ্গালী পাওয়া দুষ্কর। অথচ সেখানে ঐ শ্রেণীর কত লোক উপবাস বা অর্দ্ধ উপবাসে দিন কাটাইতেছেন। তাহারা এই কাজ করিলে তাহাদের কষ্টের অবসান হয় এবং বাংলার টাকা বাংলায় থাকে। কিন্তু তাহা তাহারা করিবে না—মানের হানি হয়,—আর উপবাসে কষ্ট পায়। একটি পরিবার এইরূপে প্রায়ই উপবাসে কষ্ট পায়। সে

পরিবারের একটি ছেলেকে এক বাসায় রাখিয়া দেওয়া হইলে, ৬ মাস কাজ করিলে তখন তাহাদের আর উপবাস করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ৬ মাস পরে সে কাজ ছাড়িয়া দেয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে, 'চাকরের কাজে পোষায় না।' ২০৲ টাকা বেতনের এক কেরাণীর জন্য একশত উমেদার পাওয়া যায়, কিন্তু একজন পাচক বা চাকর পাইতে হয়রাণ হইতে হয় এবং অ-বাঙ্গালীদের খোসামোদ করিতে হয়। কেন, দেশে কত লোক কষ্ট পাইতেছে, তাহারা কি করিতে পারে না?

এমন কি, ভিক্ষুক বা চাঁদা-আদায়কারীকে যদি ভিক্ষা বা চাঁদা দিতে দুই এক বার অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয় তবে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়; হয়ত দাতাকে দুইটি কড়া কথা শুনাইয়া দেয়! আর অ-বাঙ্গালীরা কতরূপ তোষামোদ করিয়া আদায় করে। না পাইলেও ঐরূপ খারাপ ব্যবহার করে না।

দৈহিক পরিশ্রমে অনেক বাঙ্গালী কাহারও অপেক্ষা কম যায় না। বুদ্ধি ও বিদ্যায় বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীর চেয়ে বড়। এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির সুযোগ নিয়া অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহাদের কারবার বড় করিয়া ধনী হইতেছে। আর বাঙ্গালী উদাসীন,—চাকুরী করিয়াই জীবনের সার্থকতা বোধ করিতেছে! চাকুরীতে যেন চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।

বাঙ্গালী মনিবেরা বাঙ্গালীর শ্রমকাতরতার জন্য পরিশ্রমের ঠিক মূল্য দেন না। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর অবস্থা বুঝিয়া প্রায়ই কম মূল্য দিয়া থাকেন এবং এই কম মূল্যও সময়মত দেন না। খুব কম বাঙ্গালী মনিবই পাইবেন, যাহারা ঠিক নিয়মিতভাবে বেতন দেন। প্রায় ২।৩ মাস জমাইয়া সামান্য সামান্য করিয়া দিয়া থাকেন।

চীনদেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল "সুপ্ত সিংহকে জাগাইও না।"

বাঙ্গালীও আজ সুপ্ত। তাহাকে জাগাইতে হইবে, তবে বাংলায় বাঙ্গালী বিতাড়ন বন্ধ হইবে ও অ-বাঙ্গালী একে একে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। বাঙ্গালীর দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে। বিদ্যাবুদ্ধিও আছে এবং অন্যান্য গুণাবলীও যাহা আছে তাহা দ্বারা বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারে।

আর এই পরিশ্রমের ক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলীর ব্যবহার করিয়াই অ-বাঙ্গালীরা বড় হইতেছে এবং বাঙ্গালীকে চাপিয়া রাখিতেছে। বাঙ্গালীকে জাগাইতে হইবে যাহাতে তাহারা এই সকল ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজে বড় হইতে পারে এবং অ-বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের হটাইয়া নিজেরা জয়ী হইতে পারে।

এই সুপ্ত বাঙ্গালীকে জাগাইতে হইলে দুটি মিষ্ট কথায় বা বক্তৃতায় চলিবে না। কড়া নীতির দরকার। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, আরাম-প্রিয়তা ও মানের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে। তাহা দূর করিতে কঠিন শাসন দরকার।

এখনও বাঙ্গালী জাগো; নচেৎ তোমরা দৈনিক কুলীমজুরে পরিণত হইবে—বাঙ্গালীর গৌরব লুপ্ত হইবে। এমন কি এইরূপভাবে চলিলে ৫০ বৎসরের ভিতরে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা জাতি গঠন হয় না কিংবা তাহাতে জাতির নাম ও প্রতিষ্ঠাও হয় না।

পরিশিষ্ট

(১)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা

পূর্ব্বে যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, এমন কি অক্ষরেরও প্রচলন হয় নাই তখন শিক্ষার্থী গুরুর মুখ হইতে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিতেন। ইহা হইতেই 'শ্রুতি' কথার উদ্ভব। ক্রমে লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলেও এক একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু যেদিন হইতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইল সেই দিন হইতে শিক্ষাগুরু তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গেল। সাহিত্যসম্রাট ও দার্শনিক কার্লাইল, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার না ধারিয়াও আত্মচেষ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন —"আজকালকার দিনে, অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের যুগে, কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তকের সমাবেশই হইল, প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"—"The true university of these days is a collection of books." স্থানান্তরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলোপ-সাধন-সমর্থন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যখন গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই তখনকার প্রয়োজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। সেই প্রাচীন কালে এক একখানি গ্রন্থের মূল্যস্বরূপ প্রভূত ভূসম্পত্তি দিতে হইত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে যখন পুস্তক সুলভ হইল তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন খর্ব্ব হইয়া গেল।

বিখ্যাত মনীষী H. G. Wellsও উক্তরূপ মত পোষণ করেন। তিনি বলিতেছেন—শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষকের স্থান যখন পাঠ্যগ্রন্থ আসিয়া অধিকার করিল, তখন অনেক কিছু নূতন সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রাচীন

কাল হইতে শিক্ষার্থী যে স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সে বন্ধন আর রহিল না। এখন আর ছাত্র নির্দ্দিষ্ট কোনও সময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শিক্ষক-বিশেষের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিতে বাধ্য নহে। কেম্বি্জের ট্রিনিটি কলেজের সজ্জিত কক্ষে বসিয়া দিবাভাগে পাঠাভ্যাসরত এক যুবক, অপর দিকে আর এক যুবক, সে দিবসে কর্ম্মনিযুক্ত থাকে, কিন্তু কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে গ্লাসগো সহরের নিভৃত শয়নকক্ষে বসিয়া অধ্যয়নে মগ্ন থাকে; তুলনা করিলে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত যুবকে যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে তাহা বলা যায় না।

(২)

পরীক্ষার প্রহসন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর মধ্যে যে কিরূপ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়াছে তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সম্প্রতি ম্যাক্‌মিলন কোম্পানী হইতে An Examination of Examinations (অর্থাৎ পরীক্ষার পরীক্ষা) নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার হইতেছেন সুবিখ্যাত শিক্ষাতত্ত্ববিৎ স্যার ফিলিপ হার্টগ। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর সারবত্তা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পুস্তকখানিতে সেই অনুসন্ধানের ফলাফল সন্নিবেশিত হইয়াছে। কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার। পরীক্ষার্থিগণের লিখিত প্রশ্নোত্তরের খাতা দৃষ্টে পরীক্ষকগণ যে মূল্য বা নম্বর দিয়া থাকেন, এবং যে নম্বরের মানদণ্ডে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার হয়, তাহাতে যে কতদূর বৈষম্য থাকিতে পারে তাহারই সমালোচনা পুস্তকখানির বিষয়বস্তু। কতকগুলি পরীক্ষিত

খাতা লইয়া উক্ত অনুসন্ধান কমিটি নিজেদের নিযুক্ত কয়েকজন নূতন পরীক্ষকের হস্তে দেন। পূর্ব্ব পরীক্ষকগণের বিচারে খাতাগুলিতে এক-রূপ নম্বর উঠিয়াছিল, কিন্তু নূতন পরীক্ষকদের হাতে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন খাতার ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল—সে মূল্যের পার্থক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহারই এক বৎসর পরে, শেষোক্ত পরীক্ষকগণকে ঐ খাতাগুলি পুনরায় দেখিতে দেওয়া হইল, তখন তাঁহারা উহাতে যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন প্রথম বারে তাঁহাদেরই দেওয়া নম্বরের সহিত তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইল। ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় একই উত্তরের খাতায় ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের নিকট যথাক্রমে ১৫।৫০।৬৩।৬৯।৭৮।৬২।৭৫। ৪৮।৭১ ও ৬৪ নম্বর উঠিল।

ইহার পর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

(৩)

পুরুষকার

যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত যোগ্যতার বীজ লুক্কায়িত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মাধারী না হইয়াও যে তাঁহারা আত্মচেষ্টায় শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে পারেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত "বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা বনাম পুরুষকার" প্রবন্ধে দিয়াছি। আরো কয়েকজন কৃতী পুরুষের উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হন নাই, অধিকন্তু আভিজাত্য বা বংশ-গৌরবে গরীয়ান্ নহেন। আমাদের দেশে যাঁহারা কৌলীন্যের মর্য্যাদায় স্ফীত, তাঁহারা যে কত দূর ভ্রান্ত তাহা এই সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বিখ্যাত পর্য্যটক ও সাংবাদিক ষ্ট্যান্‌লির নাম সভ্যজগতে সুবিদিত। আভিজাত্য ও ডিগ্রীর গরিমা বর্জ্জিত হইয়াও স্বাবলম্বনের বলে কেমন

করিয়া প্রতিভার স্ফুরণ হইতে পারে ষ্ট্যান্‌লির জীবন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইনি একজন পরিচারিকার গর্ভজাত সন্তান। জন্মদাতা ছিল জনৈক চরিত্রহীন মদ্যপ কৃষক—পানশালায় কলহের ফলে তাহার কলঙ্কিত জীবনের অবসান হয়। মাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত বালকের প্রথম জীবন অনাথাশ্রমের অনাদরে কাটে। পঞ্চদশ বৎসরে তিনি মেষ পালকের বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সপ্তদশ বৎসরে জাহাজের খালাসীরূপে আমেরিকা যাত্রা করেন। কালক্রমে ইনি কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন তাহা সকলেই জানেন।

জগদ্বরেণ্য চিত্রকর লিওনার্ডো দা বিঞ্চির জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার বহুমুখী প্রতিভা যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু ইহারও প্রথম জীবন অগৌরবে ও অনাদরে কাটিয়াছিল। ফ্লোরেন্সবাসী এক চপলমতি যুবকের ঔরসে বিঞ্চি-গ্রামবাসিনী জনৈকা অনূঢ়া কৃষক কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ভবিষ্য-জীবনে মাতার সহিত তাঁহার কোনও সংযোগই ছিল না, কিন্তু তাঁহারই নামের রাজটিকা ললাটে ধারণ করিয়া বিঞ্চি নামে ক্ষুদ্রতম পল্লী যুগযুগান্ত অমর হইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবলমাত্র আত্মচেষ্টার গুণেই লিওনার্ডোর অনন্যসুলভ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল—স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার তিনি ধারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি ল্যাটিন ও অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নাই বলিয়া ইনি সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞার ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করিবার মত দৃঢ়তা তাঁহার ছিল।

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ব্যাল্‌জাকের জন্মকাহিনী বিস্ময়কর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষিজীবী ও দিনমজুর ছিলেন। স্কুলের কঠোর

শাসনে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষকের হস্তে প্রহার, পাঠে অপটুতার জন্য ছুটির পরেও স্কুলে আটক থাকিবার দুর্ভোগ, এই সকল পীড়নে তাঁহার স্কুলের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। কিন্তু স্কুল লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত জনৈক বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের অনুগ্রহে তিনি লাইব্রেরীর পুস্তকপাঠের অবাধ অধিকার পাইলেন। শৈশবে যিনি বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব পাঠানুরাগের উদ্রেক হইল। তিনি তিন বৎসর ধরিয়া মনের সকল বুভুক্ষা মিটাইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় পুস্তকের রাশি মন্থন করিয়া চলিলেন এবং মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মানবের ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিলেন। ইহার পর তিনি প্যারী নগরীর এক স্কুলে অধ্যয়ন করিতে করিতে আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন এবং অবশেষে বিশ বৎসর বয়সে গ্রন্থকার হইতে মনস্থ করেন এবং শতাধিক অতুলনীয় নভেল লিখেন। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, বাল্যে শিক্ষকগণ তাঁহার স্বভাবে এমন কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করেন নাই যাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। প্রথম জীবনে তাঁহাতে কোন পাণ্ডিত্যের আভাষও পাওয়া যায় নাই; অথচ সাহিত্যিকগণ বলেন যে, ব্যালজাক্ যে শতাধিক অনুপম উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহার চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রায় সেক্স্‌পীয়রেরই সমকক্ষ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কেবল পাশ্চাত্য দেশেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও এরূপ উদাহরণের অভাব হইবে না।

আর্য্যজাতি যখন সর্ব্ব বিষয়ে চরম উৎকর্ষের শিখরে অবস্থিত সে সময়ে জাতি কুলের বিশেষ ধরাবাঁধা ছিল না। অখ্যাত কুলে কিংবা অগৌরবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ব স্ব মহত্ত্ব বলে যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন মহাবীর কর্ণ তাঁহাদের অন্যতম। মাতা কুন্তীর কুমারী

জীবনের সন্তান বলিয়া ইহার জন্ম-রহস্য নিজের ও অপরের নিকট বহুদিন গোপন ছিল; সূত-পুত্র পরিচয়ে ইহার প্রথম জীবন কাটে। হস্তিনার রাজসভায় অস্ত্র পরীক্ষার কালে বংশপরিচয় লইয়া যখন তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্যের শর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন তিনি যে বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর দিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে :

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্ ॥"

কর্ণের সে পৌরুষ যে কত দুর্লভ ও বিস্ময়কর তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মহামুনি বেদব্যাস, যিনি বেদের বিভাগ-কর্ত্তা এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা—তাঁহার জন্ম নীচকুলোদ্ভবা মৎস্যগন্ধা কুমারীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরসে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন বেশ্যাপুত্র। কিন্তু সে কথা তাঁহার গুণগরিমায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, কেহ আর স্মরণও করে না।

পিতৃপরিচয়হীন সত্যকাম ছিলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, দাসীপুত্র বিদুর ও নারদ ধর্ম্ম-প্রাণ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরকাল পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দিলাম না।

সমাপ্ত